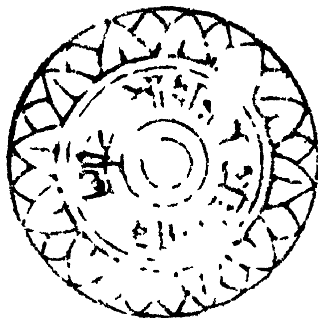
ধুলোরাঙা পথ



ধুলোরাঙা পথ

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

—প্রাপ্তিস্থান—

বিশ্বনাথ পাবলিশিং হাউস্

৮নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

প্রকাশক—

শিবরতন মুখোপাধ্যায়

দমদম

দ্বিতীয় সংস্করণ
১৯২৬

প্রচ্ছদপট শিল্পী

প্রভাত কর্ম্মকার

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ

মোহন প্রেস, কলিকাতা

মুদ্রাকর—

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

কালী-গঙ্গা প্রেস,

৪৬।১, বেচু চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—৯

বই বাঁধাই

মাজেম আলি খাঁ ও

মানসুর রহমন খাঁ

৭নং পাটোয়ার বাগান লেন

কলিকাতা—৯

মুল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র

কলাগাছে ঘেরা ছোট্ট পুকুরটি

ওর পাশেই ছোট একটি একতলা বাড়ী—নতুন তৈরী। বাইরের দেওয়ালগুলোতে এখনো চুণকাম করা হয় নি, কিন্তু ভিতরটা সুন্দর সাজানো, ঝলমল করছে শ্রী আর শান্তিতে। বাড়ীর লক্ষ্মী বৌটি একটা-না-একটা কাজ করছেই ; ওদিকে প্রৌঢ়া শাশুড়ীও সব সময়ে সাহায্য করছে তাকে। আর কেউ নেই বাড়ীতে। সপ্তাহের শনিবার দিন আসে ঐ বৌটির স্বামী হরেকৃষ্ণ ; রবিবারটা থেকে সোমবার ভোরেই চলে যায়। তারপর আবার গোটা সপ্তাহ ধরে শাশুড়ী-বৌ হরেকৃষ্ণর প্রত্যাগমনের আশায় আয়োজন করতে থাকে।

শনিবার দিন দুপুরের ডাকে চিঠি এল, এ শনিবার হরেকৃষ্ণ আসতে পারবে না। চিঠিটা পড়তে পড়তে বৌটির মুখ কালো হয়ে উঠলো। শাশুড়ী বললো,—কার চিঠি রে বৌমা ? হরুর ?

—হুঁ। আজ আসতে পারবে না লিখেছে—বলেই বিরসমুখে সে চিঠিখানি দেওয়ালের একটা কুলুঙ্গীতে রেখে দিল। ওর মুখের দিকে চাইলেই যে-কোন ব্যক্তি বুঝতে পারবে, চিঠিটা ওর বুকে শেলাঘাত করেছে।

—আসতে পারবে না ? কেন ? শরীর ভালো আছে ?

—হুঁ, কোথায় যেন যাবে লিখেছে—উত্তর দিয়েই বৌ একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলো। শাশুড়ী বুঝলো বৌএর মনের অবস্থা। [illegible] মত আর কিছু না বলে কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করলো। [illegible] আজ আসবে না—সারা সপ্তাহের আয়োজন ওদের—দুধের সর টুকু তুলে ননী করে রেখেছে, মর্তমান কলাগুলি প্রায় পেকে এসেছে, কাঁঠালটার পাকা গন্ধ বেরিয়েছে, আর না খেলে নিশ্চয় পচে [illegible]

আমগুলো তো নষ্টই হচ্ছে—কি হবে এসব! বৌটি সারাদিন ঘরের বিছানা-বালিশ রোদে দিয়ে, ঘর দোর ঝাড়পুছ করে, চুল বাঁধবার আয়োজন করছিল। আচ্ছা ছেলে কিন্তু! কোথায় কি কাজে গেল যে হপ্তাদিনে বাড়ী আসবে না! মা'র মনও বিষাদিত হয়ে উঠলো। একটু পরে বৌকে উদ্দেশ করে বললো—আজ তাহলে রাজবাড়ীতে যাবি বৌমা—কোনো দিন তো যেতে পাস্ না, যাবি আজ? আমি মীনুকে বলে দিচ্ছি, সঙ্গে নিয়ে যাবে তোকে!

—থাক্‌গে মা—যেতে পারবো না—বলে বৌ একগাছা ঝাঁটা নিয়ে ঝাঁট-দেওয়া ঘরের বারান্দাটা আবার ঝাঁট দিতে লাগলো। শাশুড়ী ওর করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে বললো,—যাবি না কেন? যা একদিন। রাজকুমারী রোজ ডাকতে পাঠায় যা, আজ দেখা করে আলাপ করে আয়।

বৌ আর কোনো কথা বললো না। শাশুড়ী পাশের কোন্ বাড়ীর দিকে বেরিয়ে গেলো। ওর বেরিয়ে যাওয়ার পর বৌটি ঝাঁটাগাছটা রেখে হাত ধুয়ে আবার সেই চিঠিখানা পড়তে আরম্ভ করলো—ছোট চিঠি, পোষ্টকার্ড মাত্র, লেখা আছে—

"মা—আমার একটি বন্ধুর বিয়েতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে হচ্ছে, তাই এ শনিবার বাড়ী যাওয়া হবে না—আগামী শনিবার নিশ্চয় যাব। শারীরিক আমি বেশ ভাল আছি; প্রণাম নিও।"

ইতি—

স্নেহের হরু।

বৌটি বার চার-পাঁচ পড়লো চিঠিটা; হঠাৎ ওর চোখ দুটো জলে ভরে গেল। নেমন্তন্ন না হাতী! গেলবারে ওর সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছে তাই ছুতো করে এবার এলো না—ওকে শাস্তি দেবার মতলব, আর কি

—কান্নায় আঁচলে মুখ চাপা দিল মেয়েটা।

কিন্তু চুপচাপ বসে থাকলে শাশুড়ী কি ভাববে? কাজেই ওকে এটা-সেটা নাড়াচাড়া করে লোক-দেখানো কাজ করতে হচ্ছে, যদিও দেখবার মত লোক কেউ বাড়ীতে নেই। এমনি করে বেশ খানিকক্ষণ কেটে যাবার পর এলো মীনু—পাশের বাড়ীর একটি মেয়ে, বয়স বছর সতেরো, এখনো বিয়ে হয় নি। দরজায় ঢুকতে ঢুকতে ডাক দিল—জল্‌দি বৌদি, জলদি!—অর্থাৎ কোথায় কার নিমন্ত্রণে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্য মীনু তাড়াতাড়ি সাজগোজ করবার তাগাদা দিচ্ছে। সাজগোজ করবার সমস্ত সরঞ্জামই ওর মজুত, কিন্তু কিছুতেই যেন গা' বইছে না, কোনো কিছুই করতে ইচ্ছে করছে না ওর। ওদিকে আবার শাশুড়ী ফিরে এসে বললো—কাপড়-চোপড় পরে নাও বৌমা—যাও মীনুর সঙ্গে।

মুখে কোনো কথা না বলে বৌটি ভিতরে ঢুকে কাপড় বদলালো, তারপর—আসি মা তাহলে—বলে মীনুর সঙ্গে বেরুলো। কিন্তু ওর মুখ দেখলেই বেশ বোঝা যায়—যেতে ওর মোটে মন নেই। কুমারী মীনু অতশত বোঝে না,—ঠাট্টা করে বললো,—বাবা, মুখ যে শুকিয়ে গেছে বৌদির—একটা শনিবার দাদা এলো না—তাই এতো?

—বিয়ে হোক—তারপর বুঝবি একটা শনিবার না-আসা কতখানি!

—সবাই তোমার মত কিনা?—মীনু ফের বল্‌লো।

—দেখা যাবে তখন!

গ্রাম্য-পথ বেয়ে চলে এলো দু'জনে জমিদার বাড়ীতে। প্রকাণ্ড প্রাসাদ, এগলি-সেগলি ঘুরে, বিশ দরজা পার হয়ে অন্দরে যখন এল, ততক্ষণ সেখানে বহু নারী জড় হয়েছে। সভার কাজও আরম্ভ হয়েছে।

কেয়া বলছে—আমার প্রিয় সখি সব! আজ এখানে যে আলোচনা করা হবে সেটা সকলের জানা। সীতা-চরিত্র আলোচনা করবো আমরা সাহিত্যের দিক থেকে। আশা করি, রামায়ণ সকলের পড়া আছে।

—হুঁ—হুঁ—হ্যাঁ—নানা রকমের সম্মতি-সূচক আওয়াজ বেরুলো।

মীনু বললো—ভালো করে পড়ি নাই।

—আচ্ছা, মন্দ করে তো পড়েছ ভাই? ওতেই হবে; শোনো।

রাজকুমারী কেয়া দেবী আরম্ভ করলো—"সাহিত্যের দিক থেকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সীতা-চরিত্র আলোচনা করে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। সেই বিশ্বশ্রেষ্ঠ সৃজনী-প্রতিভাকে আমাদের বন্দনা করা উচিত। আমরা সকলেই এখানে নারী, তাই নারী-জগতের সর্বজন-বরেণ্যা সীতা দেবীর চরিত্রই আজ আলোচনা করবো।

বাল্মীকির মানস-দুলালী সীতা বিশ্ব-সাহিত্যের এক আশ্চর্য্য অবদান। এমন লোকোত্তরসৃষ্টি পৃথিবীর কোনো সাহিত্যেই খুঁজে পাওয়া যায় না। জনম-দুখিনী সীতা—যাঁর নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আজো ভারতের ঘরে-ঘরে বৃদ্ধা-যুবতী-তরুণী-কিশোরী শ্রদ্ধায় আনতমস্তক, মহাকবি বাল্মীকি তাঁর চরিত্রটিকে কি অগাধ ঐশ্বর্য্য দান করেছেন—আলোচনা করে দেখা যাক।

যজ্ঞক্ষেত্র কর্ষণের সময় লাঙ্গলের সীতায় তাঁর উদ্ভব, কাজেই মাতা ধরিত্রীই তাঁর মাতৃস্থানীয়া। সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর কন্যা বলেই হয়তো সীতাও সর্ব্বংসহা—সকল সুখ-দুঃখের উর্দ্ধে তাঁর আসন। এই নারীর পরবর্ত্তী জীবনের ক্রম-পরিণতির ইতিহাসে দেখতে পাই—আত্মজা দুহিতাদের অপেক্ষাও রাজর্ষী জনকের অধিক আদরণীয়া তিনি—দিনে দিনে রূপ-যৌবনে অনবদ্যা হয়ে উঠলেন! প্রতিদিন তিনি প্রার্থনা করেন—যোগ্য পাত্রেই যেন তিনি অর্পিতা হন। অবশেষে একদিন শুভ-লগ্নে বা অতি অশুভ-লগ্নে রঘুবংশাবতংশ শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে গেল।

তরুণী সীতার তখনকার সুখ-সম্পদ যে-কোনো নারীর ঈর্ষার বস্তু; কিন্তু মাতা ধরিত্রীর কন্যা তিনি, সুখে-দুঃখে অবিচল থাকাই তাঁর জীবনের সাধনা। তাই শ্বশুর গৃহের সুখের কয়েকটি দিন অন্তঃপুরের অন্তরালেই কেটে গেল। বাল্মীকি তা নিয়ে কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি করেন নি।

পর এল লয় ভ্রষ্ট হওয়ার পথ—রাজ্যশ্রী সীতা, রাজকুলবধূ সীতা বল্কল বসনে অঙ্গ আবৃত করে চলেছেন বনে, প্রান্তরে, পর্ব্বতে। তাঁর চরিত্রের এই ঐকান্তিক নিষ্ঠায় মানুষের মন অভিভূত না হয়ে পারে না। কিন্তু এতেও তাঁর সর্ব্বসহিষ্ণুতা স্বীকৃত হয়না, কারণ, তাঁর সর্ব্বস্ব ধন জীবিতেশ্বর স্বামী রয়েছেন সঙ্গে; পুত্রাধিক প্রিয় দেবর লক্ষ্মণ পরিচর্য্যায় রত—বনেও তাঁর রাজ-ঐশ্বর্য্য! মহাকবি বাল্মীকি বনবাসে পাঠিয়েও তাঁর এই স্নেহ-দুলালীকে সম্রাজ্ঞীর চেয়েও সুখে রেখেছেন। কিন্তু তাঁর কাব্যের জন্ত সীতার দুঃখ অবশ্যম্ভাবী—কবিকে তাঁব স্নেহের দুর্ব্বলতা জয় করতে হোল!

নিষ্ঠুর নিয়তি এইবাব সীতাকে নিয়ে আবো উৎকট খেলা খেলতে আরম্ভ করলেন। রাবণের দ্বারা সীতা অপহৃতা হলেন! এইখানে সীতার ব্যক্তিত্ব সীতার নিজস্ব—কারণ, এখানে তিনি আর স্বামীর আড়ালে নেই। বিপুল পরাক্রমশালী বিশ্ববিজয়ী রাবণের গৃহ-বন্দিনী সীতা কতখানি মনোবলের পরিচয় এইখানে দিয়েছেন, তা ভাবলে তাঁর অগ্নি-পরীক্ষার কঠোরতাকেও তুচ্ছ বলে মনে হয়। আত্মসমর্পণের এবং আত্মসুখের সমস্ত কল্পনাকে তিনি নিঃশেষে অবলুপ্ত করে শুধু চেয়েছেন তাঁর পবিত্রতাটি রক্ষা করতে। কিন্তু মহাদুঃখে সুরক্ষিত সেই পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে যখন তাঁর প্রিয়তম স্বামী তাঁকে পরীক্ষা করতে চাইলেন—তখন, সেই দুঃখশেল তিনি সইলেন কেমন করে? অভিমানে কি তাঁর অধরোষ্ঠ বারম্বার স্ফুরিত হয় নাই? অথবা স্বামীকে অত্যধিক ভালোবাসার জন্ত এই অগ্নি-পরীক্ষা-দান তাঁর চরিত্রের নারীজনোচিত দুর্ব্বলতা? সীতার কি ঐ সময়েই পাতাল প্রবেশ করা উচিত ছিল না? কিন্তু মহাকবি বাল্মীকি তাঁর সীতাকে সর্ব্বংসহা করে গড়তে চান, তাই অগ্নি-পরীক্ষান্তে আবার তাঁকে রাজাসনে ফিরিয়ে আনলেন।"

রাজকুমারীর কণ্ঠস্বর আবেগে কম্পিত। বিষয়টিও জটিল। সাধারণ ঝিয়ে কন্যা-বধূরা এত সব শক্ত ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু

রাম-সীতার কথা ওদের ধর্ম্মের অন্তর্গত, কাজেই চুপ চাপ সব বসেই রয়েছে; কারো কোলের ছেলে কাঁদলে তার পাছায় চাপড় মেরে চুপ করতে বলছে—পরস্পর ফিস্ ফিস্ কথাও সাবধানে কইছে; মানে—কেয়ার কথাগুলো ওরা শোনবার চেষ্টাই করছে—তা ওরা বুঝুক আর নাই বুঝুক। রাজকুমারী অতখানা বলে এসে থামলো—আশা করছে, কেউ যদি কোনো প্রশ্ন করে; কিন্তু কেউ টুঁ-শব্দটিও করলো না। কেয়া আবার আরম্ভ করলো—"মাত্র কয়েকটা দিন—সন্তান-সম্ভবা সীতার নামে কলঙ্ক রটলো, সীতার কাছে সে সংবাদ অজ্ঞাত রেখেই নিষ্ঠুর স্বামী তাঁকে বনবাসে পাঠালেন। কেন? তিনি কি জানতেন না যে তাঁর সীতা অগ্নির মত বিশুদ্ধা? তিনি কি জানতেন না যে তাঁর সীতা স্বামীর, প্রজাদের কল্যাণের জন্য স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসন বরণ করে নিতে কুণ্ঠিত হবে না? স্বামীর জন্য যে-কোনো দুঃখ বরণ করে নিতে তো সীতার কখনো বাধে নাই! তথাপি রাম তাঁকে কিছুই জানালেন না; রাম-চরিত্রের এই কপটতা আর নিষ্ঠুরতা নারী-জগৎ কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না।

বাল্মীকির মানসকন্যা সীতা। পিতৃ-হৃদয়ের অগাধ স্নেহ-ধারা সিঞ্চিত করে ঋষি-কবি এই অতুলনীয় চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন। আপনার তাপস-মূর্ত্তিকে সীতার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়েও মহাকবির স্নেহদৌর্ব্বল্য বারম্বার সীতাকে ভোগৈশ্বর্য্যের মধ্যে আনতে চেয়েছে, আর বারম্বার বিড়ম্বিত হয়েছে। এই দুর্ব্বলতা পিতৃ-স্নেহের দুর্ব্বলতা! পিতা জনকের অগাধ ও অসীম কন্যাস্নেহে সীতাকে লালন করিয়েও ঋষি-কবির মন তৃপ্ত হতে পারেনি। তাই চিরবঞ্চিতা দুর্ভাগিনী কন্যাকে তিনি শেষে স্বীয় হোমাগ্নিপূত, শ্যামল ও শান্ত তপোবনের যত্নবর্দ্ধিত বল্লরীর মধ্যে স্থাপন করলেন। কিন্তু এখনো কবি অতৃপ্ত। সন্তান-সম্ভবা সীতার গভীর অন্তর্বেদনা, পুত্রবতী সীতার পরিপূর্ণ মাতৃমূর্ত্তি

বারম্বার কবির অন্তরকে প্রলুব্ধ করছে—সীতাকে তিনি সিংহাসনে পুনরধিষ্ঠিত করবেন—কিন্তু পারলেন না। তাঁর অলৌকিক কবি-প্রতিভাই তাঁকে বিরত করলো।

মূর্ত্তিমতী বিরহ-রূপিণী সীতার স্মৃতি-রক্ষার্থে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র সীতার স্বর্ণপ্রতিমা প্রস্তুত করালেন। রামের দ্বারা এই স্বর্ণপ্রতিমা প্রস্তুত করানো বাল্মীকির রচনা-চাতুর্য্যের অসামান্যতার পরিচায়ক। ধরানন্দিনী মৃণ্ময়ী সীতার স্বর্ণপ্রতিমা রাজৈশ্বর্য্যের বিপুল অহঙ্কার এবং শক্তির জয়পতাকা। শ্রীরামচন্দ্রের এই ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার সর্ব্বত্যাগী ঋষি-কবির অন্তরকে বেদনাতুর করে তুলেছে। মাটির মানবী সীতার মূর্ত্তি সোনা দিয়ে গড়া যায় না। সীতার অগাধ প্রেমের এই অপমান মহাকবির চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। যে রামচরিত্রকে তিনি লোকোত্তর করে সৃষ্টি করেছেন—সীতার স্বর্ণমূর্ত্তি-প্রস্তুত সেই রাম-চরিত্রের অনপনেয় কলঙ্ক। মহাপ্রেমিক রামচন্দ্র প্রজানুরঞ্জনের জন্য প্রিয়তমা পত্নীকে বিসর্জ্জন দিলেন, কিন্তু পত্নীর স্বর্ণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ তাঁর ধনগর্ব্বের পরিচায়ক হয়েই রইলো।

সীতার জীবনে আবার সেই বন! পিতার মত স্নেহময় ঋষি বাল্মীকির স্নেহচ্ছায়ায় প্রিয়-বিরহক্লিষ্টা সীতা যুগল কুমারকে নিয়ে দিন যাপন করেন। এখানে তাঁর সান্ত্বনার অবলম্বন ঐ দুটি শিশু। আবার সুখের ডাক এল—ফিরে যেতে হবে রাজধানীতে। সেখানে গিয়ে আবার সেই পরীক্ষার কথা উঠলো! মহাকবি বাল্মীকি এতদিন পরে যেন বুঝলেন—মাতা ধরিত্রী সর্ব্বংসহা হ'তে পারেন, কিন্তু তাঁর কন্যার পক্ষে এত বেশী অসম্মান সহ্য করার শক্তি থাকা উচিত নয়। তাই অশ্রুসজল চক্ষে বাল্মীকি তাঁর মানস-নন্দিনীকে এইখানে বিসর্জ্জন দিয়েছেন।

সীতার সব ছিল—বিশ্ববরেণ্য স্বামী, বিপুল রাজৈশ্বর্য্য, গভীর প্রেম আর পরম নিষ্ঠা। শুধু অপমানের আঘাতেই মর্ত্তের এই অদ্বিতীয় নারী-চরিত্রটি মাটির সঙ্গে মিশে গেল অকালে। সীতার চরিত্রে

মহাকবি তাঁর অনুভূত সত্যকেই রূপায়িত করেছেন—"নারী তার প্রিয়তমের জন্য সবই সইতে পারে, শুধু সইতে পারে না প্রিয়কৃত অপমান।" সীতাকে আবার অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনবার জন্য বাল্মীকির চেষ্টার অন্ত ছিল না, কিন্তু রাম-চরিত্র প্রজার কল্যাণেই পর্য্যবসিত। আপনার অন্তরতমাও সেখানে অগ্রাহ্য—তাই আবার পরীক্ষার কথা উঠলো। রাম চরিত্রের পক্ষে এইটাই ঠিক এবং স্বাভাবিক—কিন্তু পিতা বাল্মীকি কন্যার অপমান আর সইতে পারলেন না। ধরিত্রীকন্যাকে ধরার ধূলায় অবলুপ্ত করে দিলেন। সীতার জীবনের এই অনিবার্য্য পরিণতিকে রূপায়িত করতে গিয়ে কী নিবিড় বেদনায় যে কবির অন্তর বারবার কেঁদে উঠেছে—কতখানি অশ্রুসলিলে সিক্ত হয়ে গেছে তাঁর লেখনী-ভূর্জপত্র—আজ এতকাল পরেও সেটা আমরা অনুভব করতে পারি।"

কেয়া থামলো। বসে পড়লো ওর চেয়ারটায়। ওর ইচ্ছে—অন্য দু'একজন কেউ কিছু বলুক; কিন্তু কেউ কিছুই বলতে চায় না। নিরাশ হয়ে আবার উঠে বললো—বিষয়টা কঠিন; আপনাদের ঠিকমত আমি হয়তো বোঝাতে পারলাম না—তাহলেও আপনারা শুনেছেন এতখানি ধৈর্য্য ধরে, এর জন্যে ধন্যবাদ দিচ্ছি আমি। আগামী শনিবার সাবিত্রী চরিত্র নিয়ে আলোচনা করতে হবে। আপনাদের মধ্যেই কেউ একজন সেটা করবেন—এইটাই আমি আশা করছি।

সভার সকলেই নীরব রইল। কেয়া একটু হেসে বললো—লজ্জার তো কোনো কারণ নেই ভাই! কেন আপনারা এত সঙ্কোচ করছেন? আমরা সাধারণভাবে মহিলা-সমিতি করে সেলাই-বোনা শেখানো—রান্না-বান্না নিয়েও আলোচনা করতে পারি, কিন্তু আরো একটু উচ্চস্তরের আলোচনা কেন আমরা করবো না?

একটি মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো—আমাদের বিদ্যে-বুদ্ধি বড্ড কম রাজকুমারী।

—নিজের উপর এতখানি অশ্রদ্ধা রাখা ঠিক নয় ভাই। আমাদের বিদ্যে-বুদ্ধির মতই না হয় আমরা আলোচনা করলাম—তাতে তো বাধা নেই! আগামী শনিবার কি বিষয়ে আলোচনা হবে—আপনারাই ঠিক করুন তাহলে!

মিনু বৌটিকে বললো—চল বৌদি যাই! ওর নিশ্চয় ভাল লাগছে না।

বৌটি বললো—থাম্—তারপর আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বললো—রাজকুমারী, আমরা তো মুখ্যু—তুমি যা বলছো তা' শুনতে খুবই ভাল লাগলো; ইচ্ছে করছে, রোজ এসে শুনি, কিন্তু আমি শনিবার আসতে পাই না—আমার মতন অনেকেই আসতে পায় না। যদি হপ্তার মাঝের কোনোদিন এমনি করে সবাই মিলতে পারি…!

—আসতে পাও না কেন? শনিবার কি বেশি কাজ আছে তোমার?—কেয়া প্রশ্ন করলো।

বৌটি চুপ করে রয়েছে,—ওর সাথী মীনু বলে দিল—দাদারা সব আসে যে শনিবারে!

—ওঃ—কেয়া মৃদু হেসে বললো—সত্যি, আমার এদিকটা খেয়াল ছিল না। আচ্ছা ভাই, এবার থেকে বৃহস্পতিবার আমাদের অধিবেশন হবে। কেমন?

—সবাই একসঙ্গে বললো—হ্যাঁ, তাহলে খুব ভাল হয়।

মীনুকে সঙ্গে নিয়ে বৌটি চলে আসছে—হঠাৎ নজরে পড়লো একধারে বসে-থাকা একটি লোকের উপর। কাছে গিয়ে ভালো করে দেখে হঠাৎ উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো—বাবা!

লোকটি ওর দিকে তাকিয়ে একেবারে দাঁড়িয়ে উঠে বললো—হ্যাঁরে মা, আমি—ভালো আছিস্?

লোকটি আর কেউ নয়—নাজির।

রাজকুমারী কেয়াদের বাড়ীতে অপ্রত্যাশিতভাবে নাজিরকে দেখতে

পেয়ে মেয়েটি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল! একেবারে নাজিরের কোলের কাছে এসে বললো—ভাল আছ বাবা ?

বিস্ময়ের মুহূর্ত্তকয়টা কাটিয়ে নাজির হাসলো—পিতার স্নেহ-গৌরবভরা মুখের মিষ্ট হাসি—বললো—তু ইখানে থাকিস মা? ভুলে গেছিলাম তুর শ্বশুর ঘরের গাঁয়ের নাম! কোন্ বাড়ী রে মা?

—এসো বাবা—চলো তোমার মেয়ের বাড়ী!

—হুঁ, চল্ যাই—বলেও কিন্তু নাজির তক্ষুনি এগুচ্ছে না—কি জন্যে যেন ইতস্ততঃ করছে!

কেয়া দূর থেকে দেখলো—ঐ বৌটি নাজিরের সঙ্গে কথা বলছে। কাছে এসে বললো—আলাপ আছে নাকি দাদু?

—হুঁ, উ তো আমার মেয়ে। চ বেটি, চ, তুর ঘর দুয়োর দেখে আসি। আমি একটুক্ আ্যসছি দিদি-রাণী!

—কিন্তু বেশি দেরি কোরো না দাদু—মণ্টু বাবু আবার খুঁজবে।

—না!—বলে নাজির এবার স্বচ্ছন্দে এগিয়ে চললো বৌটির সঙ্গে।

মীনু শুধুলো—কে বৌদি? তোমার বাপের বাড়ীর?

—হুঁ—আমার বাপজান্!—হাসলো বৌটি!

নাজির পথে যেতে যেতে বললো—তোর সঙ্গে আবার দেখা হবে মা, ইকথা কখনো ভাবি নাই! সব ই খোদাতাল্লার দয়া মা—না হলে কি আর হোতো!

—তুমি কিন্তুক আমাকে চিন্‌তে পার নাই বাবা।

—আমি কি করে চিনবো রে বেটি—তু যে মা ঘোমটা দিয়েছিলি, না হলে ঠিক চিনতাম। নিজের বেটিকে কেউ আবার চিন্‌তে না পারে?

ঘরে এসে পৌছালো ওরা। পরিচয়টা কি ভাবে দেবে তার শাশুড়ীর কাছে, তাই ভাবছে বৌটি। কিন্তু শাশুড়ী নিজেই এসে আদর করে নাজিরকে ডেকে বললো—আসুন বে'ই মশাই—ছেলে আজ আসে

নাই, দিথা হোল না, তা আপনার মেয়ে তো আছে।—বলে বৌটির উদ্দেশে বললো—ও বৌমা, তোর বাপজানকে জলটল খাওয়াও বাছা, আমি ঘাটে কাপড়খানা কেচে আসি!

সন্ধ্যা তখনো ভালো করে ঘনিয়ে আসেনি—দিনের আলো স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। নাজির ঘুরে ঘুরে মেয়ের ঘরদোর দেখতে আরম্ভ করলো! সর্ব্বত্র একটি পবিত্র শ্রী, সমস্ত বাড়ীর আনাচে-কানাচে পর্য্যন্ত একটি মার্জ্জিত রুচির হাত যেন জড়িয়ে রয়েছে সব সময়! বড্ড ভালো লাগছে নাজিরের। বাড়ীর পিছন দিকে মস্ত একটা স্থলপদ্মের গাছ—অজস্র ফুল ফুটে রয়েছে—বড় বড় গোলাপী রঙের ফুল। ডাল নুয়ে নাজির চার পাঁচটা ফুল তুলে নিল। তারপর সামনের দিকে আসছে—ওদিকে বৌটি ডাকাডাকি করছে—বাবা—ও বাবা—!

—যাই মা—যাই—এই যে আমি!

নাজির এপাশে এসে ফুলক'টি নামিয়ে রেখে বললো—অত ফুল ফুটে, তুলিস না কেন রে মা! পূজো টুজোতে লাগে না তোর?

—লাগে বাবা—সকালে তুলেছে মা! খুব বেশি ফুল ফোটে, কত আর তুলবো! নাও, জল খাও! তুমি কবে ইখানে এসেছ বাবা?—

—আজ সকালে! খোকনের ছোট ভাই মণ্টু এল কি না— উওর সঙ্গে খোকন আমাকে পাঠালো। ইখানে তো মণ্টু আসে নাই কখনো, তাই খোকন সঙ্গে দিল আমাকে।

—খোকন কে বাবা?

—খোকন আমার দাদু—নাতি আমার! ও হ্যাঁ—তু কি করে জানবি! ঐ যে রাজকুমারী ইস্কুল না কি করছে যার নামে, সেই চন্দলিখা ছিল খোকনের বোনের মতন। খোকন উয়োকে খুব ভালোবাসতো! উয়োর হারানো খবর পেয়ে খোকন আট দশ দিন ভালো করে খায় নাই, —ঘুমোয় নাই!

বৌটি কি বুঝে চুপ করে রইল একটুক্ষণ, তারপর বললো—ওঁর ভাই কি জন্যে এসেছেন? তিনি এলেন না কেন?

—উ আসতে পারল না মা—কত রকমের কাজ উওর। রাজকুমারী লিখেছিল যে খোকন যেন একদিনের জন্যেও আসে—কিন্তুক খোকনের সময় কৈ?

—আর কে এসেছে বাবা?

—আর কোলকাতা থেকে সেই লিখাদিদির ভাই আসবে; ছুটো ভাই। আমি তো উয়োদের চিনি না মা—আমি ইখান থেকে আবার খোকনের কাছে ফিরে যাব—মণ্টু ঘর চলে যাবে! কাল ঐ ইস্কুলে পিথম কিলাস খোলা হবে!

—হুঁ—শুনেছি! তোমার ছেলে আজ এল না বাবা—দেখা হোল না! দু' একদিন থাকবে না তুমি?

—না মা—আমাকে পরশু ফিরতে হবে!

কথা বলতে বলতে নাজির খাচ্ছিল! মেয়েটি ওব কাছেই বসে রয়েছে। নাজির হঠাৎ বাবার মতই স্নেহের অধিকারে ওকে প্রশ্ন করে বললো—হ্যাঁ রে মা, তু বেশ সুখে আছিস তো? বর বেশ ভালোবাসে?

মেয়েটি সলজ্জে মুখখানা একটু নীচু করে আস্তে বললো—হুঁ!

মধুর হাসিতে মুখখানা ভরে গেল ওর। নাজির তাকিয়ে দেখছে। ছোট দু'টি কোমল হাতে চা তৈরী করতে করতে মেয়েটি বললো,—তোমার সেই মকা না কোথা বলেছিলে—যাবে না বাবা?

—যাবো মা—যাবো! খোকনদাদা আমাকে সিথানে পাঠাবে বলেছে! আচ্ছা মা—তুর স্বোয়ামী কি হপ্তায় আসে, নাকি দু'এক হপ্তা বাদ যায়?

—সব শনিবার আসতে পায় না বাবা—কাজ থাকে। এই আজ তো শনিবার, আসতে পারলো না—কি নাকি কাজ আছে!

নাজির চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। এক ঢোক চা খেয়ে বললো—তা তুই ওখেনে যাসনে কেনে মা—তুর সোয়ামীর কাছে!

—নিয়ে গেলে তো যাবো বাবা! ইখানে শাশুড়ী একলা। তাকে কে দেখাশুনো করবে!

—হুঁ!—নাজিরের যেন বেশ ভাল লাগছে না কথাটা! এতটুকু মেয়ে, স্বামীর কাছে আদর-সোহাগে থাকবে, তা না—এই অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে আছে! নাজির যেন এই মেয়েটির জন্য বেদনা বোধ করছে।

বৌটি বললো—চা খাও বাবা! চা ভাল হইছে?

—হুঁ মা, খুব ভালো হইছে। কাজলদিদির মতনই হইছে!

—কাজল—কে বাবা!

ঐ যে খোকনদাদা, উয়োর বৌ—আর ছেলটোর নাম কাটিম!

—কোথা থাকে উওরা সব?

—সে অনেক দূর মা—শিয়েলদহাটা! সে কি ই স্থাগে! একবারে সেই হিল্লি-দিল্লীর উদিকে! যাবি একবার; আমি খোকনকে বলে তুকে নিয়ে যাওয়াবো একবার। কী সোন্দর স্থাশ মা, দেখলে চোখ জুড়োয় যেন।

—আমাকে তা'হলে নিয়ে যাবে বাবা! সত্যি?

—হুঁ, নিচ্চয় নিয়ে যাব! জামাই থাকলে আজই বলতাম কথাটা!

—উ বড্ড কি রকম মানুষ বাবা! রাজিই হবে না হয়তো!

—কেনে? নাজির প্রশ্ন করলো ব্যগ্রভাবে!

মেয়েটি চুপ করে রইলো একটুখানি। নাজির আবার বললো—কেনে মা? নিয়ে যেতে আপুত্তি কিসের? খোকন আমার কি যে ভাল ছেলে—দেখলেই টের পাবি।

—তা তো পাবো বাবা, দেখবার ভাগ্যি হলে তো? মেয়েটির মুখে কুণ্ঠার হাসি ফুটলো! নাজির বুঝলো, কোথায় যেন ব্যথা আছে। কি যেন গোপন রয়েছে ওর অন্তরের অন্তস্থলে। নিতান্ত অল্পপরিচিতা এই

বৌটি—শুধু আন্তরিকতার জন্যেই পথের আলাপ আজ ঘরের আত্মীয়তায় উঠে এসেছে। আর কিছু প্রশ্ন করা উচিত হবে কিনা নাজির ভাবতে লাগল! এক্ষণে শাশুড়ী ফিরে এল ওর। উঠোনে ঢুকে প্রথমেই বললো—বৌমা, খাবার দিয়েছো তোমার বাপজানকে?

—হুঁ, জবাব দিল বৌ। শাশুড়ী একচোখ দেখে নিল নাজিরকে, খাচ্ছে!

—আপুনি রাজবাড়ীতে এসেছেন—না বে'ই মশাই?

—হুঁ—

—খান ভালো করে। বৌমার বাপের বাড়ীর সব ভাল আছে? ওর বাবার অসুখ ছিল!

—আমি পচ্ছিম থেকে আসছি যে বে'ন ঠাকরুণ। ত্যাশ থেকে তো আসছি না!

—ওঃ, থাকেন বুঝি পশ্চিমে?

—হুঁ—আমার নাতি সাহেব থাকে কিনা—তার কাছেই থাকি। নাতি, নাতবৌ, উয়োদের ছেলে কাটিম—উয়োরাই আখুন আমার সব। ছোট নাতি মণ্টু ও ছিল উখানে। ঘরে যাবার পথে ইখানে এলো। আমি তার সঙ্গে এসেছি। ইখান থেকেই আমি পচ্ছিম চলে যাব।

—দেশে একবার যাবে না বাবা?—বৌটি প্রশ্ন করলো।

—নারে মা—যাবার সময় কৈ! খোকন আবার দিল্লী না কোথা যাবে, তার আগে আমাকে যেতে হবে—না হলে কাজলদিদিকে দেখবে কে!

—ও হ্যাঁ!

অতঃপর খানিকক্ষণ নীরবতায় কাটল। নাজির এখনো জানে না, মেয়েটির কি নাম। এত কথার পর সেটা শুধুতে ওর কেমন যেন লজ্জা করছে। কিন্তু নামটা জেনে নিতে হবে, তাই কৌশল করে বললো,

—তোকে চিঠি দিতে হলে ঠিকেনা তো চাই মা—লিখে দে দিখিনি।

—দি—বলে মেয়েটি উঠে গিয়ে ছোট্ট এক টুকরো কাগজে লাল

কালিতে লিখে নিয়ে এল—"শ্রীমতী চারুশশী দাসী—গ্রাম—তাপসীপুর, পুষ্টোপিস—ঐ। শ্রীযুক্ত বাবু হরেকিষ্ট সরকারের বাড়ী পৌঁছে।"

নাজিরের কাছে নামিয়ে দিল কাগজখানা।

নাজির এক চোখ দেখে নিয়ে বললো—লাল কালি কেনে মা?

—কালি কুথা পাব বাবা! আলতার কালি! উ যিদিন আসে সিদিন উওর কলম থাকে—সেই যে কি বলে ফাউনটান নাকি! আমি আলতাতেই চিঠি লিখি!

—বেশ করিস! নাজির কাগজটুকু গুটিয়ে ফতুয়ার পকেটে রাখলো। উঠতে যেন ইচ্ছে করছে না ওর। আরো কত কথা জানবার আছে। এই মেয়েটি যেন ওর নিজেরই মেয়ে! এর মা-বাবা ভাই কাউকেই ও চেনে না, অথচ এর সঙ্গে কতখানি নিবিড় আত্মীয়তা জমে উঠেছে। যদি ওকে কেউ প্রশ্ন করে ওর বাপের বাড়ীর সম্বন্ধে, তাহলে নাজির বলবে কি! কিন্তু প্রশ্ন কেউ করলো না—নাজির উঠলো।

—যাবার সময় দিখা করে যেও বাবা—হেই বাবা, ভুলে যেও না!

—নারে মা—ভুলবো কেনে! কাল আবার আসবো!

নাজিব বেরিয়ে এল। চারু এল ওর সঙ্গে দরজা পর্য্যন্ত। কত যেন নিকট আত্মীয়তা, কত যেন অন্তরের বন্ধন! নাজির পথে নেমে আর একবার তাকালো ওর মুখের দিকে। আনন্দ-বেদনায় কোমল মুখখানি। কালো কালো পাতার স্নিগ্ধ-স্বচ্ছ জলভরা চোখ দু'টি, কাজলের মতই সুন্দর —বরং আরো কচি—আরো কোমল, আরো অসহায় যেন।

—আমি আবার কাল আসবো মা।—বলে নাজির চলে এলো।

চলে এলো, কিন্তু মনটা যেন রেখে এল চারুশশীর কাছেই। চারু যদি ওকে তার বাড়ীতে থাকতে বলতো—তাহলে থেকেই যেত হয়তো। নাজির আস্তে আস্তে পথ হাঁটছে। রাজবাড়ীটা দূর থেকেও দেখা যায়। গ্রামটা খুবই বড়—চারুর বাড়ী রাজবাড়ী থেকে অনেকটা দূরে—প্রায় দশ

মিনিটের রাস্তা। নাজির আপন মনে কত সব কথা ভেবে চলেছে।

* * *

মণ্টু বড্ড একলা বোধ করছিল! কাজটা চুকে গেলে ও বাড়ী চলে যাবে। এখানে ওর একদম মন টিকছে না। জানা নেই, শোনা নেই—এ এক অদ্ভুত জায়গা তার কাছে। দাদা পাঠিয়েছে, কাজেই ও কিছুই বলছে না মুখে, কিন্তু ক্রমাগত বিরক্ত হচ্ছে! দাদু আবার গেল কোথায়? বাইরে এসে দু'একজনকে জিজ্ঞাসা করলো! বিরাট প্রাসাদের মালিকের চাকরবাকররা মালিক ছাড়া অন্য কারো খোঁজ রাখার প্রয়োজন মনে করে না—কাজেই কেউ কিছুই বলতে পারলো না নাজির সম্বন্ধে! কেয়া অবশ্য জানে, কিন্তু কেয়ার সঙ্গে যখন তখন দেখা হওয়া সম্ভব নয়। মণ্টু তাই রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো দাদুর খোঁজে! খানিকটা এলেই নতুন বাড়ীখানা চোখে পড়ল—প্রকাণ্ড ইমারৎ—এখনো শেষ হতে কিন্তু অনেক বাকি! ফটকে বড় বড় অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লেখা হচ্ছে—"তমসো মা জ্যোতির্গময়"—তার নীচে বাংলা অক্ষরে লেখা—"চন্দ্রলেখা কলাকেন্দ্র" স্থাপিত ১৩৫০ সাল—বৈশাখী পূর্ণিমা"।

কালই ঐ কলাকেন্দ্রের উদ্বোধন হবে! দাদা নিজে এলেই পারতো। মণ্টু এ সব ব্যাপারের কতটুকু বোঝে যে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল? যদি কেউ কিছু বক্তৃতা করতে বলে তো কি বলবে মণ্টু? শেষটায় কি তার দাদার নাম ডোবাবে নাকি?

মণ্টু ভাবছে—ললিত কলা এবং কৃষ্টি সম্বন্ধে কতটুকু তার জানা আছে—দরকার হলে যা হোক বলতে পারবে। নাঃ, বিশেষ কিছুই মনে পড়ছে না। রাজবাড়ীর রাধাগোবিন্দ মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজছে—, শুনতে লাগল মণ্টু। হ্যাঁ, এই একটা কৃষ্টির জিনিষ—আর ঐ যে ধুনিতে ধুনিয়ে আরতি করা হয়—ওটাও। বৌদি বেশ আরতি করতে পারে—না, না—বৌদির উল্টু ভারি মিষ্টি—এগুলো তো সবই কৃষ্টির কথা।

আল্‌পনা দেওয়া—নৈবেদ্য সাজানো—নমস্কার করা—এই সবই কৃষ্টি অর্থাৎ কি না কালচার—দরকার হয়তো মণ্টু দেবে বলে এই সব কথা।

—ইখেনে কোথা দাদু—নাজির পিছন থেকে ডাক দিল।

—তুমি দাদু যেন কী—আমাকে না বলে কোথা গিয়েছিলে? মণ্টু ভ্রূকুটি করে শুধোলো। নাজির বুঝলো, ও রেগেছে—হেসে বললো, —আমার বিটির ঘর যে ইখানে—কাল তোমাকে দেখিয়ে আনবো।

অবাক হয়ে মণ্টু বললো—তোমার বিটি? কোন্ পক্ষের?

—কুনো পক্ষের নয় ভাই—পথের মাঝে পাওয়া—চলো।

মণ্টু ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

২

কাজলের রান্না শেষ হয়ে গেছে—কিন্তু অঞ্জন এখনো আসে নি! মণ্টু আর নাজির গেছে বাংলাদেশে—কাটিম ঘুমুচ্ছে। কোনো কাজ নেই কাজলের হাতে; চিন্তাটা তাই পেয়ে বসলো ওকে!—চন্দ্রলেখার চিন্তাটা—অঞ্জন যার জন্যে অনুতপ্ত। চন্দ্রলেখার বিচিত্র জীবন নিয়ে অঞ্জন আজ কয়েক সপ্তাহ যাবৎ চিন্তা করছে, বিষণ্ণ হয়ে রয়েছে। আর সেই সঙ্গে তার অন্তরচারিণী কাজলও বিষণ্ণ, বিমর্ষ হয়ে উঠেছে। কোথাকার কে চন্দ্রলেখা যাকে ভালো করে চিন্‌বারও অবকাশ মেলেনি—তারই জন্যে কাজলের সর্ব্বস্বধন স্বামী চিন্তিত হবে, অনুতাপ করবে—শরীর খারাপ করবে, এ যেন অসহ্য ওর কাছে!

হোয়েছিল কি মেয়েটার! কিসের জন্য ও এমন করে নিজেকে নিঃশেষ করে দিল? কিছুই কেউ বুঝতে পারে নি। লেখার দাদার একখানা চিঠিতে প্রথম জানা গেল—লেখা নাই। তারপর কেয়া নামে কোন এক একান্ত অপরিচিতা মেয়ের চিঠিতে জানা গেল—, "লেখার বিয়ে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছিল—গায়ে হলুদের আগের দিন

সন্ধ্যায় সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।" কেন, কিসের জন্যে সে নিরুদ্দেশ হোল—কেউ তার কোন খবর জানে না। এমন কি, লেখার দাদা পলাশও সে সম্বন্ধে কোনো আলোক দান করেন নি। চোখের জল মুছতে মুছতে পলাশ কেয়ার হাতে একটা মোটা টাকার চেক লিখে দিয়ে গেছে, বলে গেছে, ঐ গাঁয়ে যেন লেখার নামে একটি স্মৃতি-মন্দির তৈরী করা হয়। কেয়া নিজে আরো কিছু টাকা দিয়ে সেই স্মৃতিমন্দির তৈরী করছে—তারই উদ্বোধন হবে কাল। অঞ্জনের নিমন্ত্রণ এসেছিল, কিন্তু সে গেল না—পাঠিয়ে দিল ছোটভাই মণ্টুকে, সঙ্গে গেল দাদু নাজির। মণ্টুকে পাঠাবার একমাত্র কারণ—লেখার একটি মূল্যবান অটোগ্রাফের খাতা অঞ্জনের কাছে গচ্ছিত ছিল—ঐ স্মৃতিমন্দিরে সেটা রক্ষা করা হবে—এই জন্যে মণ্টু সেটা নিয়ে গেছে। অটোগ্রাফের খাতাটির পাতায় বহু বিখ্যাত আর বিচিত্র ব্যক্তির নামসহি এবং দু'চার লাইন কবিতা বা আশীর্ব্বাদ টোকা আছে। অঞ্জনের হাতের লেখা নেবার জন্যই লেখা ওটা একদিন তাকে দিয়েছিল। কিন্তু সময়াভাবে অঞ্জন লিখে উঠতে পারে নি, হয়তো মনেও ছিল না। সেদিন কাজল সেটা বা'র করেছিল। জিনিষটা আজ মূল্যবান হয়ে উঠেছে অঞ্জনের এবং লেখার অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের কাছে। মণ্টু যখন বাড়ী যাবেই, তখন এটা নিয়ে তাপসীপুরে গিয়ে কেয়া দেবীকে দিয়ে যাবে। নিমন্ত্রণও রক্ষা করা হবে—কাজটাও ভালভাবেই হবে! এই উদ্দেশ্যে অঞ্জন মণ্টুকে পাঠিয়েছে, আর নাজিরকে সঙ্গে দিয়েছে। যদি ইচ্ছা হয় তো নাজির একবার দেশে ঘুরে আসুক। না হয় তো তাপসীপুর থেকেই ফিরে আসবে। ঐ অটোগ্রাফের শেষ পাতায় অঞ্জন লিখেও দিয়েছে:—

"আকাশের কোলে অসংখ্য তারা অনন্ত কাল রয়েছে ফুটি,
চিনি চিনি করি—যায় না চেনা,

ক্ষণেকের তরে এসেছিলে তুমি—নীল নীল সেই নয়ন দুটি
চেনা হয়ে গেছে—ভুল হবে না।
কত ফুল ফোটে বনে-উপবনে, কত নাম, কত গন্ধ ভরা,
কত রূপ নিয়ে নিত্য আসে—
তুমি এসেছিলে স্বর্গের ফুল—তব নিমেষের ফোটা ও ঝরা
রেখে গেলে মোর দীর্ঘশ্বাসে।"

কবিতাটা পড়ল কাজল। অটোগ্রাফের খাতা থেকে নয়—ও কপি করে নিয়েছিল অন্য একটা কাগজে। স্বামীর অন্তর যে ঐ নিরুদ্দিষ্টা মেয়েটির উপর কতখানি শ্রদ্ধাশীল, কতখানি ভালবাসায় পূর্ণ, তা জানে কাজল—আরো ভাল করে জানলো আজ। পূর্ব্বে ওতে কিন্তু কাজলের ঈর্ষা জাগতো না, বরং গর্ব্ব অনুভব হোত। তার স্বামীকে—এমন সব বড় বড় লোকের এতো সুন্দর সুন্দর—এমনি লেখাপড়া জানা কলকাতার মেয়েরা ভালোবাসে! কাজলের নিশ্চয় গর্ব্ব হবার কথা এবং হোতও। কিন্তু আজ কেমন যেন ওর মনটা ভারী হচ্ছে! কেন? ও কি স্বামীকে ঠিক সেই চোখে দেখে না? দেখে ঠিক, তেমনি ভালোবাসে কাজল তার স্বামীকে—না একরত্তি কম নয়- কিন্তু তবুও মনটা ভারী হচ্ছে ওর। অন্য একটি মেয়েকে তারই স্বামী কবিতা লিখে শ্রদ্ধা জানিয়েছে—স্তুতি করেছে—যদিও সে-মেয়ে মৃত কি জীবিত, জানা নেই—এখন মৃতই সাব্যস্ত হয়ে গেছে—তবু কাজলের যেন সহ্য হচ্ছে না। কেন যে কাজলের এমন ক্ষুদ্রতা! ওর স্বামীকে আর কেউ ভালবাসলে ওতো আহত হোতই না বরং আনন্দ পেত, কিন্তু ওর স্বামী অন্যকে ভালবাসলে—হোক না সে মৃত কেউ—কাজল কি সত্যি সইতে পারবে না? সেই কথাটাই কাজল ভাবছিল। কিন্তু তার নারী-অন্তর তারস্বরে চীৎকার করে উঠলো—না-না, সে পারবে-না সইতে। কেন পারবে না, তা সে জানে না।

ভাবতে ভাবতে কাজলের মনটা সত্যিই ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলো। অতি অল্প সময়ের জন্য দেখা একখানা সুন্দর মুখ ওর মনের পটে আবছা ছায়া বিস্তার করছে। ভালো করে মনে পড়ে না—আবার মনেও পড়ে! খাটো, কালো কোঁকড়া চুল। ঠোঁট দুটোর লালছে লোলুপতা আর চোখ দুটোর নীল বিষাক্ততা ওর যেন মনে পড়ছে। সুন্দর ছিল সে নিশ্চয়—কিন্তু কী এমন বেশী সুন্দর! কাজলের সৌন্দর্য্য ওর থেকে কিছু কম নয়। ওর রঙ একটুখানি ফর্সা ছিল—কিন্তু গড়ন! কাজলের অঙ্গ সুষমা যে কতখানি অসাধারণ তা ও এখন জেনেছে। ও জেনেছে, ও সুন্দরী! ওর রূপ যে-কোনো পুরুষের পূজার যোগ্য! এতটা ও আগে জানতো না—জানবার ইচ্ছাও করেনি কোন দিন—ওকে জানিয়ে দিয়ে গেছে একজন—হ্যাঁ, শিলাজিত ওকে জানিয়ে দিয়ে গেছে—ও অপরূপ সুন্দরী। গ্রাম্য-কাজলের অন্তরে সেই সেদিন থেকেই বুঝিবা সহরের ছোপ লেগে গেছে!

কাজল জেনে ফেলেছে, তার সুন্দর স্বামী তাকে অমনি অমনি এতখানি ভালবাসে না—কাজলও সুন্দর! খুবই সুন্দর! এত সুন্দর যে একজন বিলেত ফেরৎ শিল্পী তাকে ভালোবাসবার জন্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল—অবাক হয়ে গিয়েছিল তাকে দেখে। এই সৌন্দর্য্যবোধ কাজলের ছিল না। ও অপরের চোখে প্রথম দেখলো নিজের অতুলনীয় রূপরাশিকে। স্বামীর চোখে নয়—অন্য এক পরপুরুষের চোখে—যে চোখ কল্পনায় মদির—আর কামনায় উচ্ছৃঙ্খল!

তার কথা অবশ্য ভুলেই গিয়েছে কাজল। কোনো প্রয়োজনই ওর আর নেই তাকে মনে করে রাখবার—কিন্তু ঐ লোকটিই জানিয়ে দিয়ে গেছে—কাজলও দেহের দিক দিয়ে পরম লোভনীয়া। সেই লোকটিকে নমস্কার করা উচিত কাজলের।

এতক্ষণে অঞ্জন ফিরে এল—বাড়ী ঢুকতে ঢুকতে বললো—তোমার মাধবীলতা ফুলগাছটা ছাগলে খেয়ে গেল কাজল।

অসম্বৃতা কাজল উঠে বসলো, চেয়ে দেখলো—উঠানে মাধবীলতাটা কোন্ একটা ছাগল এসে মুড়িয়ে খেয়ে ছুটে পালাচ্ছে অঞ্জনের তাড়া খেয়ে। আপন চিন্তায় বিভোর থাকার জন্যে কাজল এদিকে তাকায় নি। অঞ্জন দুঃখ করে বললো,—আহা-হাঃ! একেবারে শেষ করে দিয়েছে।

—যাক্ গে—বলে কাজল দাঁড়িয়ে উঠলো। গাছটা ওই কাজলই কিনে এনে লাগিয়েছিল মাস কয়েক আগে। যত্নও করে খুবই। অঞ্জন ভেবেছিল—গাছটা ছাগলে খাওয়ায় কাজল খুবই দুঃখ পাবে; কিন্তু দুঃখ তো সে পাচ্ছে না—বরং অঞ্জনের দুঃখ দেখে বিরক্তই হচ্ছে! অঞ্জন ওর মুখের দিকে চাইল—হ্যাঁ, কাজল বিরক্ত হয়েছে। ফিরতে তার দেরী হয়েছে বলেই হয়তো এই বিরক্তি! বারান্দায় উঠতে উঠতে বললো—বড্ড দেরী হয়ে গেল আমার; খুব রেগে উঠেছো তো? মিষ্টি হাসি লেগে রয়েছে ওর মুখে। কাজল কিন্তু মুখখানা ফিরিয়ে বললো—রোজই তো হয় দেরী—রেগে আর লাভ কি?

বিস্মিত হোল অঞ্জন, কিন্তু বুদ্ধি তার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ; বুঝলো, কোনো একটা বিরক্তিকর চিন্তা কাজলের মনকে বিড়ম্বিত করেছে। কী সে চিন্তা—বর্তমানে ভেবে দেখা দরকার মনে করল না অঞ্জন। জামা কাপড় ছেড়ে স্নানের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কাজল এটা সেটা এগিয়ে দিল। স্নান সেরে স্তোত্রপাঠ করতে করতে অঞ্জন তাকালো কাজলের মুখের পানে। কেমন যেন কুঞ্চিত দুর্বোধ্য কালিমা ওর মুখে। অঞ্জনের সদাহাস্যময়ী অন্তর-লক্ষ্মী কাজল-ওর স্নেহবিগলিত-হৃদয়া স্বামীপরায়ণা সলজ্জা পল্লীবধূ কাজল—হোল কি ওর? অঞ্জন বেশ চিন্তিত হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। কাজল ঘি গরম করে স্বামীর পাতে ঢেলে দিচ্ছে—আঁচলের খুঁটে ধরেছে ও গরম বাটিটা—বাঁ হাতে লেবুর টুকরো দুটো। অঞ্জন

আবার তাকালো মুখের দিকে—নাঃ, কাজলকে এখনো প্রসন্ন দেখাচ্ছে না। তখনো ভাত ছোঁয়নি অঞ্জন—ডান হাতের তর্জ্জনী-মধ্যমা-অনামিকা সাহায্যে কোমল একটি মুদ্রা তৈরী করে কাজলের চিবুক স্পর্শ করে বললো,—হোল কি রে তোর—কাজল ?

—হবে কি আবাব ! কেনো ?—কাজল অতিরিক্ত মাত্রায় ঘি ঢেলে দিল পাতে—অতটা অঞ্জন খায় না। গভীর স্নেহে ওর ঠোঁটদু'টি আবাব স্পর্শ করে অঞ্জন বললো—মনের কথা চেপে যাস্‌নে কাজ্‌লু। সত্য গোপন করাও পাপ !

উত্তর দিল না কাজল। বাটিটা একধারে সরিয়ে রেখে লেবু কয়টা দিল পাতে ; তারপর ঝোল-তরকারী আনতে রান্নাঘবে গেল। অঞ্জন খেতে আরম্ভ করেও কেমন যেন মুষ্‌ড়ে পড়ছে। কোথায় কি ঘটেছে যে কাজলের এমন মুখভার ? কাজের জন্যে দেবী—সেতো অঞ্জনের জীবনে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। কাজল তাব জন্যে মুখ ভার করবে—, অসম্ভব। ঘটেছে অন্য কিছু—কিন্তু, কি সেটা !

কাজল এদিকে রান্নাঘবে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে—সত্য গোপন করাও নাকি পাপ—কি সে গোপন করলো ? কৈ, কিছু তো গোপন কবেছে বলে মনে পড়ছে না—কেন উনি বললেন এ কথা ! কাজলকে আর বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ! কাজল বুঝি আজকাল ওঁকে সব কথাই গোপন করছে ! চোখদুটো ছল ছল কবে এলো কাজলের—তৎক্ষণাৎ সাম্‌লে নিল। আঁচল দিয়ে মুখখানা মুছে বাটিদুটো নিয়ে আবার আসছে। দেরী দেখে অঞ্জন ডাক দিচ্ছে ওদিকে—আয় কাজল ! আয়, আমার কাছে বোস্‌। নইলে খেতে পারবো না—বলে রাখছি।

কাজলের মিষ্টি মুখখানা স্বামীর খিদে যোগাবে। কাজল জানে,—অনুভব করে—গৌরবে বুক ভরে ওঠে ওর, কিন্তু আধ ঘন্টে ঝোল,—[illegible] [illegible] খাওয়ার কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না—যেমন [illegible]

খাবে। খায়ই তো কম—তার আবার কম কি খাবে! বাটি দুটো হাতে করে কাজল এগিয়ে এল। যে স্নেহের আহ্বান কাজলের বুকে অনাদিকালের তরঙ্গ তোলে—আজ যেন সেই আহ্বান ব্যর্থ হচ্ছে—যেন মনে হচ্ছে—এ অতি পুরাতন জীর্ণ-মলিন আহ্বান! এ যেন প্রাপ্যের অতিরিক্ত পাওনা হয়ে গেছে,—প্রয়োজনেব অধিক, যার আর দরকার নেই। কিংবা এ পাওয়ার উপর লোভ নেই আর, অথবা এ পাওয়া যেন তার পাওনা—যে দিচ্ছে তাকে দিতেই হবে—না দিযে সে পারে না—গ্রহিতার কাছে এর সম্মান নিতান্তই নগন্য!

বাটি দুটো নামিয়ে কাজল বসলো অন্য দিনের মতই। পা দুটি ভাঁজ করে গুটিয়ে ও বসলো বাঁ দিকে মাটিব উপব—হাতে একটা পাখা। অঞ্জন খেতে খেতে বললো—মণ্টুব জন্যে মন খারাপ করছে রে—কাজল?

কাজল ভাবলো হবেও বা। মণ্টু, তার আদরের ভাই—বাবা মণ্টু—তার জন্যে মন খারাপ করা বিচিত্র নয়—হয়তো তাই একলা-ঘরে কাজলের মন ভালো নেই; তাই বললো—হুঁ—মন খারাপ করছে বইকি। মণ্টু নাই—দাদু নাই—আর তুমি করবে দেরী—কি নিয়ে থাকি আমি!

—কেন? তোর কাটিম?—অঞ্জন হেসে উঠলো।

—কাটিম! যা ঘুমের কুম্ভকর্ণ হয়েছে একটা দেখো না—সবসময় ঘুম আব ঘুম আর ঘুম!

—জেগে থাকলে কিন্তু বলিস, কী দস্যি ছেলেরে বাবা?

—হুঁ, বলি তাই! কবে বললাম! দস্যিপনা খুব ভালো—কাজল সরে এল স্বামীর আরো কাছে। অঞ্জন ওর পিঠে বাঁ হাতটা রেখে বললো—তাতেই এত মন খারাপ—ওঃ!

কাজল কিছু বললো না—পাখাটা তুলে নিয়ে হাওয়া করতে লাগল। কাটিম দোলায় ঘুমুচ্ছে। ঘুমুচ্ছে অসাড় হয়ে। বড্ড ঘুমোয় ছেলেটা। সারাদিন—ঘুমানো ভালো কি? কাজল বড্ড একলা থাকে। ছেলে

ঘুমুলে ওর আর কোনো কাজ নেই; অঞ্জন একটুখানি থেমে বললো,—ক'দিন যে পড়তে আরম্ভ করেছিলে! কি হোল?

—কার কাছে পড়বো? নিজে তো থাকবেন সারাদিন বাইরে, মণ্টু গেল বাড়ী—পড়ি কার কাছে?

—মাষ্টার রেখে দেব?

—থাক! বুড়ো বয়েসে মাষ্টারের কাছে পড়তে পারবো না আমি।

—বুড়ো বয়সে! ও হঁ্যা! কত হোল—চল্লিশ পার হয়ে গেছে তো? হাসলো অঞ্জন!

—তা নাই হোল! তা বলে···কেনো, তুমিই তো পার পড়াতে?

—আচ্ছা! আমিই পড়াবো—কিন্তু একটি সর্ত্তে!

—কি?—কাজল সাগ্রহে তাকালো স্বামীর পানে। অঞ্জন মৃদু হেসে বললো,—রোজ পা টিপে দিতে হবে—হেসে উঠলো অঞ্জন।

—কেনো, আমি চাকর নাকি যে রোজ ওঁর পা টিপতে হবে—না. পড়াবার দরকার নেই।

যে কথায় কাজল অত্যন্ত খুশী হবে, ভেবেছিল অঞ্জন, সেই কথায় কাজল রেগে উঠলো—নাঃ, রাগ নয়—রাগের ভাণ! অঞ্জন জানে, স্বামীর পায়ে হাত বুলুতে কাজল কতখানি ভালোবাসে, আর সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'লে কেমন চটে যায়। ক্লান্ত স্বামীর পা টিপে দেওয়া ওর স্বামীসেবার প্রধান অঙ্গ একটা। কাজেই ওর এটা রাগ নয়—অনুরাগেরই ছদ্মবেশ। অঞ্জন হেসে বললো—তুমি শিষ্যা কিনা—ঝি-চাকরকে পা টিপতে দিই না আমি—জান তো!

—জানি—নাও—এই ভাতক'টি খেয়ে নাও—কাজল নির্দ্দেশ দিল!

—থাক আর; ও ক'টি গুরুদেবের প্রসাদ রইলো—বলে অঞ্জন সত্যি উঠে গেল। কাজল দেখলো—স্বামীর কাছে বসে থাকা সত্ত্বেও অঞ্জন আজ খুব কম খেয়েছে। এত কম যে কাজলের দুঃখু হ'তে লাগল! কেন

উনি আজ খেতে পারলেন না? রান্নাটা খারাপ হয়েছে নাকি? না অন্ত কিছু উনি ভাবছিলেন, কাজলের এমন করে ওর খাবার সময় মান-অভিমান করা ঠিক হয় নি? নিজের উপর রাগ হতে লাগল কাজলের। ওর-পরম স্নেহশীল স্বামী—যে স্বামীর সারা মনপ্রাণ জুড়ে বাস করছে কাজলই একা—না—কাজল আজ আর একা নয় সেখানে—সেখানে আছে ঐ মাধবীলতা—ঐ চন্দ্রলেখা—আরো কে আছে, কে জানে? ওরা এই পৃথিবীতে নেই—নেই আর কোথাও—আছে শুধু কাজলের স্বামীর অন্তরে বেঁচে, কেন যে ওরা তার স্বামীর অন্তর থেকে মুছে যায় না—মরে যায় না!

কাজল অসুস্থ বোধ করতে লাগল যেন! হাত ধুয়ে অঞ্জন মুখে মশলা ফেলে অফিস ঘরে বসলো গিয়ে। কাজল স্বামীর পাতে ভাত নিয়ে খেতে বসলো। কাটিম এখনো ঘুমুচ্ছে। কতক্ষণ ঘুমুবে ও! জেগে একটুখানি দুষ্টুমি করলে বাঁচে যেন কাজল। ঘুম—ঘুম—ঘুম! নিজের ছেলে পর হয়ে যাচ্ছে যেন। একটু চ্যাঁ-ভ্যাঁ নেই। উঠুক ও, উঠুক এবার। কাজল ওকে দোলা থেকে টান দিয়ে তুলে বুকের উপর নিল অকস্মাৎ। কেঁদে ওঠে না কাটিম—ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো মা'র দিকে। কাজল ওর পাছায় ছোট্ট একটা থাপ্পড় দিয়ে বললো—কাঁদ্—কাঁদ্ দেখি একটুখানি। ওঘর থেকে অঞ্জন কাজলের কথাগুলো শুনছে—জানালাপথে দেখলো তাকিয়ে। কী হোল তার কাজলের? কেন যে ওর এতখানি অস্থিরতা—অঞ্জন কিছুতে ঠিক করতে পাবছে না—অথচ কিছু যে একটা হয়েছে ওর মধ্যে, এটা বোঝা কঠিন নয়। অঞ্জনের পত্নিপ্রেম বিখ্যাত—আর কাজলের স্বামীপ্রেম সৃষ্টিছাড়া। বিশ্বের কোনো কিছুই তার স্বামীর কাছে দাঁড়াতে পারে না। ঈশ্বরের সঙ্গে সমান পর্য্যায়ে বসিয়ে স্বামীকে ও পুজো করে। অঞ্জন চিন্তিত হয়ে উঠছে।

দিনের বেলা ঘুমানো অঞ্জনের অভ্যাস নয়—বরং কাজল মাঝে মাঝে কাটিমকে ঘুম-পাড়াতে গিয়ে নিজেই ঘুমিয়ে যায়—কাগজ কলম রেখে

অঞ্জন উঠে এল এবরে—কাজল মাথার কাপড়টা তুলে দিয়ে ভাতের থালা থেকে হাত গুটালো। অঞ্জন বললো—ছেলেটাকে কাঁদাতে পারলে না?

—ন্না—কাঁদ্ শয়তান; কাঁদ্ না একবার!

কাটিম ওর মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছে। পারতপক্ষে ও কাঁদে না। কাঁদবার মত কোনো কাবণ ঘটেও না ওর ক্ষুদ্র জীবনে। একমাত্র ওর কাকা মণ্টুকে অনেকক্ষণ না পেলে কাটিম একটুখানি অধৈর্য্য হয়—কিন্তু কাকা মণ্টু যে আজ চলে গেছে—এ খবর কাটিমের এখনো জানা হয় নি। মণ্টু যখন ভোরে যায় তখন ও ঘুমিয়েছিল। বিকালেই বেশির ভাগ সময় ও কাকার সঙ্গে বেড়ায়—সে সময় এখনো হয় নি আজ। কাটিমের কাঁদবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না—বরং মা'র কোল থেকে লাফিয়ে উঠে ও গিয়ে বাবাব হাঁটু দুটো ধরলো। অঞ্জন ওকে তুলে নিয়ে আদর করে বললো—কাঁদবি না?

কাটিমের কথা বোঝা গেল না। অঞ্জন আবার শুধোলো—বল্ না রে?

—উঁ—কাটিম ধরলো তার বাবার গলা জড়িয়ে। কাজল রেগে বললো—যাও, নিয়ে যাও এখান থেকে। এখনো জানিস্ না যে কাকা দেশে চলে গেছে।

শেষের বাক্যটি কাটিমকে লক্ষ্য করে। অঞ্জন নিশ্চিন্ত হোল যে মণ্টু আর নাজিরের জন্যই কাজলের মন খারাপ হয়ে আছে। অন্য আর কোনো কারণ নেই। কীই বা কারণ আর থাকতে পারে! নিশ্চিন্ত হয়ে ও কাটিমকে নামিয়ে দিয়ে বললো—আমি থাকলে তো খাবে না—চল্লুম!

চলে গেল অঞ্জন। স্বামীর সুমুখে ভাতের গ্রাস কাজলের মুখে ওঠে না। কাজেই অঞ্জনের চলে যাওয়া একান্ত দরকার এখন। কাজল ছেড়ে দিল কাটিমকে। হামা দিয়ে সে ঘরের এটা-সেটা নিয়ে আরম্ভ করেছে। কাজল আবার খেতে আরম্ভ করলো। কিছুদিন পূর্ব্বের ঘটনা [illegible] [illegible] খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে সুজাতাদি হেসেছিল—সেই

চন্দ্রলেখার বৌদি সুজাতা—বাপ্ রে! স্বামীর আগে খেয়ে বসে রইল। বিকেলে এক টেবিলে বসে খেল যেন গোগ্রাসে। কী করে যে ব্যাটা-ছেলের সুমুখে বসে খায় ওরা! না, কাজলের দ্বারা ও সব হবে-টবে না। কাজল কোনোদিন সুজাতা হবে না। ও কি রকম মেয়ে! হাম্ হাম্ করে শুধু খায়। খায় অবশ্যি সবাই, তা বলে গুরুজনকেও তো মান্তে হবে।

কাজলের হাত আস্তে উঠছে মুখে—অতি ধীরে ধীরে খায় ও। হিরণ কতবার ঠাট্টা করেছে—বৌদি খেতে বসলে রাত দুপুর। কিন্তু শাশুড়ী প্রশংসাই করেন। কাজলের মনে হোল—চন্দ্রলেখাও এমনি পুরুষদের সঙ্গে খেত বোধ হয়। বোধ হয় কেন, নিশ্চয়। গাড়ীতে তো তাকে দেখেই ছিল কাজল। নাঃ, ও রকম মেয়ে কাজল হতে পারে না। অতখানি—সেই যাকে বলে 'মডার্ণ' না কি 'আলট্রামডার্ণ'—কথাটা ঠিক মনে পড়ছে না কাজলের—না, কাজল হতে পারবে না তা। এখানেই তফাৎ কাজলের সঙ্গে; এইখানেই ওদের তফাৎ। কাজল সুন্দর হোলে কি হবে, ওর সব সুষমাটুকুই প্রকৃতির উপর নির্ভর করে—আর ওরা, ঐ মডার্ণ তরুণীরা? বাপ্ স্! কি সাজগোজের বহর; কত রকমের আসবাব্। কত নাম-না-জানা জিনিষের ব্যবহারই না করে ওরা! সুজাতার ব্যাগে কাজল একটা অদ্ভুত জিনিষ দেখে জিজ্ঞেস করেছিল—এটা কি দিদি? হেসে উঠেছিল সুজাতা—তারপর ঐ জিনিষটার নাম আর ব্যবহার-বিধি বুঝিয়ে দিয়েছিল। সেই জিনিষ একসেট্ উপহার দিয়েও গেছে, রয়েছে তোলা ঐ আলমারীতে। ছেলেপিলে না হলে রূপ নাকি অনেকদিন ঝলমলে থাকে—যৌবনকে নাকি ধরে রাখা যায়—অবাক কাণ্ড! ছেলেমেয়ে না হবে তো বিয়ে করা কেনো বাপু? আবার সুজাতাদি বলে কি—কাটিমকে আর মাই দুধ দিও না—তোমার চেহারা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—! লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো কাজল কথাটা ভাবতে ভাবতে!

এক ঢোক জল খেল কাজল। এখনো ওর খাওয়া শেষ হয়নি—কাটিম ভেঙে ফেললো একখানা চায়ের পিরিচ।—যাঃ, হোল? ভাঙলিরে শয়তান। ভাঙা পিরিচের একটা টুকরো মা'র দিকে ছুঁড়ে দিয়ে কাটিম বললে,—হুঃষ্!

—ফের, মার খাবি!

কাটিম হামা দিয়ে মা'র কোলের মধ্যে এসে উঠলো ভাঙা পিরিচেরই আর একটা টুকরো হাতে নিয়ে। তারপর মা'র বুকের জামাটা কচি আঙুল দিয়ে সরিয়ে মাইদুধ খেতে আরম্ভ করলো। বাঁ হাত দিয়ে ওর পিঠে একটা আদুরে চাপড় মেরে কাজল বললো—বাপ্‌কা ব্যাটা হয়েছো!

ঘরে কেউ ছিল না ওর কথাটা শোনবার জন্য, কিন্তু কাজলের মনে হোল, বাপ্ ওর কিছু তো দুষ্টুমি করে না—বরং অতিমাত্রায় নিরীহ ওর বাপ্। দুষ্টুমি একটু-আধটু করলে মন্দ হোত না। মন্দ হোত না যদি অঞ্জন মাঝে মাঝে কাজলকে বকাবকি করতো। এতটা শান্তি—এতখানি স্তব্ধতা যেন মাঝে মাঝে অসহ্য বোধ হয়। কেমন যেন পান্‌সে হয়ে যাচ্ছে সংসারটা। নাঃ, আজ ও অঞ্জনের সঙ্গে মান-অভিমান করে খুব খারাপ কিছু করে নি। কিসের জন্য মান-অভিমান—ভুলে গেছে কাজল—কিন্তু মনে রয়েছে অঞ্জনের সেই কথাটা—"সত্য গোপন করাও পাপ"—হ্যাঁ সত্য গোপন করেছে সে। অঞ্জনের মনে অন্য কোনো নারী জাগ্রত থাকবে—এটা যেন ওর ভালো লাগে না। অথচ ঐ একদিন বলেছিল গর্ব্ব করে—'মাধবী তার স্বামীকে ভালোবাসতো বলে মাধবীকে কাজল বেশি ভালবাসতো, কিন্তু সে তো আলাদা কথা! যে-কেউ তার স্বামীকে ভালোবাসুক না, কাজলের কিছু ক্ষতি নাই; তার স্বামী অন্য কাউকে না ভালোবাসলেই হোল! মাধবী, চন্দ্রলেখা বা আরো যার খুশী অঞ্জনকে ভালোবাসুক—অঞ্জন যেন শুধু কাজলের থাকে—কাজলকেই ভালবাসে।

স্বামীর সংবেদনশীল অন্তরের পরিচয় জানে কাজল। মাধবী বা লেখার দিকে ওর যে মনের টান সেটা শুধু সহানুভূতি, সমবেদনা—ঐ দুটি মেয়ের গভীর দুঃখের জন্য স্বামী তার যেন নিজেকে খানিকটা দায়ী মনে করে—এর বেশি ওতে কিছু নেই। তাছাড়া—ওরা দু'জনেই আজ পৃথিবীর ওপারে—হ্যাঁ, লেখাও সম্ভবতঃ বেঁচে নেই, যদিও তার সঠিক খবর কারো জানা নেই। ওদের নিয়ে আর মাথা ঘামাবার দরকার কি? তার চেয়ে কাজল একটু পড়াশুনো করে খানিকটা মডার্ণ হয়ে নিক—যেন ওরা, ঐ সব আধুনিকারা, তার সঙ্গে টেক্কা দিতে না পারে। রূপ তার যথেষ্ট আছে—সে খবর জানা হয়ে গেছে অনেক দিন। সংসার চালাবার সদ্‌গুণেরও অভাব নেই তার।

কাজল অকস্মাৎ স্তন্যপান-রত কাটিমকে টেনে তুলে দিল—ছাড় দুষ্টু! বুড়ো হরিণ! আর কতকাল দুধ খাবি!

কাটিম ওসব গ্রাহ্য করে না। সবল সুস্থ ক্রীড়াপরায়ণ ছেলে সে; টুপ্ করে কোল থেকে নেমে হামাগুড়ি দিয়ে উঠোনে নামলো গিয়ে। তুলসীতলা—পাশে সেই ছাগলে-খাওয়া মাধবীলতার গাছটা কাটিম হাতের ভাঙা কাচের টুকরো দিয়ে ওর তলার মাটি কোপাতে লাগল। দেখছে কাজল, গাছটাকে হয়তো তুলেই ফেলবে। তুলুক—দিক ছিঁড়ে। কী দরকার একটা মাধবীলতার গাছ বাড়ীর উঠোনে! যাক গে! মাধবীর স্মৃতিচিহ্ন গাছটা যাকগে। কাজল খেতে লাগল।

ভাত কয়গ্রাস শেষ করে বাসন গুটিয়ে রেখে হাত ধুলো—পান খেল, খাটের উপর আড় হয়ে শুলো। কাটিম উঠোনে গাছটাকে প্রায় বিপর্য্যস্ত করে তুলেছে। অঞ্জন অফিস ঘরে কাজে মগ্ন—কেউ এখন বাধা দেবার নেই কাটিমকে—কিন্তু রোদ লাগছে গায়ে—সোনার মত রঙ ওর লালচে হয়ে উঠেছে ভাজা চিংড়ির মত।

ঘুমুচ্ছে নাকি কাজল। না—ও চেয়ে আছে। চেয়ে আছে শোবার

খাটের পাশের দেওয়ালে টাঙানো একখানা ফটোর দিকে। শীর্ণ মরণোন্মুখ একটা মেয়ের ছবি—মাধবীর ছবি। কোটরগত তার চোখ দুটো শুধু জল-জল করছে। আর কোথাও কিছু দেখবার নাই—কাজলের দিকেই যেন চেয়ে আছে; যেন বলছে, এই ঘর সংসার, ঐ দেবতার মতন স্বামী, ঐ দেব-শিশুর মত কাটিম, এ সবই তোমার কাজল-বৌ, কিন্তু আমিও ছিলাম—আমিও আছি এখনো—এখনো রয়েছি আমি তোমার স্বামীর অন্তরে আজও—এই মুহূর্তেও—।

খাটের উপর দাঁড়িয়ে উঠে কাজল ফটোখানা উল্টে দিল—এক মিনিট পরে পেরেক থেকে ওটাকে খুলে ছুঁড়ে দিল ওদিকে আলমারীর মাথায়। তারপর শুলো আবার। কি ভেবে আবার উঠে আলমারীর মাথা থেকে ফটোখানা নামিয়ে অঞ্জনের অফিস ঘরের দিকে চলতে লাগলো। উনোনে কাটিম রোদে পুড়ছে—কাজল দেখেও দেখলো না। অঞ্জন লেখাপড়ায় মগ্ন। কাজল এসে একটা পেরেকে টাঙিয়ে দিলে সেই ফটোখানা। চুড়ির মৃদু শব্দে তাকিয়ে বললো—কী হোল?

—কিছু না। শোবার ঘরটা ঝাড়পোঁছ করবো। অঞ্জন আর কিছু না বলে তার কাগজের উপর কলম চালাতে লাগল! ফটোখানা টাঙিয়ে কাজল এসে দাঁড়াল স্বামীর টেবিলের ধারে। অঞ্জন লিখছে—ইংরাজি ভাষা—কাজল পড়তে পারবে না। কে জানে কি লিখছে, কাকে লিখছে! ঝুঁকি হয়ে এক-আধটা অক্ষর পড়বার চেষ্টা করতে লাগল। অঞ্জন কোনোরকমেই ওর উপর বিরক্ত হয় না। এই দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে অঞ্জন কোনদিন কাজলকে মৃদু ধমকও দেয়নি। কাজলও এমনভাবে দাঁড়ালো যাতে অঞ্জনের লেখার অসুবিধা হয়—হচ্ছেও অসুবিধা।

—আদর খাবি না কি রে—কাজলু!—এই ওর স্বামীর বকুনি। এর বেশি কোনকালে নয়।

পিঠের উপর সস্নেহ হাত রেখে অঞ্জন ওকে আরো কাছে টেনে

এনে বললো—লিখতে দিতে চাস নে ?

—না ! কি লিখছো ? কাকে লিখছো এত বড়

—লাট সাহেবকে। শুনবি, কি লিখছি ?

—থাক্ ! চলো ; খাটখানা ওপাশে সরাবো—দক্ষিণ দিকে, আর আলমারীটা এদিকে—চলো—একটু ধরে দেবে !

—চাকরটাকে ডেকে নে কাজল—আমি একটু ব্যস্ত।

—ও আচ্ছা, থাক্ !—কাজল সরে চলে যাচ্ছে। অঞ্জন কলম ফেলে তৎক্ষণাৎ উঠলো —বললে।—চল্—যাচ্ছি চল্—এতো অভিমানী কেন তুই হয়ে উঠলি কাজল !

—খুসি আমার !

—আচ্ছা, তোর খুসিই বহাল থাক—আয়। অঞ্জন উঠোনের দিকে তাকিয়েই দেখলো কাটিমকে। রোদে সিঁদুর হয়ে উঠেছে তার গা—মাধবীলতাটা নিয়ে টানাটানি করছে—উপড়ে ফেলতে পারছে না। অঞ্জন কাজলকে ছেড়ে ওকে টেনে তুলে বললো—কি করছে, দেখেছো ?

—দেখে কি করবো ! যাদের ছেলে, তারা দেখুক।

কাজল ঘরে ঢুকে খাট নিয়ে টানাটানি স্রুরু করলো। কাটিমকে ঘরের মেঝেতে এনে ছেড়ে দিয়ে অঞ্জন সাহায্য করছে কাজলের কাজে। কাজল শাড়ীর আঁচলটা কোমরে শক্ত করে জড়িয়ে আলমারীর একদিক ধরলো, অঞ্জন অন্য দিক—কাটিম তাড়াতাড়ি এসে ধরলো মাঝখানটায়, আলমারী সরাতে গেলে কাটিমের গায়ে লাগতে পারে—কাজল ধমক দিল ছেলেকে—সর্—সরে যা। বুঝতে না পেরে কাটিম আরো ভালো করে ধরলো, আলমারীর নীচেটা, অঞ্জন হেসে উঠলো—সঙ্গে সঙ্গে কাজলও আলমারী ছেড়ে কাটিমকে তুলে খাটে বসিয়ে দিতে দিতে বললো,

—বজ্জাৎ ছেলে ! তোমার জন্তে কিচ্ছু করবার যো নেই ! কাটিম গ্রাহ্য না করে মাইদুধ খাবার উদ্যোগ করছে। অঞ্জন বুঝলো এখন

আর আলমারী সরাবার সময় হবে না কাজলের। যেমন আছে থাক কাজল—বেশ আছে—বলে সে চলে গেল অফিস ঘরে।

সত্যি ওর কাজ আছে তাহলে—। যাক্, খাট সরাবার তো কিছু দরকার নাই—ফটোটা সরানোর কৈফিয়ৎ দেবার জন্যেই কাজল ঘর-সাজানোর কথা বলেছিল। দেওয়ালের দিকে তাকালো কাজল—যায়গাটা ফাঁকা লাগছে—ওখানে আর একটা কিছু টাঙিয়ে দিতে হবে—কাটিমের ফটো, হ্যাঁ, সেই যে ফটোটা শিলাজিত তুলেছিল—সেই শিলাজিত। শিলাজিতের সর্ব্বাঙ্গ মনে পড়ে গেল কাজলের। সেই লম্বা বলিষ্ঠ গঠন—সেই দু' চোখের মদির দৃষ্টি, সেই কথা বলার রহস্যঘন ইঙ্গিত। কাজলেরও ছবি তুলে দিয়েছে শিলাজিত —আছে ঐ আলমারিতে, টাঙিয়ে দেবে।

৩

"চন্দ্রলেখা কলা কেন্দ্রের" উদ্বোধন আজ। ষ্টেশন থেকে রাজবাড়ী, আর রাজবাড়ী থেকে ঐ নতুন বাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তাটা সুন্দররূপে সাজানো হয়েছে। সাতটা তোরণ করা হয়েছে, পথের লাল ধুলোতে জল দিয়ে ফুল ছড়িয়ে একটা রাজসিক ব্যবস্থার চরম উৎকর্ষ দেখানো হয়েছে। কোথাও কোনো ত্রুটি নাই। উদ্বোধন করবেন বর্ত্তমান ভারতের শিল্পগুরু ডাঃ ঠাকুর। তাঁকে আনবার ভার গ্রহণ করেছে লেখার দাদা পলাশ স্বয়ং। সাড়ে চারটার ট্রেণে তিনি আসবেন—আবার সাড়ে ছ'টার ট্রেণেই ফিরে যাবেন। ভারতের এই বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শিল্পীকে দেখবার জন্য দূর-দূর গ্রাম থেকে লোকজন আসতে আরম্ভ করেছে। যারা শিল্পের কিছু বোঝে, তারা তো আসছেই—যারা কিছুই বোঝে না, তারাও আসছে। মেলা জমে উঠেছে ঐ নতুন বাড়ীর কাছে ফাঁকা মাঠটায়।

যথাসময়ে সাড়ে চারটার ট্রেণ এল—লেখার ছোট ভাই কিংশুক

নামল প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে ; সঙ্গে তিনি। কেয়া তার ঠাকুরদাকে নিয়ে নিজে গেছে ষ্টেশনে—তাঁকে আনতে। কিংশুককে ও চেনে না, কিন্তু ছবি দেখা আছে—তাই চিন্‌তে দেরী হোল না। কেয়ার ঠাকুরদা এগিয়ে এসে যথাযোগ্য সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন। আয়োজনের কোথাও কোনো ত্রুটি নাই—সার দিয়ে ছোট ছোট মেয়েরা নৃত্য-ভঙ্গিতে ওঁকে অভিবাদন করলো—মাল্যদান করলো—গ্রাম্য ছড়া- যা উনি অত্যন্ত ভালোবাসেন, তাই গেয়ে ওর বন্দনা করলো। আলপনা-আঁকা পথে-পথে ওকে এগিয়ে এনে আট ঘোড়ার গাড়ীতে তুলে গ্রামের দিকে আসতে লাগলো। সুন্দর—সবই সুন্দর। অতিথি পরম প্রীত হয়ে সস্নেহ হাস্যে বললেন—হ্যাঁ—এই বাংলার পল্লী—এই নৃত্য-গানে-গল্পে ভরা আমার জন্মভূমি—। কেয়ার মুখটি আঙুল দিয়ে তুলে ধরে বললেন, —তোমরাই এই বাংলাকে বাঁচিয়ে রাখো—জাগিয়ে রাখো মা।

শোভাযাত্রা চলে গেল ওঁকে নিয়ে। ঐ ট্রেণ থেকেই নেমেছে একটি লোক—দাড়ি গোফে মুখখানা আচ্ছন্ন—পরণে গেরুয়া কাপড় ; গলায় রুদ্রাক্ষমালা। পায়ে অবশ্য চামড়ারই জুতো—কিন্তু হরিণের চামড়ার। কাঁধে একটা ঝোলা, হাতে লাঠি আর তানপূরা। সবাই যখন চলে গেল, তখন সে সেই পথ ধরে ধীরে ধীরে চলতে লাগলো। কোনো পরিব্রাজক হয়তো—হয়তো এই বিরাট সমারোহটি দেখবার জন্য ওর কৌতূহল জেগেছে, কিম্বা হয়তো উনি সন্ন্যাসী—দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোই ওর কাজ—কাজেই কেউ বিশেষ লক্ষ্য করলো না। কিন্তু গ্রামে কাছাকাছি যেতে একজন প্রবীণ ব্যক্তি প্রশ্ন করলো—বাবাজির আখড়া কোথায়?

—দেবগ্রাম—উত্তর দিল বাবাজি। দেবগ্রাম কোন্‌দেশে, কেউ আর শুধুলো না। অন্য একজন বললো—সাধু বাবা কি উৎসব দেখতেই আসছেন?

—না—পথে পড়ল—দেখে যাই। যাব পশ্চিম—কাশ্মীর পর্য্যন্ত।

সাধু চলতে লাগল। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে যায়গাটা। সাধু-বাবা যখন পৌছালো, তখন সভার কাজ আরম্ভ হয় নি—"বন্দে মাতরম্" গান চল্‌ছে। গাইছে কেয়া—বাজাচ্ছেন কেয়ার বাবা—সমবেত জনতা দাঁড়িয়ে ঋষি বঙ্কিমের অপূর্ব্ব উদাত্ত রচনার সুর-মাধুর্য্য আকাশ স্পর্শ করেছে—

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্—বন্দে···

সুরটা কেয়ার নিজের দেওয়া। চমৎকার গলা ওর। শিল্পাচার্য্য মুগ্ধ হয়ে শুনছেন। সাধু-বাবা একধারে এসে দাঁড়িয়ে গেল—শুনতে লাগলো তফাৎ থেকে। গান শেষ হলো। সবাই বসলেন। এক একজন করে নানা ব্যক্তি শিল্প সম্বন্ধে এবং এই রকম বলা কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করলেন—শেষে সভাপতি, স্বয়ং শিল্পাচার্য্য তাঁর আশীর্ব্বাণী দান করলেন। প্রায় ছ'টা বাজে—সভা এবার ভঙ্গ হবে—হঠাৎ সেই সাধুবাবা তার তানপুরায় টঙ্কার টান্‌লো—ঝণ্ ঝণ্ ঝণ গান ধরলো—

"—তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল কর মলিন মর্ম্ম মুছায়ে,
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর মোহ আঁধার ঘুচায়ে।
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া—বসে আঁধারে মরিনু কাঁদিয়া
আমি দেখি নাহ কিছু বুঝি নাই কিছু—
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।"

ঝর ঝর করে জল পড়ছে সাধুর চোখ দিয়ে। অবাক হয়ে চাইল সবাই ওর মুখের পানে। সুউচ্চ গ্রামে বাঁধা ওর গলা—কণ্ঠস্বরের মিষ্টতার চাইতে প্রাণের আবেগে আরো মধুর হয়ে উঠেছে। ও যেন অন্তর নিংড়ে গাইছে—

"আছ অনলে অনিলে চির নভোনীলে ভূধর সলিলে গহনে,
আছ বিটপী-লতায়, জলদের গায়, শশী তারকায়, তপনে

আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া—
বসে আঁধারে মরিনু কাঁদিয়া ....”

গানের প্রত্যেকটি শব্দ যেন রূপ পরিগ্রহ করছে ওর কণ্ঠে। নিস্তব্ধ জনতা নীরবে শুনতে লাগলো—। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাইছে সাধু—চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে ওর কাঁচা-পাকা দাড়ী—হঠাৎ ও নিজেকে সামলে নিল—গানটাকে শমে মিলিয়ে দিয়ে উচ্চস্বরে বললো—“জয় হোক—মাতা ভারতের জয় হোক—” তানপুরা বগলে নিয়ে চলে যাচ্ছে সন্ন্যাসী। কেয়া একজনকে ইসারা করলো ওকে ডেকে নিয়ে আসতে, কিন্তু ডাকবে কাকে? ও তখন সেই ‘কনে ডোবার ঘাটে’র দিকে পথ ধরেছে।

—চল ঠাকুর ফিরে চল—রাজকুমারী ডাকছেন তোমায়।

উত্তর না দিয়ে চল্‌তে লাগল সন্ন্যাসী। ফেরো সাধু-বাবা—ও সাধুজি।—না—লোকটা নীরবে চলে গেল আমবাগানের আড়ালে, বড় বট গাছের পাশ দিয়ে—ধান ক্ষেতের সরু আল ভেঙে, নিশিন্দাফুলের জঙ্গলের অভ্যন্তরে।

ও কে? কোত্থেকে এলো—তাই নিয়ে হয়তো জটলা চলতো বেশ কিছুক্ষণ—কিন্তু শিল্পাচার্য্য কলা কেন্দ্রের দ্বার উন্মোচন করে তাঁর নিজের হাতের উৎকৃষ্ট শিল্প একটি কলা-কেন্দ্রে দান করেছেন—সেইটি তুলে এক-জন দেখাতে লাগলো। অপূর্ব্ব সেই চিত্র—সমবেত জনতা সাধুর কথা ভুলে দেখতে লাগল। তারপর খাদ্য-পানীয় এবং বিদায় অভিবাদনের পালা। শিল্পাচার্য্য যথাসময়ে চলে গেলেন। তাঁকে ট্রেণে তুলে দিয়ে কেয়া ফিরছে, সঙ্গে কিংশুক। ও দু’একদিন থাকবে এবং এই কলা-কেন্দ্রের কার্য্যপন্থা,—কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি ইত্যাদি ঠিক করে দিয়ে যাবে। শিল্পাচার্য্যই সভাপতি হবার সম্মতি দান করে গেছেন। কিংশুক কেয়ার খুব পরিচিত নয়। কেয়া শুনেছে, সে পলাশের ছোট ভাই। চন্দ্রলেখার কথাটাই বার বার কেয়ার আজ মনে পড়ছিল—আর চোখে জল আসছিল।

কয়েকটা দিনেই কি গভীর ভালবাসা জন্মেছিল ওদের মধ্যে। কেয়ার মনে পড়ল—সেই সুদূর হিমালয়ের উপত্যকায় সাজানো হোটেলের একটা ঘরে লেখার সঙ্গে ও গিয়ে আলাপ করলো, তাকে নিয়ে এল নিজেদের বাসায়—তারপর তাকে কুমারী এবং বয়স্কা জেনে তার বিপত্নীক বিষয়-নিস্পৃহ বাবার সঙ্গে বিয়ে দেবার চেষ্টা করলো। কৌশল করে এখানে এনে যখন প্রস্তাব করা হোল লেখার কাছে—গায়ে হলুদের সব ঠিক পর্য্যন্ত করা হোল—তখন হঠাৎ অসুস্থ লেখা কোথায় যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল—কেউ তা জানে না।* লেখার বড়দাদা পলাশ পরদিনই এসে সবটা শুনে শুধু কেঁদেছিল—কোনো কথা বলে নি কিছুক্ষণ। তারপর লেখার অতীত জীবনের সব কথাই গোপন করে শুধু বলেছিল—যদি বেঁচে সে থাকে, তাহলে ফিরিয়ে আনবো। আর, যদি·· বলতে গিয়ে চোখের জলে ভেসে গিয়েছিল পলাশ। কিন্তু অঞ্জনের অনুরোধে লেখার বিবাহের বা বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা এখানে কাউকেই জানায় নি সে। কাজেই লেখা এখানে আজও "কুমারী চন্দ্রলেখা" নামেই পরিচিতা রয়েছে। কেয়া প্রস্তাব করেছিল—তার বাবার বাগদত্তা বধূর নামে সে একটা কিছু করবে, স্মৃতি-মন্দির বা ঐ রকম কিছু।—পলাশ তার উত্তরে বলেছিল—আমরা ওর সহোদর ভাই হলেও অঞ্জনই ওর সত্যিকার দাদা—তাকেই লিখুন—সে যা বলবে, তাই করা হবে। যে টাকা কটা ওর রয়েছে আমাদের কাছে, আপনাকেই দিয়ে যাচ্ছি।

পলাশ মোটা অঙ্কের একটা চেক রেখে দিয়ে গেছে। অঞ্জনই কেয়ার চিঠির উত্তরে এই "চন্দ্রলেখা কলাকেন্দ্র" প্রতিষ্ঠা করবার উপদেশ দেয়, তাই আজ কার্য্যে পরিণত করা হোল। অতীতের এই ইতিহাসটুকু না জানলে হয়তো সাধারণের অসুবিধা হইতে পারে, তাই একখণ্ড ... প্রান্তরে লেখার জীবনের যৎসামান্য লিখে এনেছে ওর ছোট দাদা।

* লেখক প্রণীত পথের ধূলো দ্রষ্টব্য।

কিংশুক, অবশ্য লেখাকে কুমারী চন্দ্রলেখা রূপেই দেখানো হয়েছে তাতেও।

প্রকাণ্ড ঘোড়ার গাড়ীতে ফিরে আসছে কেয়া আর কিংশুক। কিংশুক এতক্ষণে কেয়ার সঙ্গে কথা বললো—এর পূর্ব্বে শুধু অভিবাদনের আদান প্রদান হয়েছে ওদের মধ্যে। কেয়ার অতুলনীয় রূপ শুধু চোখভরে এতক্ষণ দেখছিল সে দূর থেকে। বোনের জন্যে শোকাশ্রু অবশ্য না যে ফেলেছে তা না নয়—বারম্বার সাদা সিল্কের রুমাল বের করে চোখমুখ মুছেছে সে। কেয়া কিন্তু সত্যি কেঁদেছে—অঝোর ধারায় কেঁদেছে ; এখনো ওর চোখ শুকনো নয়।

—খুবই ভালোবাসতেন আপনি লেখাকে ! কিংশুক বললো।

—না—ভালোবাসবার সময়ই পেলাম না—ফাঁকি দিয়ে চলে গেল।

টলটল জল মুক্তার মত গড়িয়ে পড়লো গাল বেয়ে। কিংশুক আধ মিনিট চুপ করে থেকে আবার বলল—কি আর করবার আছে ? আমাদের যথাসাধ্য করছি। আপনার ঐ কলাকেন্দ্রে ওর স্মৃতি জেগে থাকবে। মুখখানা ও যথাসাধ্য করুণ আর কাতর করবার চেষ্টা করলো—যেন বোনের আকস্মিক মৃত্যুতে ও যারপরনাই ব্যথিত—কিন্তু চেষ্টা করে যে কান্নার অভিনয়, তাতে বেদনার চেয়ে বিরক্তিই বেশি প্রকাশ পায়। আসলে কিংশুক বিরক্তিই হয়ে আছে লেখার উপর। বোনের বোকামীকে ও ক্ষমা করতে পারছে না। কেন সে এমন করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল ! কি ক্ষতি হোত [illegible] যদি সে এই বিশাল প্রাসাদের মালিক হোত ঐ কেয়ার বাবাকে বি[illegible]রে ! কেইবা তার অতীত জীবনের কথা বলতে আসতো এখানে ! এতো বড়ো সুযোগটা সে হেলায় হারিয়েছে। কিংশুক কল্পনা করতে পারে না—কোন মেয়ে ততখানি বোকা হতে পারে ! শিলাজিতের সঙ্গে বিচ্ছেদ তো বহুদিন পূর্ব্বেই ঘটে গিয়েছিল লেখার—তার কোন দাবীই নাই আর—লেখার

তো কুমারীই—হ্যা—কুমারী। কেন যে সে এই সুযোগটা গ্রহণ করে নি—তা যেন কিংশুকের কাছে একটা তুরধিগম্য রহস্য। তাই কান্নার অভিনয় করতে গিয়ে বিরক্তিই ফুটে উঠেছে ওর মুখে। কিন্তু কেয়া দেখলো না—ও নিজেই কাঁদছে।· লেখাকে ও কিছুতেই ভুলতে পারছে না—আজ আরো বেশি করে মনে পড়ছে।

—কেঁদে আর কি হবে, বলুন—ওর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা তো হোল ; এই আমাদের সান্ত্বনা।

—ভেবেছিলাম—ওকে জড়িয়ে আর একবার বাবার ঘর বেঁধে দেব—তা নয় নাই হোত- ও কেন চলে গেল ? কোথায় গেল ? সত্যি কি ও বেঁচে নেই ? আমার মন যেন বলছে—ও বেঁচে আছে ; লুকিয়ে আছে কোথাও !

—বেঁচে থাকে, ভালোই। কিন্তু যথেষ্ট তো খোঁজ করা হোল কাগজে এখনো বিজ্ঞাপন চলছে।

—না, কেয়া দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করলো—খোঁজ করা হয় নি ঠিকমত। আমি সারাজীবন ওর খোঁজ করবো—ওর একখানা বুকের পাঁজরাও যদি আমি খুঁজে পাই—আমি তাই এনে রাখবো এখানে।

—আপনি ওকে এতোটা ভালোবাসতেন কেয়া দেবী ?—কিংশুক বিস্মিত হোল।

—হ্যাঁ। ও যে আমার বাবাকে ভালোবেসেছিল। ও যে আমাকে মেয়ের চেয়েও · হু-হু করে কেঁদে ফেললো কেয়া। কিংশুক বিব্রত বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। মেয়েদের এই সব কান্নার বাড়াবাড়ি ও মোটে পছন্দ করে না। তার পর কোনো সুন্দরী মেয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদবে—এ ওর কাছে অসহ্য একেবারে। কাঁদতে হয়—চোখে রুমাল চেপে ভদ্রভাবে একটু কাঁদো না বাপু। এ আবার কি রকম অসভ্য

কান্না। কিন্তু কেয়ার উপর বিরক্তি প্রকাশ করবার মত যথেষ্ট সবল নয় ও। সুন্দরী কেয়া—অনবদ্যাঙ্গী কেয়া রাজকুমারী কেয়া দেবী। এই বিশাল গ্রাম-প্রান্তর-পথ—এই পরিদৃশ্যমান সবটুকু জমিই ওর এককোঁটা চোখের জলে গলে যায়—ও এখানকার অধিশ্বরী। ওর কান্নায় এখানে মুক্তা ঝরে, হাসিতে ঝরবে মাণিক। কিংশুক, কি বলা উচিত ভেবে না পেয়ে বললো—আপনার বাবাকে ভালোই যদি বাসলো তো চলে গেল কেন?

—চলে ও যায় নি—কেউ ওকে চুরি করে নিয়ে গেছে; গুম্ করে রেখেছে……।

—কি সব বলছেন? চুরি করবে কি জন্যে?

—তা আমি জানি না। আমার কিছুতে মনে হচ্ছে না, সে চলে গেছে বা মরে গেছে।

হেসে উঠলো কিংশুক ওর কথা শুনে। ছেলেমানুষের নির্ব্বুদ্ধিতা, আর কি। বিজ্ঞের মত বললো—বড্ড সিনিক ছিল ও। চিরকালই ও ছিল খেয়ালী আর বদ্ মেজাজী। কারো কথা কখনো শুনতো না—কারুকেই ও মান্‌তে চাইতো না—বাবা-মা মারা যাওয়ার পর থেকে ওকে সামলাতে যে কি বেগ পেতে হয়েছে আমাদের!

যার জন্যে কেয়া কেঁদে আকুল হচ্ছে, তারই সম্বন্ধে এই রকম বিরুদ্ধ সমালোচনা কেয়ার ভালো লাগবার কথা নয়। কিন্তু কিংশুক এই কথাগুলো বলে ফেললো প্রথমতঃ লেখার প্রতি বিরক্তি আর দ্বিতীয়তঃ কেয়াকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে চুপ করাবার জন্যে। কেয়ার সঙ্গে দু'চারটে ভালো প্রসঙ্গের আলোচনা ও করতে চায়—কেয়াকে সে জানাতে চায়—সে একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি—একজন ভবিষ্যৎ মহৎ মানুষ, একটি অসাধারণ প্রেমিক। কেয়ার সঙ্গে এমন করে একান্তে দেখা হওয়ার সুযোগ সে আর নাও পেতে পারে—কারণ কেয়া এখানকার কে—কতখানি

তার এদেশে মর্য্যাদা, তা জানা আছে কিংশুকের। অন্তঃপুরে ঢুকলে যে আবার এই অসূর্য্যম্পশ্যার সহজে সাক্ষাত মিলবে—এমন আশা ও করে না। কাজেই নাতিদীর্ঘ এই পথটুকুকে অবলম্বন করে ও তার কলকাতায়, তার সভ্য মনুষ্যত্ব আর তাব প্রেমিক হৃদয়বত্তাব কিছুটা জানিয়ে দিতে চায় কেয়াকে। কিন্তু কেয়া যেন আলাদা রকমের মেয়ে। কিংশুকের মত সুন্দর, মার্জ্জিত, শিক্ষিত যুবকেব কাছে বসে ও দুটো পলিটিক্স নিয়ে আলোচনা করবে—যুদ্ধেব খবব জানতে চাইবে—দুটো ভালো উপন্যাস বা সাহিত্য নিয়ে কথা বলবে—একটু বহস্য, একটু বসিকতা, অল্প একটুখানি ফাজলামী করবে—তা না—কেবল কান্না।—কাঁদবার বয়স তো তোমার পার হয়ে গেছে বাপু—কিংশুক মনে মনে আওড়ালো।

কেয়া ওর মুখের পানে জলভবা চোখে আধ মিনিট চেয়ে রইল—পরে বললো—ওকে দেখছি আপনাবা মোটে ভালোবাসতেন না। আপনি ওর দাদা, আপন দাদা—সোদর ভাই—ও! তাই জন্যেই চলে গেল। অভাগী,—হতভাগী—আমি তোকে রাজবাণী করে রাখতাম। কেয়া ফুঁপিয়ে উঠলো। মাথাটা হেলিয়ে দিল গাড়ীব কোণায়—। নির্ব্বোধ কিংশুক এতক্ষণে বুঝলো—এই মেয়েটিব কাছে লেখার সম্বন্ধে খারাপ কিছু কথা বলা চলবে না—কিন্তু যতটুকু বলা হয়েছে সেটুকু সামলানো যায় কি করে। কেয়া মুখখানা ফিরিয়ে রেখে কাঁদনভরা কণ্ঠেই বললো—বলেছিল—বলেছিল আমায়—ওর অঞ্জন-দাদার স্নেহের জন্যেই ও ফুটে আছে। ঝরে গেল।

নির্ব্বাক কিংশুক নীরবে বসে ভাবতে লাগল, কি উপায় এখন করা যেতে পারে ওকে তার দিকে এক নজর দেওয়ার জন্যে।

গাড়ীটা এসে রাজবাড়ীর মন্দিরের কছে থামলো।

* * *

ও ভেবেছিল, কেউ ওকে চিনতে পারবে না। চিনতে কেউ-ই

পারলো না···কিন্তু একজনের চোখকে ও ফাঁকি দিতে পারে নি। নাজির দাঁড়িয়েছিল জনতার একপ্রান্তে। অতীতের দস্যু নাজির—বর্ত্তমানের সাধু নাজির, তার সেই তেলমাখা ভারী লাঠিগাছটি হাতে দাঁড়িয়েছিল একদিকে।—ওর শ্যেন-দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হোল না। নাজির বার বার ভাবতে লাগল—ও যেন চেনা। ঐ অঙ্গ-ভঙ্গি—ঐ রকম বড় বড় চোখ আর ঘাড় উঁচু করে কথা বলা কোথায় যেন দেখেছে সে। মনের অন্ধ গলি অন্বেষণ করতেই মনে পড়ে গেল। লোকটা তানপুরা হাতে আর ঝোলা কাঁধে, গট্‌গট্‌ করে চলছে, নাজির ছায়ার মত ওর পিছু নিল। লঘুপায়ে চলেছে নাজির।

দূর—দূর হয়ে যাচ্ছে দু'জনের মধ্যকার ব্যবধান—নাজির গতিবেগ বাড়িয়ে দিল। পিছু সে ডাকলো না। সাধুজি ক্রমাগত হেঁটে প্রায় মাইল দুই পথ পার হয়ে নদীর কাছাকাছি এলো—যেখানে 'কনে ডোবার ঘাট'—আর সেই ঘাটের উপর একশ' আটহাতওয়ালা কালী মূর্ত্তির মন্দির। মন্দিরের উঁচু মাথাটা বহুদূর থেকে দেখা যায়। পূজারী-ঠাকুর হয়তো রাজবাড়ীর উৎসব দেখতেই গেছে, তাই এখনো সন্ধ্যারত্রির কোনো শব্দ পাওয়া গেল না। সাধুজি নিঃশব্দে এসে বসলো সেই মন্দিরের উঁচু দাওয়ায়। পাথরে বাঁধানো দাওয়া—এখান থেকে সিঁড়ি একেবারে নদীর গর্ভ পর্য্যন্ত নেমে গেছে। কবে কোন্ নব-বিবাহিতা কন্যা এই ঘাটে স্নান করতে গিয়ে ডুবে মারা যায়—এই ঘাটের নাম তারই স্মৃতি বহন করছে—'কনে' ডোবার ঘাট'। লেখা এই ঘাটের দিকেই নাকি এসেছিল—তারপর তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। সাধুজি ঐ পাষাণ বেদীতে বসে পকেট থেকে একখানি তোয়ালে বের করে কপালটা মুছলো। তোয়ালেটা সৌখিন ভদ্রলোকদেরই ব্যবহার্য্য—বাসন্তী রং, নাজির দূর থেকেই দেখতে পেল তোয়ালেটা। ও যে সাধু নয়—ও যে কে—তা বুঝতে আর বাকি রইলো না নাজিরের। কিন্তু কেন? কেন

ছদ্মবেশ ? কেন ওর নিজের ’পরে এতখানি নিষ্ঠুর নির্যাতন ? নাজির জানে না। বিস্ময়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েই রয়ে গেল নাজির।

সাধু বসে বসে একটা চুরুট টানছে। সাধু আবার চুরুট খায়—বেশ সাধু তো ? নাজিরের হাসি পেল। আস্তে এগিয়ে গিয়ে ডাক দিল, —সেন সায়েব! আদাব।

চম্‌কে উঠলো সাধু—দাঁড়িয়ে উঠে বললো—কাকে ডাকছো ?

—আপনাকেই। চিন্‌তে পারছেন না ? নাজির বললো।

আর উপায় নাই, লোকটা ধরা পড়ে গেছে। আবার বসে পড়ে আস্তে বললো—বসো দাদু। এতোখানা রাস্তা আমার পিছনে এলে তুমি।

—হু—আপনার ই দশা কেনে সেন সায়েব। ই সব সাধুগিরি কিসের লেগে ?

—বসো, বলছি।—সাধু একটা নিশ্বাস ছাড়লো—দীর্ঘ নিশ্বাস—তুমি তো তাকে দেখো নি দাদু—ঐ চন্দ্রলেখা, যার নামে ওরা আজ মন্দির গড়েছে—ও ছিল আমারই আপনার জন।—‘বৌ’ কথাটা বলতে গিয়েও বললো না সেন সাহেব।—এই কনে ডোবার ঘাটেই নাকি সে ডুবে মরেছে—তুমি কবে এলে দাদু ? অঞ্জনবাবু, কাজলবৌ, মণ্টু-কাটিম—ওরা সব ভাল আছে তো ?

—হু—ভালো আছে। নাজির বসলো ঐখানে মাটিতে—আমরা কাল এসেছি, মণ্টু আর আমি।

—ও, থাকবে দু’চার দিন

—না, কালই যাব চলে। আচ্ছা, উনি কেনে ডুবলেন ? কিসের লেগে ?

—সে অনেক কথা দাদু। তোমার কাজল দিদিকে শুধিয়ো—ও সবই জানে।—কিন্তু একটি কথা দাদু—তুমি ছাড়া কেউ আমায় চিন্‌তে পারেনি—মণ্টুও না। তুমি যেন কাউকে বলো না যে আমি এসেছিলাম

—না। যখন লুকিয়ে আইছেন তখন আমার বলায় কাজ কি ?

—হ্যাঁ—কারণ - এখানে কেউ-ই জানে না যে লেখা আমার কে ছিল। সে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে, তার নামে যদি কেউ শ্রদ্ধা জানায় তো জানাক।

শিলাজিতের কণ্ঠস্বর কাঁপছে—কাঁদছে নাকি ও ? নাজিরও বিশেষ কিছু জানে না এই শিলাজিত আর চন্দ্রলেখার সম্বন্ধে। আজকার এই শিলাজিতকে দেখে নাজিরের প্রৌঢ় পিতৃমন কোমল হয়ে উঠলো—করুণায় বিগলিত হয়ে গেল। এই লোকটিকে অল্পই চেনে—জানে, ও ধনীর দুলাল—বিলাস-ব্যসনে জীবনের সবক'টা বছরই কাটিয়ে এসেছে। আজ সাধুগিরি করতে গিয়েও সৌখিন রুমাল আর সুগন্ধি চুরুট ছাড়তে পারে নি। কতখানি দুঃখে যে ও এই ভেক্ নিয়েছে, নাজির যেন সেটা অনুভব করলো তার স্নেহ-কোমল মন দিয়ে। শিলাজিতকে এর পূর্ব্বে ভালোচোখে দেখে নি নাজির; কিন্তু আজ যেন পিতার মত সান্ত্বনার সুরে বললো—না ভাই, আমি কারুকে কিন্তু বলবো না, আর খোকন, কাজলদিদি, উয়োরাও মানা করেছে বলতে। কিন্তু তুমি কি সন্নিসি হবে নাকি ভাই সেন সায়েব ?

—না দাদু; সন্ন্যাসী হবার মতন মুরোদ কৈ আমার। আমি যে কত বড় বজ্জাৎ লোক—তা তো ,তুমি জানো দাদু। আমি চোর—তোমার থেকে অনেক বেশি সাংঘাতিক চোর আমি দাদু—জানো তো !

হাসলো শিলাজিত—কিন্তু ম্লান সন্ধ্যালোকে ওর হাসিটা কান্নার থেকেও করুণ দেখালো। অনুতাপের অতল গহ্বরে ও ডুবে গেছে যেন—ও যেন এই পৃথিবীর ওপার থেকে কথা বল্‌ছে—পাতাল থেকে নিশ্বাস ফেলছে, পাথার থেকে তাকিয়ে রয়েছে। নাজির স্নেহভরা কণ্ঠে বললো—যে চলে গেল, তার জন্যে দুঃখু করতে নাই ভাই। তুমি এবার শাদী কর—সংসার কর—বয়েস আর কতই বা তোমার ? ই বয়েসে কি আর

সাধু সাজা চলে ? চলো—উঠো ইখান থেকে !

—না দাদু—এইখানেই থাকবো আজ।

—ইখেনে কোথা থাকবে ভাই ? এই ঠাকুর ঘরে ?

—হ্যাঁ—কাল সকালের ট্রেণেই চলে যাব।

নাজির চুপ করে রইল। মন্দিরের পূজারী ঠাকুর, দু'জন শিষ্য কিম্বা চাকর এবং একজন ঝি আসছে। আরতির দেরী হয়ে গেছে ওদের—খুব ত্বরা করে এসে ওরা নাজির আর শিলাজিতকে দেখে থেমে গেল। শিলাজিত দু'খানা দশ টাকার নোট পূজারীর পায়ের তলায় নামিয়ে দিয়ে বললো—আজকার রাতটা এইখানে প্রসাদ পাব তো ঠাকুর ?

কুড়িটা টাকা একসঙ্গে—মা'র ভোগের সঙ্গে আরও বেশ কিছু পাওনা হবে—পূজারী বিব্রত হয়ে বললো—আজ্ঞে হে হে—সি আর বেশি কথা কি ? কোথাখে আসা হচ্ছে সাধুবাবার ?

—সম্প্রতি কালীঘাট থেকে, তবে আমার আশ্রম কণখল—হরিদ্বারের দিক।

—ওঃ, তা বসুন। ইনি ? ইনিও কি থাকবেন ?

—না ঠাকুর—আমি রাজবাড়ীতে ফিরে যাব—নাজির নিজেই উত্তর দিল। উঠে দাঁড়াল—বললো—তাহলে দাদু—সামলে বললো—তাহলে আমি যাই সাধুজি—কাল ইষ্টিশনেই দেখা হবে। আমি তো শিয়ালহাটই যাব—মণ্টু যাবে বাড়ী চলে। তাহলে একসঙ্গে-ই...

হ্যাঁ—নটার ট্রেণে—কেমন ?

—হু—নাজির আদাব জানিয়ে ফিরতে লাগল। শিলাজিত খানিকক্ষণ আরো বসে থেকে উপভোগ করতে লাগলো স্থানটার সান্ধ্য-সুষমা। সুন্দর জায়গাটি। নদীর উপর বিস্তীর্ণ মাঠ, কাশফুলে ভর্তি বালুচর—দূরে দূরে আম বাগানের আড়ালে গৃহস্থ-বধূদের প্রদীপের আলো ঝক্‌মক্ করছে—নাক ভিজিয়ে আকাশ বাতাস—টাঁ মরবার মতই যায়গা বটে। আবকিস

ঘণ্টা বেজে উঠলো। শিলাজিত উঠে নদীতে গিয়ে মুখহাত ধুয়ে মন্দিরে উঠে এল আবার। বিশ্ব-জননীর অষ্টোত্তর শতভূজা মূর্ত্তি; প্রসন্ন প্রশান্ত দু'টি চোখ—প্রদীপের আলোতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।—চমৎকার! শিলাজিত মাথা নোয়ালো। জীবনে বোধ হয় এই প্রথম ওর দেবমূর্ত্তিকে প্রণাম করা। পুরোহিত ঠাকুর প্রাচীন ব্যক্তি। শিলাজিতকে দেখেই অনুমান করেছিল—এই লোকটি ঠিক সাধু-সন্ন্যাসী নয়—পরিব্রাজক হতে পারে। হাতে টাকাকড়িও আছে। দু'চার দিন রাখতে পারলে লাভই হবে। তাই যত্ন করে প্রসাদ খাইয়ে ওর ঘুমানোর যায়গা করে দিলো ঐ মন্দিরের দাওয়াতেই। বেশ হাওয়া—ঘুম ভাল হবে। মশারীও দিল একটা।

শিলাজিত শুয়ে শুয়ে তাকিয়ে আছে নদীটার দিকে। ওপারের গ্রামের ছোট ছোট আলোগুলি একে একে নিভে গেল—তার জায়গায় অজস্র জোনাকপোকার আলো জ্বলে উঠলো। উপরে অনন্ত নক্ষত্রখচিত নীরব আকাশ। নদীর কালো জলে ছোট ছোট ঢেউ আধো অন্ধকারে কেমন রহস্যপুরীর মত দেখাচ্ছে। দূরদিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র অন্ধকারে লেপাপোঁছা হয়ে একটা সীমাহীন শূন্যতায় হাহাকার করছে যেন। আপনার অন্তরের সঙ্গে শিলাজিত এই বিরাট শূন্যতার তুলনা করলো। হ্যাঁ, অমনি শূন্য হয়ে গেছে তার অন্তরখানাও—অমনি হাহাকার সেখানেও নিস্তব্ধ ভয়ালতা বিস্তার করেছে; এই জনমানব-পূর্ণ পৃথিবীতে কেউ নেই তার—কেউ-ই নাই। ওর সমাজ ওকে স্কাউণ্ড্রেল ভেবে ত্যাগ করেছে—কোনো ভদ্র মেয়ে-পুরুষ আর ওর সান্নিধ্যে আসতে চায় না। বোন দুটোর বিয়ে হয়ে গেলো লেখারই বড় আর মেজো দাদার সঙ্গে। তারা এখন একান্তই পর। লেখাকে হারিয়ে এমন একটা বিড়ম্বিত জীবন আসবে শিলাজিতের—কয়েক মাস আগেও সেটা বুঝতে পারে নি। ধন, আভিজাত্য আর আনন্দ উপভোগ

এই ওর জীবনের মূলগত নীতি ছিল; কিন্তু আজ মনে হচ্ছে—ধন দিয়ে সব সুখ পাওয়া যায় না—আভিজাত্য নিতান্তই কৃত্রিম খোলস। মানুষ চিরকালই অনভিজাত—আদিম এবং আরণ্যক। সভ্যতার অহঙ্কারে, ভদ্রতার কৃত্রিমতায় সে যতই আভিজাত্যের বড়াই করুক, আসলে সে সেই আরণ্যক জীব—ক্ষুধা আর কামনা যার একান্ত কাম্য, প্রেয়, শ্রেয়।

কোথায় যেন কে কাঁদছে—কী ও? কে? ঠিক শিশুর কান্নার মতন শব্দ—শিলাজিত চমকে উঠলো। উঠে দেখবে নাকি—কে কাঁদে? পুরোহিত ঠাকুর ওদিকের কোণায় শুয়ে রয়েছেন, ঘুমুচ্ছেন। মন্দিরের চাকর দুটো কোথায় শুয়েছে—কে জানে। শিলাজিত বিছানায় উঠে বসলো। না, কান্না নয়—কোনো পাখীর আওয়াজ—পেঁচা হবে, না হয় শকুনি—আর না হয় তো—যাকগে, অত ভেবে কাজ নাই। শিলাজিত আবার শোয়ার আয়োজন করছে—একটা সিগারেট ধরালো। নদীটার জলে কার যেন ছায়া. কে যেন জলের কাছাকাছি ঘাটের সোপানে দাঁড়িয়ে—হ্যাঁ—বেশ দেখতে পাচ্ছে শিলাজিত—লেখা নাকি? লেখা। শিলাজিত দু'চোখ চওড়া করে তাকালো—না. কিছু নয়—ওর মনের ভুল। কিন্তু লেখা হতেও তো পারে—লেখার মৃত আত্মা -যে লেখাকে শিলাজিত নির্ম্মমভাবে উপেক্ষা করেছে—যে লেখা সমাজহারা হয়ে—সর্ব্বস্ব হারিয়ে মৃত্যু বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছে এই শিলাজিতের জন্যই, সেই লেখার প্রেতাত্মা আজ যদি এখানে এসে দাঁড়ায়—বিচারকের মত কৈফিয়ৎ চায়—তাহলে কিছুই এমন আশ্চর্য্যের কথা নয়।

শিলাজিত মাথাটায় ঝাঁকি দিয়ে সামলে নিল। হয় যদি লেখা ভূত তো হোক না। শিলাজিত ভয় পাবে না। লেখাকে তো সে হত্যা করে নি—ছেড়ে দিয়েছিল। না, লেখাই তাকে ছেড়ে দিয়েছে—স্বেচ্ছায়, স্বেচ্ছায়। জোরে একটা টান দিল শিলাজিত সিগারেটটায়। ধোঁয়াটা

কুণ্ডলী পাকিয়ে বেরুচ্ছে মুখ থেকে। ফু ফু—শিলাজিত নিজেই ফুৎকার দিয়ে এই নিদারুণ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলো।

ঘুম তো আসবে না। ক্লান্ত শিলাজিত অবিলম্বে ঘুমিয়ে যাবে, এই আশাই করেছিল—কিন্তু কৈ, ঘুম বোধ হয় আসবে না ওর জীবনে আব। ও যেন লেখাকে হত্যাই করেছে—আর সেই আহত আত্মা ওকে অনুসরণ করে তাড়িয়ে নিযে বেড়াচ্ছে। না—না—এ রকম অনুভূতি তো হয় নি শিলাজিতের। লেখা চলে গেছে—সেই গভীর দুঃখ ওকে ব্যথিত করেছে। তারপর যখন শুনলো—লেখার দাদারা বিস্তর টাকা খরচ কবে এখানকার বাজকুমারীর সহায়তায় লেখার নামে স্মৃতিমন্দিব তৈরী করছে, তখন সাধ জাগল ওর, ব্যাপারটা দেখে আসতে হবে। তা ছাড়া আর কিছু নয়। লেখা ওকে কোনো রকম অভিশাপ দিয়ে যায় নি। আর লেখার মৃত্যুর জন্য সে দায়ী নয়। তবে লেখা যে তার আত্মাব আত্মীয়া ছিল—এই কথাটা আজ, এতকাল পরে শিলাজিত বুঝতে পারছে। বুঝতে পারছে—লেখা থাকলে শিলাজিত আজ সফল হোত—সার্থক হতে পারতো। কিন্তু লেখা বেঁচে থাকতে একদিনও শিলাজিত তো ওকে এমন ক'রে ভালোবাসতে পারে নি; ভালোই বাসে নি। তখন সে লেখার যৌবনের জোয়ারভরা দেহ-যমুনায় ভেসে গেছে—ডুবে গেছে লেখার রূপসমুদ্রে। ভালোবাসার সুযোগ ছিল কোথায়? ভালোবাসা কাকে বলে, জানতো না শিলাজিত—জানতোই না। সেটা ওকে শিখিয়ে দিয়েছে আরেক জন—সে কাজল। সেই শ্যাম-লাবণ্যময়ী তন্বী সুষমা—সেই প্রদীপশিখার মত কোমল-কম্পিত, দৃষ্টি—সেই প্রথম-জাগা প্রভাত-পাখীর মত অস্পষ্ট কণ্ঠ মাধুর্য্য—সব এক সাথে মনে পড়ে গেল শিলাজিতের। বালিশে হেলান দিয়ে নদীর দিকে চেয়ে রইল। দূরে কোথায় শেয়াল ডাকছে। দুপুর রাত গড়িয়ে গেল নাকি? হবেও-বা। দু'একটা রাতচরা পাখার কর্কশ আওয়াজ—

বাদুড়ের ডানা ঝটপট, মশার গুণগুণানি—দূর ছাই। এখানে কি মানুষের ঘুম হয়? মশারী তুলে বিছানা থেকে নেমে পড়ল শিলাজিত। আস্তে উঠে বসলো গিয়ে একেবারে শেষ সোপানে, জলের ধারে। হাতের সিগারেটটা জলে ফেলে দিয়ে জল দিয়ে হাত ধুলো—জল নিয়ে এ-হাত ও-হাত করছে—ছড়িয়ে দিচ্ছে জলের ফাগ—বেশ লাগছে এই খেলা। লেখা থাকলে হয়তো কবিতা আওড়াতো···

"যদি গাহন করিতে চাহ, এসো নেমে এসো এই গহন তলে—"
নীলাম্বরে কিবা কাজ, তীরে ফেলে এসো আজ
ঢেকে দেব সব লাজ সুনীল জলে;
সোহাগ-তরঙ্গরাশি অঙ্গখানি দিবে গ্রাসি
উচ্ছসি পড়িবে আসি উরসে, গলে"—আর মনে পড়ল না।

কবিতাময়ী—রহস্যমধুরা—স্বপ্নবিলাসিনী লেখা—কী গভীর তৃপ্তি সেই ক'টা দিনের—সেই শিয়ালহাটের নির্জ্জন নদীরতীরপ্রান্তের প্রস্তরাসনে, —সেই আরণ্যক বর্ব্বরতায়—উদগ্র যৌবনক্ষুধার আবেষ্টনে—সেই উদ্ধত চুম্বন-বিধুরার আরক্ত মুখের অসম্বৃত উৎকণ্ঠায় কী অসীম আনন্দশিহরণ! কী জয়াল উত্তেজনা! সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো শিলাজিতের। ওর অন্তরের আবক্তিম আভাস অনুরণিত হয়ে উঠলো ওর কণ্ঠে —লেখা —লেখা আমার।

আশ্চর্য্য। লেখাকে এতখানি ভালোবাসতো নাকি ও? ও তো জানতো না। জানতো না কোনো দিন। কোনো মুহূর্ত্তেই ও মনে করে নি কোনো নারী ওর অন্তরপটে আশ্রয় নেবে এমন করে। আশ্রয় নিয়েছে লেখা। কিন্তু কখন? কখন এই অঘটন ঘটলো। শিলাজিত তো টের পায় নি। নিজের মনটা ওর এতখানি অজ্ঞাত ছিল। আশ্চর্য্য! কিন্তু ঐ লেখাই কতবার বলতো—"মানুষ নিজের মনকে আকাশে চিনতে পারে না। সব থেকে বেশি রহস্য রয়েছে

মানুষের নিজের কাছে—তার মনের অতল সাগরে”—সত্যি! খুব বড় সত্য এই কথাটি লেখার। শিলাজিত চিরদিনের সৌখীন প্রজাপতি—বিদেশের শেখা অভিজ্ঞতা ও স্বদেশে এসেও কাজে লাগিয়েছে; একফুল থেকে ওফুলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভুলেছে ও পুর্ব্বের পুষ্পটিকে; তার স্বাদ, গন্ধ সবই ও নির্ব্বিকার চিত্তে নির্লোপ করে দিয়েছে মন থেকে। লেখার সঙ্গে বেশি এগিয়েছিল বিয়ে পর্য্যন্ত; কারণ বিয়ে না করলে লেখাকে পূর্ণভাবে পাওয়া ছিল সুদুষ্কর। তাই একটা অভিনয় করেছিল বিয়ের; সৌখীন একটা সিভিল ম্যারেজের। ও আবার বিয়ে নাকি? ও তো ছেলে খেলা। আর সকলের চাইতে বড় কথা, লেখা সেটা জানতো—জানতো ঐ বিয়েটা একটা খেলামাত্র ছিল। তবু বিয়ে যে কেন করেছিল লেখার মত শক্ত ধারাল মেয়ে, তা আজও শিলাজিত বুঝতে পারে নি। শিলাজিতের নিজের দিক থেকে ছিল লেখার রূপ-যৌবনের উপর লোভ। কোনো উপায়ে সে তাকে লাভ করতে চেয়েছিল—কিন্তু লেখার দিক থেকে কি ছিল? শিলাজিতকে হয়তো তাহলে ভালোই বেসেছিল লেখা—হ্যাঁ ভালোই বাসতো। কাজল একদিন বলেছিল এই কথাটা—“সই আপনাকে ভালবাসে—।” কাজলের কথা মিথ্যা হতে পারে না! লেখা তাহলে ভালোই বাসতো শিলাজিতকে। কেমন একটা অস্পষ্ট তৃপ্তি, আত্মনিগ্রহের অচেনা একটা আরাম উপলব্ধি করছে শিলাজিত! এই সন্ন্যাসবেশ তার লেখার জন্য, যে লেখা তাকে ভালোবাসতো—যে লেখার দেহমনকে সে অপবিত্র, অশুচি করে ক্ষান্ত হয় নি—তাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়েছে। সেই লেখার স্মৃতিমন্দির দেখতে আসবার জন্য নিজের এইটুকু কৃচ্ছ সাধনা আজ শিলাজিতকে কেমন যেন আত্মপ্রসাদ যোগাতে লাগলো। তার প্রিয়তমার জন্য সে এইটুকু দুঃখ আজ অন্ততঃ সইতে পেরেছে; এইটুকু কষ্ট সহ্য করে যে তার মত বিলাসী সুখলালিত ব্যক্তি আজ এই নির্জ্জন প্রান্তরে আত্মনিগ্রহের অবকাশ

পেয়েছে, এতে যেন ও ধন্য হয়ে গেল। গভীর তৃপ্তিতে ও ভাবতে লাগল —সে ছোট নয়—মানবতার দিক দিয়ে অঞ্জনের থেকে খাটো নয়— অন্তত খাটো সে থাকবে না। সেও ভালোবাসবে তার লেখাকে—যেমন করে অঞ্জন তার অন্তর-লক্ষ্মী কাজলকে ভালোবাসে। কিন্তু কোথায় লেখা? কাকে আর ভালোবাসবে শিলাজিত? দু'ফোঁটা জল হঠাৎ পড়ল অজয়ের অমলিন জলস্রোতে—মুক্তার মত লোনা জল। অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করল শিলাজিত—লেখা—।

৪

সমস্ত প্ল্যানটা বিপর্য্যস্ত হয়ে গেল কিংশুকের। যে কটা কথা কেয়াকে বলবে বলে ও মনের মধ্যে সাজিয়ে রেখেছিল, তার কোনটাই বলা হোল না। কেয়া নিজের খেয়ালেই চলেছে। একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক—খাস কলকাতায় যার বাড়ী এবং যে ব্যক্তি এই যুদ্ধ থামলেই বিলাত যাবে ঠিক হয়ে আছে, তার সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষা করে কয়েকটা ভালো কথাও বললো না মেয়েটা! খানিকটা কাঁদলো আর কি যে আবোল তাবোল বকলো—কিংশুক তার মাথামুণ্ডু খুঁজে পায় না। লেখা চলে গেছে —তার আত্মীয়-স্বজন আমরা যথাসাধ্য তো তার জন্য করছি! এতো বড় স্মৃতিমন্দির তৈরী হল—ভারতের একজন জন-নমস্য ব্যক্তি তার উদ্বোধন করলেন—কাল সকালেই সমস্ত সংবাদপত্রে সেকথা বড় বড় অক্ষরে ছাপা হবে—তার ব্যবস্থা হয়েছে। ওর সঙ্গে মিথ্যা-সত্য মিলিয়ে লেখার ছোট্ট জীবনীটুকু—আবার চাই কি বাপু। কাঁদবার কি আছে এতো? তাছাড়া, লেখা কিংশুকের নিজের বোন—কেয়ার আর কি এমন? মাত্র ক'দিনের পরিচয়, শেষের দিন ক'টা এইখানে সে এসেছিল—আর কেয়ার ইচ্ছে ছিল ওর বিপত্নীক বাবার সঙ্গে লেখার বিয়ে দেবে—এইটুকু তো

সম্পর্ক। তার জন্যে কেয়া যা করলো,—বাপ্ স—কেউ কি কখন করে! এর উপর আবার এত শোকাশ্রু! দূর করো—ভালো লাগে না কিংশুকের। কেয়ার মতন অপূর্ব্ব রূপসী মেয়ে হাসবে—গাইবে—নাচবে —কথায় ফুটে পড়বে খৈ ফোটা হয়ে—, তা না, কেবল কান্না।

বিরক্ত হয়ে কিংশুক মন্দিরের দাওয়ায় দাঁড়ালো। কেয়া ভেতরে ঢুকে গেছে এর মধ্যে। পূজো চলেছে—সন্ধ্যারতি। কেয়ার বাবা একদিকে বসে আছেন—নিশ্চল পাষাণ মূর্ত্তি যেন। কিংশুক এসে অবধি ওঁকে দেখে নি—দেখেছে শুধু কেয়ার ঠাকুরদাকে। কেয়ার বাবা আজকাল আর কোথাও যান না—অন্তঃপুর আর এই মন্দির—মাঝে মাঝে সেই পুকুর ধারে আর বাগানে বেড়ান। কিংশুক ঐ দিব্যকান্তি পূর্ণ যৌবনান্বিত রাজকুমারকে দেখে প্রথমে ভাবলো—কে ইনি? নূতন কোনো মান্যবর অতিথি নাকি? কিন্তু ওঁর খালি গা আর গলায় শুভ্র উপবীত দেখে বেশ বুঝলো—পণ্ডিত-টণ্ডিত কেউ হবেন। ওঁর সামনে খোলা রয়েছে একখানা মোটা বই—উঁকি দিয়ে নামটা দেখলো কিংশুক—চৈতন্ত চরিতামৃত। ওঃ, পণ্ডিত একটা।—বাইরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে কিংশুক দামী সিগারেট ধরালো। উনি তাকালেনও না। কেয়া বোধ হয় মন্দির-সংলগ্ন ছোট্ট ঘরটায় কাপড় ছাড়ছে—কৈ সে—তাকে তো দেখা যাচ্ছে না মূর্ত্তির সামনে। পূজারী আরতি করছেন। এ সব দেখা বড় একটা অভ্যাস নাই কিংশুকের। ওর শিক্ষিত বিজ্ঞানাভিমানী মন এই সব পুরোনো কুসংস্কার মোটে পছন্দ করে না—কিন্তু এখানে সে কথা বলা না— পুরোহিত প্রদীপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আরতি করছেন।

মনে কিছুমাত্র রসবোধ আছে, সেই এ দৃশ্য পছন্দ করবে; কিন্তু কিংশুক এর মধ্যে কুসংস্কার আর কদর্য্যতা ছাড়া কিছু দেখলো না—এই ইনিয়ে বিনিয়ে তেলসল্‌তে, ধূপদীপ খরচ করার কোনো মানে খুঁজে পায় না ও। মূর্খামি ছাড়া কি আর এসব।

কিংশুক অসাধারণ আপ-টু-ডেট্ ছেলে—আলট্রা মডার্ণ—যাকে বলে সেই···থাক্। যে কেউ ওকে দেখলেই বুঝতে পারবে, সে কতখানি এগিয়ে গেছে তার যুগকে ছাড়িয়ে।

আরতি চলতে লাগলো—প্রদীপ নিয়ে—ধূপ নিয়ে—শঙ্খ নিয়ে—বস্ত্র নিয়ে—চামর নিয়ে···উঃ কী টিডিয়াস্—ইন্‌টলারেব্ল্।

কিন্তু কেয়ার সঙ্গে ওর আবার দেখা করা দরকার। এখনো অন্তঃপুরে কেয়া ঢোকে নি। অতএব এইখানে আর একবার সম্ভাষণ ও জানাবেই। তাই অপেক্ষা করছে। ঝি-চাকরগুলো হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো—কী ব্যাপার? কিংশুক চেয়ে দেখলো—বাগানের পথ ধরে স্থূলকায় একজন বৃদ্ধ আসছেন। গায়ে ফতুয়া—পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি—এই দিকেই আসছেন—পিছনে একটা চাকর। কেয়ার ঠাকুরদা; হ্যাঁ। কিন্তু উনি মন্দির অবধি এলেন না—মাঝপথে ছোট একটা কাঁঠাল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে গেলেন! চাকরটা খানিক তফাতে সসঙ্কোচে দাঁড়ালো। যাবে নাকি কিংশুক ওঁর সঙ্গে আলাপ করতে? আলাপ তো আগেই হয়েছে অল্প—আর একটু জমিয়ে নিলে কেমন হয়? কিংশুক দাওয়ার সিঁড়িতে নামতে নামতে হাতের সিগারেটটা ঐখানেই ফেলে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিল। এক পা সরে যেতেই একজন ঝি সেটা তুলে নিয়ে অনেক দূরে বাগানের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কিংশুক বুঝলো—দেবমন্দিরের দাওয়ার সিঁড়িতে এঁটো সিগারেট ফেলা এদেশে চলে না। মনটা কেমন লজ্জিত আর বিষন্ন হয়ে গেল ওর। চাকরগুলো ওকে অসভ্য মনে করছে হয়তো? হয়তো মনে করছে, লোকটা মন্দির কখনো দেখেনি। নাঃ, এ সব এখানে চলবে না—কিংশুক সাবধান হবে। এ বাড়ীতে আত্মীয়তা রাখতে গেলে এই বাড়ীর আদব-কায়দা মেনে চলা একান্ত দরকার—না হলে কিংশুকের স্বার্থ পীড়িত হতে পারে। মুহূর্তে কিংশুক কি ভেবে জুতোটা [illegible] মন্দিরের ভেতর এসে প্রণাম করল। প্রসাদ না নিয়ে ওর এখন

কোথাও যাওয়া উচিত নয়। উপবিষ্ট কেয়ার বাবা ওকে দেখে হাত তুলে বসতে ইঙ্গিত করলেন কাছের কার্পেটের আসনে—উনি অবশ্য কুশাসনেই বসেছিলেন। কেয়ার বাবাকে চেনে না কিংশুক—কিন্তু ইনি যে এখানকার একজন সম্মানিত কোনো পণ্ডিত, সে বিষয়ে ওর সন্দেহ নেই। ইঙ্গিতটা ও অগ্রাহ্য করতে পারলো না—বসে পড়ল। পুরো চার আঙুল আঁচলার ধাক্কা দেওয়া জরিপাড় ওর মিহি ধুতি আর সুক্ষ্ম আদ্দির পাঞ্জাবীতে ভাঁজ পড়ে যেতে পারে—কিন্তু একসেট ধুতি-পাঞ্জাবী নষ্ট হলে ওর কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। দু'পাঁচ হাজার ও অনায়াসে উড়তে পারে।

পুরোহিত ঠাকুরের পূজো যেন শেষই হয় না—বিরক্ত খুবই হচ্ছে কিংশুক, কিন্তু নিরুপায় হয়ে গেছে সে এখন। ওদিকে কেয়ার ঠাকুরদা এগিয়ে এতক্ষণ বাগান থেকে অন্যত্র চলে গেলেন—আর হয়তো আজ দেখা হবে না—নাঃ, মূর্খামি করলো কিংশুক! ঠাকুরদার কাছেই যাওয়া উচিত ছিল তার। ঠাকুর আরতি এক সময় শেষ হল—সন্ধ্যার শান্ত নীরবতা অকস্মাৎ আকুলিত করে বেজে উঠলো কার সুর-ঝঙ্কার :—

"তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল কর মলিন মর্ম্ম মুছায়ে—
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর মোহ আঁধার ঘুচায়ে..."

কে গাইছে? কেয়া নাকি? কিন্তু কোথায় সে? ঐ যে, ঐ ছোট্ট ঘরটার এক পাশে খালি গলায় গাইছে কেয়া—একটা যন্ত্রও নাই; কিন্তু যন্ত্রের দরকারও নাই—কি অপরূপ মিষ্ট স্বর—কি আশ্চর্য্য সুরের রেশ! কিংশুক মুগ্ধ হয়ে গেল। কেয়ার বাবা ঐদিকেই তাকিয়ে। কেয়ার চোখে অশ্রু টলমল করছে—দীপের আলোতে চক্‌চক্ করছে ডাগর চোখদু'টি। কিংশুক নির্নিমেষ হয়ে চেয়ে আছে! ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গানটি শেষ করলো কেয়া—প্রায় আটদশ মিনিট ধরে গাইল!

—কেয়া,—মা—ডাকলেন ঐ কুশাসনে উপবিষ্ট ব্যক্তি। নাম ধরে

ডাকে রাজকুমারী কেয়াকে ? কে লোকটা ? হয় তো কোনো আত্মীয় ! কেয়া সাড়া দিল—যাই—কিন্তু ও আসছে না—বসেই রইল !

—এ গান তুই কোথায় শিখলি মা ? উনি প্রশ্ন করলেন—বহুদিন পরে শুনলাম কান্ত কবির এই গান ।—যে সৌম্যদর্শনা প্রৌঢ়া বিধবাটি পূজারীকে পূজোপকরণ যোগাচ্ছিল সেই বললো—আজ এক সন্নেসী বাবা এসেছিল—ঐখানে, ঐযে কলাকেন্দ—তিনিই গাইল গানটি !

ওর ভাষার দৈন্য আর দুর্ব্বলতা দেখে কিংশুকের হাসি পাচ্ছে, কিন্তু পণ্ডিত কিছুমাত্র না হেসে বললেন—তাঁকে এখানে আনলে না কেন ?

—রাজকুমারী ডাকতে পাঠালো বাবা—তা উনি বললো—আসবো না—হয়তো উনি ঘরবাস করে না ।

—হবে । কেয়ামণি !—উনি আবার ডাকলেন । কেয়া উঠে গেছে । এদিকের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেছে ! বাগানে দাদুর কাছে সেই কাঁঠালতলায় গেল । দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—দাদুর হাত ধরে ও পুকুরের দিকে যাচ্ছে । ম্লান জ্যোৎস্না-মাখানো সন্ধ্যা—পথের দু'পাশে পুষ্পিত তরুলতা—কেয়া দাদুর বাম হাতখানা জড়িয়ে ধরে আস্তে হাঁটছে । ও যেন অত্যন্ত ক্লান্ত—তাই এক মহামহীরুহের গায়ে আশ্রয় নিয়েছে । খানিকটা এগিয়ে মন্দিরের দরজার সামনা-সামনি এসে কেয়াকে ছেড়ে বৃদ্ধ দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন—তারপর জলদগম্ভীর স্বরে ডাক দিলেন—রামসিং !

—হুজুর—রামসিং পিছনেই ছিল । বৃদ্ধ বললেন—দেওয়ানজিকো··· সেলাম জানিয়ে রামসিং চলে গেল । বৃদ্ধ আবার কেয়াকে নিয়ে ঐ পুকুর দিকেই হাঁটতে লাগলেন ।

কেয়ার মনের অবস্থা খুবই খারাপ আছে—ও আর এখানে আসবে না হয়ত—বুঝতে পারল কিংশুক । দাওয়ার এক দিকে সেই প্রৌঢ়া ভদ্র মহিলাটি প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ করছে । ছেলেমেয়ে অনেকগুলি—তার

পর কয়েকজন কচি-ছেলে-কোলে মা—দু'তিনজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা প্রসাদের জন্য হাত বাড়াচ্ছে! ওদিকে খানিকটা দূরে একদল ভিখিরি—জীর্ণ কঙ্কালসার—মানুষ কি প্রেত বোঝা যায় না—ওরাও লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে এই দিকে। এই কণিকামাত্র প্রসাদের সামান্য অংশ ওরাও পেতে চায়। মহিলাটি প্রসাদ বিলি করছে,—কেয়ার বাবা উঠে দাঁড়ালেন। একটা ধামায় আধমণ খানেক চাল, আরেকটায় সের পনর ডাল—একটা ঝুড়িতে কিছু তরকারী—তিনটে চাকর নিয়ে আসছে। কেয়ার বাবা উঠে দাঁড়াতেই ভিখিরিগুলো আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলো। "জয় হোক—রাজাবাবুর জয় হোক।" চাকর তিনটিকে সঙ্গে করে উনি ভিখিরিদের দিকেই যেতে লাগলেন—। মন্দিরের প্রকাণ্ড দাওয়ার একপ্রান্তে ওরা দাঁড়িয়ে। কি ভেবে কিংশুকও উঠলো—যেতে আরম্ভ করলো ওঁর পিছনে। ভিখিরিদের কাছে গিয়ে উনি ছোট টিনের মগ ভর্ত্তি করে চাল-ডাল-তরকারী দিতে আরম্ভ করলেন প্রত্যেককে। কিংশুক তফাতে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। এরা সংখ্যায় অনেকগুলি। একা উনি পারছেন না তাড়াতাড়ি শেষ করতে; কিংশুক সাহায্য করবে নাকি? হঠাৎ কি মনে করে কিংশুক এগিয়ে এল—কিন্তু কি ভেবে আবার থেমে গেল। ঐ লোকটা হয়তো কোনো পণ্ডিত—কিম্বা এবাড়ীর পুরোনো কোন কর্ম্মচারী। কিংশুক এখানে সম্মানিত অতিথি—এসব কাজ শুধু দেখেই যাওয়া উচিত—নিজে হাতে সে করতে যাবে কি জন্যে? বিশেষ যখন এখানে কেয়া বা তার ঠাকুরদা উপস্থিত নাই, তখন এই রকম একটা জঘন্য কাজে হাত দিয়ে হৃদয়-মাহাত্ম্য দেখাবার প্রয়োজন কোথায়? বিরক্ত কিংশুক কাছাকাছি একটা ঝাউ গাছের পাতার কারুকার্য্য দেখতে লাগলো—যদিও সন্ধ্যার স্বল্পালোকে বিশেষ কিছুই দেখা যায় না।

কেয়া ফিরে আসছে—এই দিকেই আসছে—ওর ঠাকুরদাও। হঠাৎ ঠাকুরদাকে ছেড়ে কেয়া ওর বাবার কাছে ছুটে এসে চাল বিলোতে আরম্ভ

করলো—তার সঙ্গে তরকারী। কিংশুক ভাবতে লাগল—কেন সে ঐ কাজটা এতক্ষণ করে নি—কি বোকা সে! কেয়া যদি এসে দেখতো যে কিংশুক ঐসব কাজ করতে ভালোবাসে, তাহলে কতখানি কাজ যে এগিয়ে যেত! আপনার বুদ্ধিকে আর একবার ধিক্কার দিল কিংশুক।

ঠাকুরদা কিংশুকে দেখেই প্রসন্ন মুখে বললেন—প্রসাদ নিয়েছ দাদা?

—না—এখনো নিই নি—আপনারা সব আসুন—তার পর..। কিংশুক এই বৃদ্ধের কাছে কেমন যেন কুণ্ঠিত হয়ে পড়ছে বারবার। আভিজাত্যের অহঙ্কার করে তারা—কিন্তু এই বৃদ্ধটি যেন একটি মূর্ত্তিমান আভিজাত্য। ওঁর বিদ্যাসাগরী চটি আর ছেঁড়া খদ্দরের ধবধবে সাদা ফতুয়া—ওঁকে যেন প্রতিপাদক্ষেপে রাজাধিরাজের আসনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।—অথচ উনি মোটেই গম্ভীর নন—মুখে বিন্দুমাত্র বিরক্তির কুঞ্চন রেখা নেই। সদা প্রসন্ন উনি, তবুও কিংশুক সত্যি কুণ্ঠা বোধ করছে। নিজেকে ওর অত্যন্ত ছোট, অতিশয় তুচ্ছ মনে হচ্ছে এঁর কাছে।—উনি তাকালেন।

—এর হাতে জল দাও তো মায়া!

মহিলাটি সব কাজ রেখে ঘটিতে করে জল নিয়ে এলো। বৃদ্ধ বললেন,—হাত ধোও! মন্দিরের মধ্যে ওকে ডেকে নিয়ে গিয়ে উনি বসালেন একটা আসনে—নিজেও বসলেন—দাও মায়া, একে প্রসাদ দাও।

কয়েকটা ফলমুল, কিছু মিষ্টি, একটু ছানা—একটু ডাবের জল—এই প্রসাদ।

সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করা রূপোর একটা রেকাবীতে এনে দিল মায়া কিংশুকের সুমুখে!

—আপনি?...কিংশুক সভয়ে প্রশ্ন করলো।

—আমি! হ্যাঁ—আমিও নিচ্ছি—দাও মা—হাতের তেলোটা মাথায়

ঠেকিয়ে উনি হাত পাতলেন। এক টুকরো ফল মায়া ফেলে দিল ওঁর হাতে। সেটুকু আবার মাথায় ঠেকাবার মত ভঙ্গী করে তিনি মুখে ফেলে দিলেন। কিংশুক আস্তে আস্তে খেতে লাগলো। পাছে কোনো অভদ্রতা প্রকাশ পায় এই ভয়ে ও এখন কথাই বলছে না। অতিশয় সাবধান হয়ে গেছে ও। কেয়া পরমোৎসাহে ডাল-চাল-তরকারী বিলি করছে—। —ওর পিঠের পাতলা জামাটা পিঠের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে ঘামে—দেখতে পাচ্ছে কিংশুক।—নিজের হাতে কি ওসব কাজগুলো না করলে হয় না? কিংশুক যেন আত্মগত ভাবেই বলল। বৃদ্ধও দেখছিলেন, কিংশুক কেয়াকে বললেন—করুক—যা ওর ইচ্ছে করুক, ও ভালোবাসে ঐ সব করতে।

—বড্ড পরিশ্রম করছেন কিন্তু! বললো কিংশুক। বৃদ্ধ চুপ করে রইলেন এবার। কিংশুক আবার বললো দরদের সঙ্গে—লেখাকে যে উনি কতখানি ভালোবাসেন, আজ বুঝলাম—।

—হ্যাঁ—হতভাগী কেন যে চলে গেল! বৃদ্ধ—একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। কিংশুক বুঝল, লেখাকে এরা বাড়ীশুদ্ধ সবাই ভালোবেসেছিল। ভাগ্যবিড়ম্বিতা লেখার শেষের ভাগ্যটা স্মরণ করে দুঃখ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু কেয়ার চাল বিলোনো শেষ হয়েছে—আসছে এদিকে।—ভেতরে ঢুকে একচোখ দেখে নিয়ে বললো—প্রসাদ দিয়েছে আপনাকে? বেশ।

—হ্যাঁ, আপনি তো দিলেন না।—বললো কিংশুক মৃদু হেসে। হয়তো একটু ঘনিষ্ঠতা করবার জন্যই বললো, কিন্তু কেয়া সে আত্মীয়তার ছায়া দিয়েও গেল না।—বললো—মণ্টু আসে নি দাদু? কোথায় সে?

—কৈ রে, দেখিনি তো মণ্টুকে।—কথাটা শুনে কেয়া একজন চাকরকে বললো—ডাকতো মণ্টুবাবুকে! বল,—দাদু প্রসাদ নিতে ডাকছেন।

কিংশুকের আত্মীয়তার চেষ্টাটা স্বচ্ছন্দে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য কেয়ার

বাধলো না—কারণ, মন্দিরের প্রসাদ যিনি দেন তিনিই দিয়েছেন। এর ব্যতিক্রম হবার কোনো কারণ নেই—কেয়া জানে। কিন্তু কিংশুক ক্ষুণ্ণ হোল। মুখখানা গম্ভীর করে প্রসাদের সব কটা টুকরো না খেয়েই উঠে হাত ধুলো গিয়ে বাইরে। ফিরে আসতেই কেয়া তাকালো ওর মুখের পানে—দুই কালো চোখ যেন ভৎর্সনার দীপ্ত বহ্নি—ভয় পেয়ে গেল কিংশুক। কেয়া তাকিয়ে বললো—প্রসাদ এঁটো রেখে উঠে গেলেন ?

—থাক্-থাক্ দিদি, ওরা সব কলকাতার ছেলে—বসো ভাই, বসো—দাদু ব্যাপারটা সামলাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কেয়া আবার বললো—ঠাকুরের প্রসাদ নিতে কাউকে নিমন্ত্রণ করা হয় না—এসে চেয়ে নিয়ে খেতে হয়। শিখে রাখবেন।

সঙ্কোচে জড়সড় হয়ে গেল কিংশুক। এতোটা বয়েস ওর হয়েছে—কোনো মেয়ে ওকে ভৎর্সনা করবে—শিক্ষা নেবার কথা বলবে—এমনটা ও কখনো কল্পনা করে নি। ওর শিক্ষা আর সভ্যতাবোধের অহঙ্কার ওকে সর্ব্বদা সচেতন রাখে উচ্চশ্রেণীর জীব বলে—কিন্তু আজ ঐ কাঁচাবয়সের একটা গ্রাম্য মেয়েব কাছে শিক্ষাই লাভ করলো কিংশুক। সলজ্জ হেসে বললো—আমি জানতাম না। কেয়া আর কোনো কথা না বলে ওর বাবার দিকে এগিয়ে গেল। শুভ্র সুন্দর উপবীতটি পিঠের উপর পড়ে আছে—পাক লেগে জড়িয়ে গেছে একটা জায়গা—হাত দিয়ে সেই জড়ানো পাকটা খুলতে লাগলো—উনি তানপুরায় ঝংকার দিলেন।

কিংশুক ভাবছে—বামুনের ছেলে হলে কি হবে, পৈতে নেই ওর। বাবা-মা অবশ্য দিয়েছিলেন—কিন্তু কিংশুক বহুদিন হলো সেটা ফেলে দিয়েছে। ভাগ্যিস গায়ে জামা আছে, না হলে কিংশুককে এরা বের করেই দিত হয়তো। কি ভয়ঙ্কর গোঁড়ামি! কিন্তু গোঁড়ামি হলে কি হবে, এদের আত্মীয়তা পেতে হলে—এই সব করতেই হবে। কিংশুক আস্তে আস্তে

বেরিয়ে পড়ল—দেখলো মণ্টু আসছে—মণ্টু যে কে তা ও চেনে না—চিনবার ইচ্ছে রয়েছে, কিন্তু এখন সময় কৈ! কিংশুক একেবারে বাইরের, রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। খানিকটা এসে একখানা মুদীর দোকানে প্রশ্ন করলো—পৈতে আছে? পৈতে!

—আজ্ঞে না, নাই।

—আচ্ছা, শক্ত সুতোর কাটিম পাওয়া যাবে?

—হ্যাঁ।

—দিন তো।

—পৈতে পাবেন আপনি ঐ অধিকারীদের বাড়ীতে। অধিকারীর মা তৈরী করেন!

—থাক, আপনি কাটিম দিন একটা। তিন আনায় রীল সুতা কিনে কিংশুক ফিরলো তার থাকবার ঘরে; পৈতেটায় এখন গ্রন্থী দিয়ে নিতে হবে—কিন্তু ও তো জানে না। নিজেকে আজ বড়ো অসহায় বোধ করতে লাগলো কিংশুক।

* * *

গভীর অন্ধকার ঘরে নাজির একলা শুয়ে শুয়ে ভাবছে—কাল সকালে মণ্টু চলে যাবে বাড়ী, আর নাজির যাবে আবার সেই শিয়ালহাট। বাড়ীটাও যদি একবার ঘুরে যেতে পারতো ও! কিন্তু অঞ্জন বলে দিয়েছে, মণ্টুকে জংসন-ইষ্টিশনে ছেড়ে দিয়ে নাজির যেন সটান চলে আসে। নইলে স্কুল কামাই যাবে, আর অঞ্জন নাকি কোথায় যাবে নাজির ফিরলেই! থাক্—বাড়ী আর এখন নাই-বা গেল নাজির—যাবে সেই পুজোর সময়, অঞ্জন-কাজলবৌ-কাটিম সবাই যখন যাবে—তখন সেও আসবে ওদের সঙ্গেই। কিন্তু নাজিরের মনটা কেমন দুর্বল

হয়ে যাচ্ছে। বাড়ীর এতো কাছে এসেও যেতে পাবে না ও! জংশনে নেমে গাড়ী বদল করে কটাই বা ইষ্টিশান—সকালে রওনা হলে বেলা দশটার মধ্যেই বাড়ী পৌঁছে যেতে পারে—তারপর কালকার দিনটা থেকে পরশুই না হয় ফিরবে নাজির। হ্যাঁ—যাবে ও—একদফা ঘুরেই যাবে বাড়ী থেকে।

মনটা আনন্দে নেচে উঠলো বাড়ী যাবার চিন্তায়। বাড়ীতে নাই কেউ—নাই বা থাকলো—গ্রামে তো সবাই আছে। তার গ্রাম, তার জন্মভূমি—তার শৈশব-কৈশোর-যৌবন-প্রান্তের লীলানিকেতন—ক'টা মাস আজ দেখেনি নাজির সেই সারিবন্দি খড়ের ঘর—সেই দাওয়ায়-দাওয়ায় মাতব্বরদের আলোচনা আর তামাক টানা—সেই গ্রামপ্রান্তে তার ভিটে, সেখান থেকে নদীর ধারের লাল করবী বনটায় পাতার ঝিলমিলি দেখা যায়—আখের ক্ষেত আর আনাজের পাতাগুলো চমৎকার চোখে পড়ে। বর্ষার বান আসবে—এসেছে হয়তো এরই মধ্যে, শুকনো নদীর বালি বেনো জলে ডুবে গেছে। মাঝে মাঝে হয়ত দ' পড়েছে, গাঁয়ের জোয়ান ছেলেরা তাতে টোপ ফেলে মাছ ধরছে—জেলেরা জাল ফেলছে—মেয়েরা মুস্কিলে পড়েছে—ওদের গা ধুতে আসবার ঘাটগুলো এরা আগলেছে!

ধানক্ষেতগুলো হয়তো চষা হয়ে গেছে—দু'চারটা ক্ষেতে ধান পোঁতা হচ্ছে, চার পাঁচটা মেয়ে হয়ত গুড়ি মেরে ধানের গোছা পুঁতে চলেছে সার দিয়ে! গান করছে একসুরে সবাই। ক্ষেতের তলতলে কাদায় ওদের পায়ের হাঁটু অবধি মোজা-পরা হয়ে গেছে—দৃশ্যগুলো যেন চোখের ওপর ভেসে উঠতে লাগল নাজিরের। উৎসাহে ও উঠে বসল বিছানায়। ওর গৃহবাসী মন পরবাসে যে কতখানি পীড়িত হচ্ছিল—এই একটু আগেও ও বুঝতে পারে নি। এখন বাড়ী যাবে—এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাকরার আনন্দ যেন ওকে পেয়ে বসল—ওকে আচ্ছন্ন করে দিল। বাড়ী ও যাবেই। কি

আর বলবে অঞ্জন? অঞ্জন তো তাকে কিছুই বলে না। কত আর ক্ষতি হবে একটা দিনে! নাজির নানা কথা দিয়ে ওর বাড়ী যাওয়ার মতলবটা সমর্থন করতে লাগল। ফিরে গিয়ে বলবে খোকনকে—'না যেয়ে পাল্লম না দাদু! দাদু কি আর মাথা কেটে নেবে? একটু হেসে হয়তো বলবে—'বেশ দাদু—বেশ তুমি।' তা বলুক। এতখানি এসে নাজির আর এটুকু না গিয়ে পারে না। কৌটা থেকে তামাক পাতা বার করে চুণ মিশিয়ে নাজির খৈনী তৈরী করতে লাগল।

"মণ্টুকে ট্রেণে একা ছেড়ে দিতে সাহস হোল না"—বলবে গিয়ে অঞ্জনকে—কিন্তু মণ্টু একাই যেতে পারে, মনে পড়ল—। তাহলে বলবে গিয়ে—'আমিনার জন্যে মনটা কেমন করছিল! হ্যাঁ সেই ভাল কথা। আমিনার কথাই বলবে অঞ্জনকে। বাড়ী যাওয়া ঠিক হয়ে গেল নাজিরের। মনটা ওর উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছে। ঘুম হবে না নাকি! ও উঠে বাইরের বারান্দায় এল। বেশ ফুরফুরে হাওয়া—বাগানের ফুলের গন্ধ—নিদ্রিতা নিশীথিনীর গভীর শ্বাস—এতো ভালো লাগছে নাজিরের!

এমনি রাতে ও বেরিয়ে যেতে ওর যৌবনের দিনে—সেই উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল দিনে, যখন ওকে ভাল আর মন্দর তফাৎ বোঝাবার জন্য অঞ্জন জন্মায় নি। ওকে ওর ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়ে সত্যিকার মানুষ হবার প্রেরণা কেউ জোগায় নি।—আজ ও কেমন বদলে গেছে—কত ভালো হয়ে গেছে আজ। আজ ওকে লোকে শুধু মুখের খাতিরই করে না—সারা অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করে—ভালোবাসে।

সেদিনও লোকে ওকে খাতির করতো, বরং বেশি খাতির করতো—যমের মতো ভয় করতো—কিন্তু ভালো কেউ বাসতো না। আজ ওকে সবাই ভালোবাসে। ঐ রাজকুমারী কেয়া—যার সঙ্গে একটি কথা কইবার জন্যে কত বড় বড় লোক মাথা ঠোকে—নাজিরকে সেই কেয়া কি যত্নই না করলো! কাছটিতে বসে ঠিক কাজলের মতই আব্দার করে

খাওয়ালো। নাজিরের এতো সব আত্মীয় রয়েছে পৃথিবীতে। আরো আছে, এই গ্রামেই আছে সেই একরত্তি বৌটি—নাজিরের মেয়ে। ওর সঙ্গে আর একবার দেখা করে যেতে হবে কাল। খুব ভোরে উঠেই যাবে ওর বাড়ী—না হলে ট্রেণ ধরা মুস্কিল হবে। নটায় ট্রেণ—নাজির ছটার আগেই উঠে পড়বে।

বারান্দা থেকে হাত বাড়িয়ে একটা ফুল তুললো নাজির—গন্ধরাজ ফুল। এবার ও এসে শোবে; রাত অনেকটা হয়েছে। হঠাৎ চীৎকার—মেরে ফেল্লে—চোর-চোর—ডাকাত—ও বাবাগো—ও মাগো… !

স্বরটা নারী-কণ্ঠের, এই বাড়ীর অন্তঃপুর থেকেই আসছে—সর্ব্বনাশ ! নাজির মুহূর্ত্তে ওর তেল চুকচুকে লাঠিখানা টেনে নিয়ে ছুটলো। সন্ধ্যা বেলা খেতে আসবার সময় পথটা ও চিনে গেছে—কিন্তু এদিকের দরজা বন্ধ; ছুটে নাজির পুকুরের পাড় ধরে মেয়েদের স্নান-ঘাটের দিকে গেল। অন্দর থেকে পুকুরের ঘাটে আসবার দরজাটা খোলা আর সেখানে লাঠি হাতে একটা ঝাঁকড়া চুল মুখোসপরা লোক পাহারা দিচ্ছে। নাজির গুঁড়ি মেরে একেবারে কাছাকাছি এসে লোকটার কাঁধে লাঠি বসিয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে মারলো প্রচণ্ড লাথি। লোকটা সামলাতে না পেরে টলছে—নাজির এক লাফে ভেতরে ঢুকে পড়ল। আর একটা দরজা পার হয়েই অন্দরের উঠান—সেখানে মশালের আলোকে দেখলো, চারজন লোক বোঁ বোঁ করে লাঠি ঘোরাচ্ছে। দোতলায় উঠবার সিঁড়ির উপর আরো একজন লোক লাঠি ঘোরাচ্ছে। দোতলার বারান্দায় দু'জন—একজন মায়া দেবীর চুলের মুঠি ধরে তাকে আছড়ে ফেলেছে—অন্য জন কেয়াকে ধরতে যাচ্ছে—কেয়া একটা বড় টেবিলের আড়ালে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে দাঁড়িয়ে। ওদিকে কেয়ার বাবাকে দু'জন আর কেয়ার ঠাকুরদাকে দু'জন হাতে ধরে লাঠি উঁচিয়ে বলছে—দাও, চাবি দাও।

মুহূর্ত্তে অবস্থাটা দেখে নিল নাজির—ওর চিরকালের অভ্যস্ত রক্ত,

চঞ্চল হয়ে উঠলো নিমেষে। ওর সেই যৌবন দিনের তাজা রক্ত—ওর সেই ডাকাত-সর্দ্দারের আসুরিক শক্তি আর অসীম সাহসিকতা জেগে উঠলো আজ আবার। উঠোনের মাঝখানে এক লাফে পড়ে নাজির তার হাতের লাঠি ঘুরিয়ে একজনকে এমন আঘাত করলো যে সেই অতর্কিত আক্রমণের বেগে লোকটা সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল। নাজির বললো—হুঁসিয়ার —খবরদার—মেয়েদের গায়ে হাত দিলে আর রক্ষে থাকবে না!—নাজির অন্য তিনজনকে আক্রমণ করলো। সিঁড়ির লোকটাও এসে যোগ দিল নাজিরের বিরুদ্ধে—ওরা চারজন, কিন্তু হাতে লাঠি থাকলে নাজির চারশো লোককে দেখে নিতে পারে। ওঃ, কী আশ্চর্য্য লাঠি! দোতলার বারান্দা থেকে বাকি ডাকাত ক'জন দেখলো—ব্যাপার সুবিধে লাগছে না। নাজির একবার বসে পড়ে লাঠি ঘোরাচ্ছে—আবার কোন মুহূর্ত্তে আকস্মিক লাফ দিয়ে প্রচণ্ড আঘাতে ওদের কারো হাতের কব্জি, না হয় মাথার খুলি ফাটিয়ে দিচ্ছে!—সাংঘাতিক খেলোয়াড়—ওস্তাদ্।— কেয়াকে যারা ধরবার চেষ্ট করছিল, তারা দু'জন ছুটে এসে যোগ দিল— কিন্তু নাজির যেন একাই একশো—ছ'জনের সঙ্গে নাজির একা অবহেলায় লড়ছে—আর মাঝে মাঝে চেঁচাচ্ছে 'হরবর হরবর।' কেয়ার ঠাকুরদাকে বুড়ো ভেবে অন্য ডাকাত দু'জন ওকে ছেড়ে নেমে এল দলের লোকদের সাহায্য করতে—বাড়ীর অন্যান্য চাকর ঝি সব ভয়ে চোখ বুজে দিয়েছিল —কিন্তু নাজিরকে অতখানি বিক্রমের সঙ্গে লড়তে দেখে লাঠিসোঁটা নিয়ে তারাও এগিয়ে এলো!—দুয়োর বন্ধ করে দে, বেরুতে দিস না শালাদের —বলে নাজির বন্‌বন্ করে লাঠি ঘুরিয়ে চললো—লাঠি হাতে থাকলে ওকে আঘাত করা প্রায় অসম্ভব। ডাকাতগুলো দেখলো, তাদের বেরিয়ে পালাবার পথও রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে; মরিয়া হয়ে ওরা নাজিরকে এবার আক্রমণ করলো। কিন্তু নাজির প্রস্তুতই ছিল—ওদের লাঠিকে ও অনায়াসে অগ্রাহ্য করে যাচ্ছে। বিপদ গুরুতর বুঝে দোতলার বাকি

লোক দু'জন কেয়ার বাবাকে ছেড়ে দিয়ে নীচে নেমে নাজিরের দিকে এগুলো। এতোগুলো লোকের সঙ্গে একা নাজির—রামভজনের দল—ভোজপুরী সব দারোয়ান—কোথায় গেল তারা সব! ঠাকুরদা ছাড়া পেয়েও চুপ করে ছিলেন, কিন্তু সব ডাকাত কটাই যখন দোতলা থেকে নেমে গেল তখন তিনি চট করে ঘরে ঢুকে বন্দুকটা বার করে দোতলা থেকেই ফায়ার করলেন। একজনের ডান হাত ভেদ করে গুলি চলে গেল। লোকটা কাতরে পড়ে গেল মাটিতে। আর একটা গুলি করলেন তিনি তৎক্ষণাৎ—গুলি কারো গায়ে না লাগলেও ভয়ে ডাকাত ক'জন এবার পালাবার চেষ্টা করছে। দরজার দিকে তিনজন চাকর পথ আগলেছে। নিরুপায় হয়ে ডাকাতরা নাজিরের দিকেই এগুলো; একসঙ্গে নয়টা লাঠি উঠলো ওর মাথার উপর। আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নাজির মাথা নামিয়ে নিল—আঘাত পড়লো ওর পিঠে আর বাঁ হাতের কনুইয়ে। কিন্তু নাজিরও তার লাঠিখানা ওদের একজনের পায়ের ফাঁকে ভরে দিয়ে আছড়ে ফেলে দিল তাকে। জড়িয়ে নিয়ে পড়ল লোকটা নাজিরকেও। এই অবসর—ডাকাতগুলো সেই গুলি লাগা লোকটাকে ছেচড়ে টানতে টানতে দরজার দিকে এগিয়ে চাকর তিনটাকে ঘা কতক করে দিয়ে সটান বেরিয়ে গেল। ইতিমধ্যে নাজির তার গায়ের উপর চেপে-পড়া লোকটার পেটে প্রচণ্ড লাথি মেরে তাকে তিন হাত তফাতে ফেলে দিল। লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেছে! নাজির উঠে বসলো—কিন্তু ওর বাঁ হাতের কনুইয়ের হাড় ভেঙ্গে গেছে—কোমরেও ভীষণ চোট—আর কপালের কাছে কেটে রক্ত ঝরছে।—রামভজনের দল এতক্ষণে এসে পৌছালো গোঁফে তা দিয়ে প্রকাণ্ড লাঠি হাতে।

মাত্র একটা লোক ধরা পড়েছে—বাকি সবাই পলাতক। নাজির অন্ধকারে জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে তাকালো সেই লোকটার দিকে। উপর থেকে টর্চ নিয়ে এসেছেন কেয়ার বাবা। রামভজনের দল কোথেকেছুটে

লণ্ঠন নিয়ে এল। মশালগুলো সবই ডাকাতরা নিয়ে চলে গেছে। টর্চের তীক্ষ্ণ আলোতে নাজির তাকিয়ে দেখলো ডাকাতটার মুখ—ক্ষীণ শব্দ করে উঠলো—উঃ!

কেয়া ছুটে নেমে আসছে—দাদু—দাদু—রক্তে যে বানভাসি হয়ে গেল তোমার!

নাজিরের পিছনে দাঁড়িয়ে মাথাটা কোলের মধ্যে টেনে নিল কেয়া; কপালের রক্তে ওর কাপড় ভিজে যাচ্ছে।—খুব লেগেছে দাদু? দাদু আমার।—কেয়া ঐখানেই বসে নাজিরকে দু'হাত বাড়িয়ে বেষ্টন করলো। ওর বাবা নেমে এলেন—ঠাকুরদা আস্তে নামছেন; রামভজনের দল চারদিক ঘিরে দাঁড়ালো—একজন সেই অজ্ঞান ডাকাতটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললো আষ্টে-পৃষ্টে।

নাজির কোনো কথা বলছে না এখনো। হয়তো ও অত্যন্ত পরিশ্রান্ত—হয়তে অনেক দিনের অনভ্যাসের জন্য ক্লান্ত—হয়তো ওর বয়সের আধিক্য ওকে এতখানি শক্তি ব্যয়ের জন্য অর্দ্ধমৃত করে দিয়েছে।—কেয়া বললো আবার—কথা বলো দাদু—কথা বলো—তুমি আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছ—তার থেকে বড়, মান বাঁচিয়েছ—দাদু!

আশ্চর্য্য স্নেহভরা কণ্ঠস্বর! নাজির আচ্ছন্ন, মোহগ্রস্থ হয়ে গেছে যেন। কথা ও আর কইবে কি? ওর ভাঙা হাতখানা কেয়ার কোলে, ওর রক্তাক্ত মাথাটা কেয়ার কাঁধে, ওর কাণের ভিতর দিয়ে মর্ম্মমূলে গিয়ে পৌছাচ্ছে কেয়ার ডাক—দাদু!

কেয়ার ঠাকুরদাও নেমে এসেছেন—নাজিরের আঘাতগুলো দেখলেন। নাজির হেসে বললো—ই কিচ্ছু না রাজাসাহেব—একদম কিচ্ছু না। আমি একদিন ডাকাতদলের সর্দ্দার ছিলাম—আমার ইয়েতে কিছু হয় না; দিদিরাণি।—কেয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালো নাজির—তোমাকে ওরা ছোঁয় নাই তো ভাই?

—না—দাদু—না, ছুঁতে পারে নি—কিন্তু তুমি যদি না আসতে··· কেয়া শিউরে উঠলো যেন। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে নাজিরের বামবাহু সযত্নে ধরে বললো—চলো, শোবে দাদু। বড্ড যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ দাদু? কেয়ার বাবা এসে ধরলেন ডান হাতখানা—কেয়ার ঠাকুরদাও আসছিলেন, কেয়া বললো—ডাক্তার আনতে পাঠাও দাদু তুমি—আমরা দাদুকে উপরে নিয়ে যাচ্ছি।

অতি সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে তুলে কেয়া তার সুসজ্জিত একটা ঘরের দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় নাজিরকে শুইয়ে দিল—যে বিছানায় শোয়া দূরে থাক—নাজির কখনো চোখে দেখেনি। তোয়ালে ভিজিয়ে কেয়া ওর কপালের রক্ত মুছে দিচ্ছে—ওর বাবা দাঁড়িয়ে দেখছেন। ঠাকুদার গলা শোনা যাচ্ছে নীচে—বেইমান ছাতুখোরের দল—তোদের সব্বাইকে থানায় চালান করবো। তোদের ষড় না থাকলে আমার বাড়ীতে ডাকাত পড়ে! এতবড় আস্পর্দ্ধা—এই ভজুয়া, ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয়—জলদি—আর তুই ভজন—যা, থানায় গিয়ে দারোগাকে আসতে বল এখুনি।

নাজির শুনতে পেল কথাগুলো। একটা ঢোক গিলে বললো—থানায় যেতে মানা করো দিদি—ঐ ডাকাতটাকে যেন বেঁধে রাখা হয়—থানায় সকালে খবর দিলেই হবেক।

কেয়া চট্ করে বাইরে বারান্দায় এসে বললো—দাদু থানায় খবর দিতে বারণ করছে। দাদু বলছে, সকালে খবর দিলেই হবে।

কেয়ার ঠাকুরদা বললেন—আচ্ছা। দাঁড়া এই—থাম্, থানায় পরে যাবি—ডাক্তার ডাক—জলদি ডেকে নিয়ে আয়।

বাড়ীশুদ্ধ প্রায় সবাই এর মধ্যে জেগে উঠেছে। কিন্তু কেউ নিজের নিজের বিছানা ছাড়ছে না—ভয়ে সব কাঠ হয়ে পড়ে আছে যে যার বিছানায়। এতবড় বিরাট বাড়ী—কত লোক বাস করে—কিন্তু কৈ

তারা সব ? কেয়ার ঠাকুরদা একটা গর্জ্জন ছেড়ে বললেন—সবুর কর হারামজাদারা—তিনি ধীরে ধীরে উঠে এলেন উপরে। নাজিরের কপালের রক্তে বালিশটা ভিজে যাচ্ছে। রক্ত বন্ধ হওয়া দরকার—কেয়া ভিজে তোয়ালে চেপে ধরেছে—তাই জলে মিশে রক্তটা আরো বেশি মনে হচ্ছে। ঠাকুরদা এসে বললেন—তোমার ঋণ শোধ করা যাবে না নাজির-ভাই, তুমি আমার কেয়ার সম্মান বাঁচিয়েছ।

নাজিরের দুটি চোখ স্নেহে কোমল হয়ে এল—অমলিন হাসি ওর মুখে, বললো—কেয়া কি একা তোমারই নাত্নী রাজা-বাহাদুর ? আমার নয় ?

নাজিরের কথার উত্তরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন এই পরম অভিজাত রাজা-বাহাদুর। কেয়া দু'হাত দিয়ে নাজিরের মাথাটা জড়িয়ে বললো—আজ থেকে আমি আগে তোমার নাতনী দাদু—তারপর আর কারো। নাজির ডান হাতখানা বাড়িয়ে ওর চিবুক ছুঁলো। তৃপ্তিতে সর্ব্ব দেহ-মন ওর পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে, আনন্দে ওর বুকের শ্বাস দ্রুততর হয়ে আসছে। ও অনুভব করছে—মানুষ সর্ব্বত্রই মানুষ,—সেখানে হিন্দু নাই—মুসলমান নাই—বৌদ্ধ-খৃষ্টান কিছু নাই—। মানুষের তৈরী কোনো বাধার বালাই নাই সেখানে। সেখানে হৃদয়ে-হৃদয়ে চলে কোলাকুলি—মনে-মনে হয় মিতালী, অন্তরের অন্তঃস্তলে গ্রথিত হয়ে যায় মায়ার বন্ধন।

পিপাসা পেয়েছে হয়তো—কেয়া উঠে পাথরের গ্লাসে লেমন স্কোয়াস তৈরী করে দিল—খাও দাদু—গরম দুধ একটু যদি—এই চট্‌করে গাই দুইয়ে আনতে বল—যা—কেয়া আদেশ করলো একটা ঝি-কে।

—হরলিক্‌স্ নাই রে—কিম্বা গ্লাক্সো ! —ওর বাবা বললেন।

—আছে—মনে ছিল না বাবা।

—না দিদি—তুই জলই দে একটু, সাদা জল—নাজির বললো। ওর প্যায়ের কাছে এসে বসলেন কেয়ার বাবা—ঠাকুরদা বসলেন কাছেই

একখানা চেয়ারে। ওর ভাঙা হাতখানার হাড় বেরিয়ে পড়েছে—ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে যায়গাটা!

—ডাক্তার চাইনা, আমাকে একটা মুরগীর ডিম—খানিকটে হাড়-জোড়া লতা আর এক টুকরো কাঁচা হলুদ যোগাড় করে একসঙ্গে বেঁটে গরম করে দ্যান—এমন হাড় কতবার ভেঙেছে আমার।

ব্যাপারটা যেন কিছুই হয় নি—নাজির এমনি অগ্রাহ্য করে বললো কথাটা। কিন্তু এরা তা পারে না; এরা ঐ পরম উপকারী বন্ধুকে ঐ রকম টোটকা ওষুদ দিয়ে রাখতে পারে না। এর জন্যে দশ-বিশ হাজার টাকা খরচ করা এদের কাছে তুচ্ছ এখন। ঠাকুরদা বললেন—ডাক্তার আসুক—দেখি আগে।

এর মধ্যে বাড়ীর সবাই জেনেছে—ডাকাতরা পালিয়ে গেছে আর একজন মাত্র ধরা পড়েছে। কাজেই আস্তে আস্তে সব আসছে দেখতে ব্যাপারটা, কিন্তু একলা আসছে না—যদি কোথাও কোনো কোণে ডাকাত লুকিয়ে থাকে, এই ওদের ভয়। অতি সাবধানে সব আসছে। মণ্টু বাইরের ঘরে ছিল—ওর ঘুম যখন ভাঙলো তখন চারিদিকে আলো জ্বলে উঠেছে; ওর বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে কিংশুক ডাকছে চাপাগলায়, —ও মশাই—শুনছেন—উঠুন শিগগীর—ডাকাত পড়েছে বাড়ীতে।

মণ্টু একলাফে উঠে পড়ল—কি? ডাকাত—কোথা?

—ঐ যে গোলমাল শুনছেন না—ঐ শুনুন! কি করা যায় বলুন তো?

মণ্ট কাণ পেতে শুনলো—ডাকাতের কোন আওয়াজ নাই, তবে গোলমাল একটা হচ্ছে বটে। মণ্টু সাহসী—ও বারান্দায় বেরিয়ে এল।

—যাবেন না—যাবেন না—যাবেন না মশাই! আচ্ছা তো আপনি!

—কোথায় ডাকাত! অসুখ-বিসুখ হবে কারো—দাদু, ও দাদু? মণ্টু ডাক দিল। দাদু ঐ ঘরের নীচে-তলায় শুয়েছিল—মণ্টু জানে। কিন্তু দাদুর সাড়া নাই কেন? দাদু যখন এখানে আছে—ডাকাত কি

করতে পারে ? দুঃসাহসী মণ্টু তড়বড় করে নামছে সিঁড়ি দিয়ে—কিংশুক অত্যন্ত বিরক্তির সুরে বললো—আশ্চর্য্য ! যাচ্ছেন আপনি ? যেমন দাদা তেমনি তো ভাই হবে !

মণ্টু যেন ওর কথা শুনতেই পেল না—নীচে গিয়ে দেখলো—দাদুর বিছানা খালি। একটা চাকর লণ্ঠন নিয়ে অন্দরের দিকে যাচ্ছিল—মণ্টু ছুটে গিয়ে তার সঙ্গ ধরলো—বললো—কি হয়েছে ?

—ডাকাত—ওরে বাপরে ! ইয়া গোঁফ—মুখে আবার মুখোস—ওঃ !

—লোকটা হাঁফাচ্ছে, আর বলছে। মণ্টু যেতে যেতে শুধুলো—আছে না পালিয়েছে ?

—কে জানে বাবু ? কে জানে ! আজ বারো বছর চাকরী করছি বাবু এই বাড়ীতে, ডাকাত কখনো পড়ে নাই বাবু ! ও—ওঃ !

—তোমাকে দু'এক ঘা মেরেছে নাকি হে ? অত হাঁফাচ্ছো কেন ? মণ্টু ওর কম্পিত হাত থেকে লণ্ঠনটা কেড়ে নিয়ে এগিয়ে চলতে লাগল। অন্দরে ঢোকবার দরজাগুলো খোলা হয়ে গেছে। ঝি-চাকর সব এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে কাঁপছে আর চুপেচুপে কথা বলছে—পাছে ডাকাতরা শুনে ফেলে ! মণ্টু দ্রুত চলে এল মেয়েদের অন্দরে। চৌমহলা বাড়ীর উঠোনে হাত পা বাঁধা ডাকাতটা পড়ে আছে। ভজন সিং পাহারা দিচ্ছে তাকে। মণ্টু দেখেই চেঁচিয়ে উঠলো—দাদু কৈ ? দাদু ? আমার নাজির দাদু আসে নি ? কেয়া ওর গলা শুনে দোতলার বারান্দায় বেরিয়ে এসে বললো—এস ভাই মণ্টু ! উঠে এসো—দাদু এইখানে রয়েছে।

তিন লাফে মণ্টু উপরে উঠে দেখলো গিয়ে, হাত-ভাঙ্গা দাদু প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে চেয়ে রয়েছে ; কপালের রক্তে বালিশ ভেসে যাচ্ছে।—দাদু, দাদু—এ কি করলে দাদু—দাদাকে আমি কি বলবো—মণ্টু ওর বুকের উপর পড়ল এসে। নাজির মাথাটা টেনে তুলে বললো—কিছু হয় নাই ভাই, কিছুই এমন হয় নাই। তিনদিনে সেরে যাবেক। ওঠো—ভয় কি

কেয়া এসে মণ্টুকে তুললো—ডাক্তার আসছে! ওঠো, আমাদের দাদু একাই বারোটা ডাকাতকে ভাগিয়েছে—তুমি ঘুমিয়ে ছিলে মণ্টু!

হাঁ—সজল চোখে মণ্টু মাথা তুললো। নাজিরের বুকের পাকা লোমগুলোতে ওর চোখের জল লেগেছে! কে বলে নাজিরের কেউ নাই! নাজিরের চেয়ে ভাগ্যবান কে আছে এই পৃথিবীতে! কার এত আছে আত্মীয়, এত স্নেহ-মমতাভরা রোগশয্যা? আনন্দে নাজির চোখ বুজে অনুভব করছে ওর আজকার আত্মপ্রসাদ—ওর অগামী দিনের আনন্দময় আত্মীয়-পরিজন। ডাকাত নাজির, চৌদ্দ দফা জেলখাটা নাজির আজ মানুষের মনে পরমাত্মীয় হয়ে উঠেছে—কার এমন ভাগ্য হয়! কিন্তু এই ভাগ্যের মূলে আছে একটি মাত্র লোক—সে অঞ্জন—যার গভীর স্নেহ-ভালবাসা নাজিরকে দস্যুতা ভুলিয়েছে। যার 'দাদু' ডাক শোনবার জন্যে নাজির আজ মানুষ হয়ে উঠেছে!—আল্লাতালা, আমার খোকন যেন ভালো থাকে—তুমি ওকে দেখো খোদা—! নাজির অকস্মাৎ কপালে তুলতে গেল—ব্যথায় টন্ টন্ করে উঠলো হাতখানা!

ডাক্তার এলেন। ক্ষত পরীক্ষা করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধলেন—ঔষধ দিলেন। নাজির চুপটি করে পড়ে রইলো কেয়ার কোলের অভয় আশ্রয়ে, যেন শিশুটি! কোনকালে ও ডাক্তারী ওষুদ ব্যবহার করে নি—ঘৃণা করে নাজির ঐ সব যাচ্ছেতাই দিয়ে তৈরী ওষুদকে—আজ কিন্তু তার এখন মুষ্টিযোগের কথা মনেও পড়ছে না। একটু ঘুমুবে ও—চোখ বুজলো।

এদিকে সহরবাসী কিংশুক ভয়ে প্রায় বিবর্ণ হয়ে উঠেছে—তবু সাহসের খানিকটা অবলম্বন ছিল মণ্টু—কিন্তু সেও যখন চলে গেল, তখন এই খাঁ'র বাড়ীর দোতলায় জনমানব-শূন্য অন্ধকারে ওর মনে হতে লাগল—আজ আর রক্ষা নাই। পল্লীগ্রামে সাপ, মশা, মাছি—এই ওর জানা ছিল এবং তার জন্যে খানিকটা তৈরীও ছিল—কিন্তু ডাকাত! ডাকাত যে পড়তে পারে, এমন সম্ভাবনা ও কল্পনাও করে নি। খবরের কাগজে

পড়া ডাকাতদের যন্ত্রণা দেওয়ার কথা মনে পড়ছে ওর। মানুষকে উলঙ্গ করে নাকি ওরা মশালের আগুনে পুড়িয়ে মারে! নাকে লঙ্কার ধোঁয়া দিয়ে নাকি···কিংশুক শিউরে উঠলো। ভগবানকে ও কখনো ডাকে নি, বিশ্বাসই করে না—তবু আজ মনে মনে বললো—আজকার রাতটা যদি ও বেঁচে যায় এই ডাকাতদের হাত থেকে, তাহলে না হয় ভগবানকে মানবে এবার থেকে, হ্যাঁ, নিশ্চয় মানবে। ওর এই প্রতিশ্রুতি শুনে ভগবান কৃতার্থ হলেন কি না বোঝা গেল না—ওর ডর কিন্তু ক্রমশঃ বাড়ছে। কারণ বাইরের দিকে যে-যেখানে ছিল, সবাই অন্দরে চলে গেছে। কি এখন করবে ও?

সুটকেশের মধ্যে টর্চ আছে—কিন্তু জ্বালতে ওর ভয় করছে। যদি আলো দেখে এই ঘরেই এসে ঢোকে ডাকাত? না—তার চেয়ে ঘুপ্‌টি মেরে এক কোণে পড়ে থাকাই ভালো। যদি এ ঘরেও আসে ডাকাত—বাড়ীতে যখন ঢুকেছে তখন সব ঘরেই আসবে—যা আছে নিক কিংশুকের, তার প্রাণটুকুকে যেন ছেড়ে দিয়ে যায়। টাকার অভাব ওর নাই; দশ বিশ হাজার গেলে কিছুই ক্ষতি হবে না এমন।

কেয়ার মুখখানা মনে পড়ল কিংশুকের। সুন্দরী কেয়া—পুষ্পপেলব অঙ্গে হয়তো তার আগুনের ছ্যাঁকা দিচ্ছে ডাকাতরা—হয়তো—হয়তো গলা টিপে মেরেই ফেলল। কি করবে কিংশুক? কিছুই তো তার করবার নাই। অতগুলো ডাকাতকে কি করে বাধা দেবে কিংশুক? কেয়ার কপালে যা আছে হোক—কিংশুক এখন ও নিয়ে মাথা ঘামাবে না—ঘামিয়ে লাভ কিছু নাই। মণ্টু হতভাগাকে বারণ করলো কিংশুক, শুনলো না—যাক্‌গে! আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

কোথায় এখন লুকুবে কিংশুক—তাই ভাবতে লাগলো। ঘরটায় কোথায় কি আছে, ভালো করে দেখা হয় নি। অন্ধকারে দেখাও এখন সম্ভব নয়। কিংশুক পা টিপে টিপে পায়খানার কাছ দিকে এগিয়ে

এল। এই যায়গাটা ও একবার দেখে গিয়েছিল। একখানা বড় আলমারী ঐখানে দাঁড় করানো আছে। আলমারীটা ভাঙা—তাই হয়তো ঘর থেকে বার করে ঐখানে ফেলে রাখা হয়েছে। কিংশুক হাতড়ে সোটা খুঁজে নিয়ে তারই পিছনে দাঁড়ালো। মাকড়সার জাল আর মশার কামড় এখন ওর কাছে কিছুমাত্র আপত্তিজনক নয়। লুকোবার একটা ভালো মত যায়গা পেয়ে ও যেন বেঁচে গেল!

দশ পনর মিনিট দাঁড়িয়ে থেকেও কোন রকম কান্নাকাটির শব্দ যখন পেল না, তখন ওর সাহস খানিকটা ফিরে এসেছে। হয়তো ডাকাতরা চলে গেছে, কিম্বা হয়তো, ডাকাতই নয়—অন্য কিছু। বেরুবার জন্য মাথাটা উঁকি দিয়ে বার করতেই দেখলো, কা'রা যেন আসছে! হাতে উজ্জ্বল পেট্রোম্যাক্স আলো—ওরে বাবা!

কিংশুক আর সন্দেহ মাত্র না করে ঐখানেই, ঐ আলমারীর আড়ালেই ঘুপ্‌টি মেরে বসে পড়লো। হ্যাঁ—এই দিকেই আসছে। ওরা নিশ্চয় ডাকাত। ভগবান—শেষকালে এই বিদেশে বেঘোরে প্রাণটা যায়। ওরা সত্যি উঠে এল উপরে—কিংশুক আলোর ছটা দেখেছে—কথাও শুনতে পাচ্ছে। ওর শোবার যায়গায় ওকে না দেখে ওরা বলাবলি করতে—গেল কোথায় তাহলে?

—পালিয়েছে নিশ্চয়!

—পালাবে কোথায়? এইখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে।

—হতে পারে? কোলকাতার লোক—ভীতুর একশেষ।

প্রথম দিকে কথাগুলো ডাকাতের মত মনে হচ্ছিল, কিন্তু শেষের দিকে যেন ভদ্রলোক মনে হচ্ছে। কা'রা ওরা? কিংশুক উঁকি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলো।

—তখুনি ভয়ে আধ মরা হয়ে কাঁপছিলেন—পালিয়ে গেছেন ঠিক!

কার গলা? ঝণ্টুর নাকি? মাথাটা আর একটু বার করলো

কিংশুক—হ্যাঁ মণ্টুই !

—ঐ যে, ঐ যে কার মাথা—ঐ আলমারীর পেছনে—আসুন দেখি।

—দাঁড়াও মণ্টু। ডাকাতদের কেউ হতেও পারে !—কেয়া সাবধান করলো।

—না-না, ডাকাত না আর কিছু ! দাদুর লাঠির কাছে ডাকাত কোথায় ভেগেছে তার ঠিক নাই। দাদুকে জানেন না তো আপনি—দাদু ছিল দেড় হাজার ডাকাতের সর্দার। ওকে সব ডাকাতরাই চেনে—আসুন। ও মশাই, ও কিংশুক বাবু ! মণ্টু ডাক দিল। ভয় আর নেই কিংশুকের, কিন্তু বেরুবে কি করে—এ যে কেয়ার সামনে তাকে বেরুতে হচ্ছে। এই অভদ্র নোংরা বেশে কিংশুক কেয়ার মত আকাঙ্ক্ষিতা মেয়ের সামনে বেরিয়ে আসবে ! ধিক ধিক ! এর থেকে ডাকাতের হাতে মরা ভালো ছিল যে। হায় ! কিংশুকের এত সাধের বেশবাসের সমাপ্তি ঘটল শেষে এমনি করে !

—আসুন বাইরে, ভয় নাই—মণ্টুর পুনরায় আহ্বান। আর না বেরিয়ে উপায় নাই ! কিংশুক আস্তে বেরিয়ে এল। পুরোনো কালিঝুল, মাকড়সার জাল আর মশার কামড়ে চমৎকার মূর্ত্তি খুলেছে ওর। দেড়শ' বাতির পেট্রোম্যাক্সের উজ্জ্বল আলোতে সে মূর্ত্তি যে-কোনো গম্ভীর প্রকৃতি লোককে হাসাতে পারে ! বালক মণ্টু কিংশুকের প্রেমিক হৃদয়ের কথা অবগত নয় ; উচ্ছ্বসিত উচ্চ হাস্যে বাড়ীটাকে ফাটিয়ে ফেলবার উপক্রম করলো,—ওরে বাবা এ কি হইছেন মশাই—হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা…হি ; হি ; হি ! দারোয়ানটা আলো ধরে আছে ; কেয়া অত জোরে না হাসলেও হাসি চাপতে পারছে না—বললো ডাকাতরা চলে গেছে—আসুন।

—জল খাবেন—জল—এই এক বালতি জল নিয়ে আয়—মণ্টু আবার হাসছে !

—থাক ভাই! উনি ভীতু মানুষ; অত কি ঠাট্টা! যান, স্নান করুন গিয়ে।

হায় ভগবান, হায়—ভগবান, হায় হায় ভগবান! তুমি নাই, নাই, নাই। ডাকাতের হাত থেকে কিংশুককে তুমি বাঁচিয়েছ, কিন্তু এ বাঁচানোর সার্থকতা রইল কৈ! রূপসম্রাজ্ঞী কেয়া দেবীর কাছে কিংশুককে যে ভীরুর অগ্রগণ্য প্রমাণিত হ'তে হোল! পুরুষের পৌরুষ আর সাহস দেখেই নারী করে আত্মসমর্পণ—সেই নারীর চোখের সুমুখে—সেই আকাঙ্ক্ষিতা রূপসীর সুমুখে কিংশুককে ভীরু অপবাদ বরণ করে নিতে হচ্ছে। এর চেয়ে ডাকাতের হাতে মৃত্যু যে অনেক ভাল ছিল ঈশ্বর!

নত মস্তকে কিংশুক এগুচ্ছে আর ভাবছে;—ডাকাতগুলো কি দুদিন আগে বা দুদিন পরে এলে পারতো না! তার বরাতটাই খারাপ, না হলে...! মণ্টুর হাসি কিছুতেই থামছে না—দেখুন, দেখুন, পিঠে কত বড় মাকড়সা একটা!

—ওরে বাপ!—কিংশুক লাফিয়ে উঠলো! ইঞ্চি তিনেক বড় একটা মাকড়সা! কেয়া গাম্ভীর্য্য রাখবার প্রচুর চেষ্টা করেও আর পারলো না। ওর বালিকা-সুলভ চাঞ্চল্য ওকে হাসিয়ে দিল। অতিথির সম্যক সম্মান বজায় রাখা কঠিন হচ্ছে ওর পক্ষে। অতি কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করে বললো—শহুরে লোকরা ভীতু হলে দোষ নাই; তুমি ভাই মণ্টু একটু হাসি থামাও—উনি কি আর মাকড়সা দেখেছেন কখনো—থামো! যান আপনি স্নান করে আসুন—এই, নিয়ে যা।

কিংশুকের এতো রাগ হচ্ছে মণ্টুর উপর! নখে ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে! ঘাড় গুঁজে ও চলে গেলো স্নান করতে। কেয়া যাচ্ছে মন্দিরের ওদিকে—সেখানে কিছু ঘটেছে কি না দেখতে। মণ্টু তিন লাফে ওর আঁচলটা ধরে বলল—শুনুন দিদি—শুনুন—হেসে ভেঙে পড়ছে ও। কেয়া ওকে পাশে ফিরে বলল—চুপ! চুপ! হাসে না অমন করে!

৫

কতক্ষণ যে কাজল নিশ্চুপ বসে আছে ঠিক নাই। ঘণ্টা দুই অন্ততঃ কেটে গেছে। অঞ্জন সেই কোন্ সকালে দুটো খেয়ে বেরিয়ে গেছে, এখনো এলো না। কাটিম ঘুমুচ্ছে, জেগে থাকলে ওর দুরন্তপনায় কাজলের কেটে যায় এক রকম করে, কিন্তু কাটিম ঘুমিয়ে থাকলে কাজল একেবারে নিরবলম্ব! এর আগে ঘরের এটা সেটা করে—কিছু না থাকলে ছেঁড়া কাপড়ের পাড় সেলাই করে দিব্যি সময় কাটাতো; কিন্তু এই কিছুদিন যেন কি হয়েছে ওর। কাজ করতে বিরক্তি বোধ হয়। নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া করতে চায় না কিছু ওর মন এখন।

ইংরেজী শিখবার ইচ্ছেটা দিনকতক ওকে পেয়ে বসেছিল—শিখেও ফেলেছে খানিকটা—বুদ্ধি ওর যথেষ্ট সাহায্য করে, কিন্তু সময় ওর একান্ত কম মনে হয়! মনে হয়—এমন করে শিখতে গেলে সারা জীবনেও ও কিছু শিখতে পারবে না। অথচ কত যে সময় ও চুপচাপ বসে থেকে খরচ করে দিচ্ছে, তার হিসাব নেই। কাজ তো ওর এখানে কিছু নাই বললেই হয়, তবু কাজল সময় পায় না?

কি যেন ও ভাবে—কি যেন স্বপ্ন দেখে, কিছু যেন আশায় প্রত্যাশায় ও অপেক্ষা করে—কিছু রোমাঞ্চকর ব্যাপার, কোনো একটা অলীক অবাস্তব সম্ভাবনা! আশ্চর্য্য! কাজল তো ছিল না এমন! কেন ওর এই পরিবর্ত্তন—নিজেই বুঝতে পারে না। বহুদিন ও ভেবেছে—সময় আর ও নষ্ট করবে না—তাড়াতাড়ি ইংরেজিটা শিখে নেবে। আবার ভেবেছে—কি হবে শিখে? কি কাজেই বা লাগবে তার?—কত সময় ভেবেছে, তার স্বামীর কাজে নিজেকে লাগাতে পারবে—তৎক্ষণাৎ মনে হয়েছে—স্বামীর কাজেই তো সে লেগে

রয়েছে। স্বামীর দেহ-মন-প্রাণকে সুস্থ সবল—কার্য্যক্ষম রাখা, স্বামীর দুঃখে-দুঃখী হওয়া—এ সব তো করছেই কাজল! এর পর আবার কি সে করবে! হাই হিল্ জুতো পায়ে টকটক্ করে স্বামীর হাত ধরে বেড়াতে গেলেই নাকি স্বামী-সেবা হয়—যত সব বাজে! কাজল ঠোঁট দিয়ে একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করে। কিন্তু আবার মনে হয়—আজকালকার মেয়েরা ঐ রকমই করছে তো—সেই-বা কেন করবে না? না করলে স্বামী হয়তো ক্ষুণ্ণ হতে পারে। নাঃ, ক্ষুণ্ণ ওর স্বামী হবে না কোন কালে! কাজলকে স্বামী এতো বেশী ভালোবাসে যে কাজলের যে-কোন দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করবে অঞ্জন। কিন্তু কাজলেরও তো একটা কর্ত্তব্য আছে! এই তো সেদিন কাজল গিয়েছিল স্বামীর সঙ্গেই কুরুক্ষেত্র দেখতে। ট্রেণে একটি বৌ—বয়স কাজলের থেকে বেশিই হবে দু'এক বছর—কেমন সব্বার আড়ালে স্বামীর হাতটি ধবে বসে রইল। সবাই দেখছে, ও গ্রাহ্যই করলো না। কেমন কৌশলে ডিবে থেকে পান তুলে খাইয়ে দিল স্বামীকে। মাথার ঘোমটা তো নাই-ই—বেশ লাগছিল ওকে! দু' বছর আগে এ রকম দেখলে কাজল শিউরে উঠতো, বল্‌তো, বেহায়া! এখন যেন ওর মনে হচ্ছে—ঐটাই স্বাভাবিক। অথচ সে নিজে অঞ্জনের কতখানি তফাতে বসেছিল। কত সঙ্কোচে কথা বলছিল স্বামীর সঙ্গে। কেন? কিসের জন্য? কাজল কি ওদের মত নয়—না ওদের মত রূপগুণ নেই তার!

— কাজল একটা নিশ্বাস ফেললো! দু' তিনদিন থেকে ও অঞ্জনকে বলছে—ও ঐ কাছের পাহাড় আর বন দেখতে যাবে—কিন্তু অঞ্জনের সময়ই হয়ে উঠছে না। আজ এতদিন কাজল এসেছে এখানে, অথচ এদিকে ঐ নদীধার আর ওদিকে ঐ মন্দির পর্য্যন্ত ওর দেখা হয়েছে। যাবে কার সঙ্গে! ঝি-চাকর নিয়ে আর বেড়াতে যাওয়া

হয় ? মণ্টুকে নিয়ে একদিন নদীটায় নেমেছিল খানিক—কিন্তুক মণ্টু ছেলেমানুষ—ওপারে যেতে সাহস পেল না। পাহাড়ে তো উঠতেই পারে না। শোবার ঘর থেকে কাজল রোজ—সকাল বিকাল সময় পেলেই দেখে ঐ পাহাড়, নদী, বন—তার ওপাশে আকাশ—আকাশে পাতলা সাদা মেঘ। কত যেন রহস্য লুকিয়ে আছে ঐ দিকে, ঐ পাহাড়ের নীল ভাঁজে, ঐ বনের শ্যামল তনুদেহে—ঐ আকাশের মেঘের সাদা চুলের আস্তরে! কাজলের কত কি যে মনে হয়—মনে হয়, ও কেন পাখী হয়ে জন্মায় নি ? তাহলে ঐ চিলটা যেমন আকাশে ভেসে যাচ্ছে—অমনি বাধাহীন, বন্ধুহীন হয়ে চলে যেতে পারতো ঐ রহস্যময় দেশে—ঐ বনের অভ্যন্তরে, পাহাড়ের চূড়ায়—মেঘের মাঝখানে। কেন সে ঐ পাহাড়ের একটা চূড়া হয়ে জন্মায় নি—তাহলে অনাদি থেকে অনন্তকাল বসে দেখতে পারতো ঐ রহস্য-গম্ভীর সৌন্দর্য্য ; কেন যে সে ঐ বনের একটা তা হয়ে জন্মায় নি—সেখানে থেকে সে নিশ্চিন্ত আনন্দে নাচতে পারতো হাওয়ার দোলায়—বৃষ্টির ফোঁটায় আর পাখীর কূজনে!—কিন্তু কাজল আত্মসম্বরণ করে। এ সব কবিকল্পনা বেশিক্ষণ ওকে ধরে রাখতে পারে না। পাখী বা পাহাড়ের চূড়া বা বনের লতা হলে ও যে এই রকম করে ভাবতে পারতো না—তা ওর জানা হয়ে গেছে। কাজেই ঐ আশ্চর্য্য রহস্যময় স্থানগুলি দেখবার পিপাসাই নাড়া দেয় ওর মনকে! জানে—দেখতে গিয়ে হয়তো নিরাশ হবে, হয়তো ওর কল্পনার সঙ্গে কোথাও মিলবে না ঐ স্থান—তবু দেখতে সাধ হয়, আর সাধ হয় অঞ্জনের সঙ্গে যাবার। কিন্তু অঞ্জন যদি একটুখানিও সময় করে উঠতে পারে! ছিঃ! কাজল যেন মানুষ নয়—কাজল যেন খালি ওর ঘরদোর সামলাতেই জন্মেছে! আর ঐ দস্যি ছেলেকে সামলাতে!

আসে না কেন এখনো। কোথায় যে যায়—কি যে করে—কাজল

বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করলো। কাটিমের দিকে চেয়ে দেখলো—ঘুমুচ্ছে। যত দস্যিপনা তত ঘুম। পুষিয়ে নিতে হবে তো! মণ্টু থাকাতে কাজল নিশ্চিন্ত ছিল—ও বুঝতো আপনার ভাইপোকে। এখন আবার কাজলকেই দেখতে হবে—কোথায় আছাড় খায়, না হয়, হাত পা ভাঙে ঠিক কি!

ঘুমুক একটু; কাজল চুলটা বেঁধে নেবে। কিন্তু এমনি শয়তান ছেলে যে কাজল ঠিক ফিতে কাঁটা নিয়ে বসলেই ও উঠে পড়বে! ঘুমের ঘোরেই ও যেন জানতে পারে। কাজলকে জব্দ করবার কত ফন্দিই যে জানে ঐটুকু ছেলে!

কাজল বসলো চুল বাঁধতে। সাজ-সজ্জার দিকে ইদানিং একটু নজর পড়েছে ওর। আগে কেউ বেঁধে না দিলে চুল ওর অমনি থাকতো এলোখোঁপা বাঁধা। সাবান ও মাখতেই জানতো না; এখন স্নানের সময় তো মাখেই—তা'ছাড়া রান্নার পর—বিকালে আর রাত্রে শোবার সময় ও হাত-পা-মুখে সাবান ঘসে। এগুলো ও শিখেছে হালে, মাসকতক হোল মাত্র—সেই যখন ওর ঘরে অতিথি এসেছিল—সুজাতা দেবীরা—বেশ কেটে ছিল কাজলের সেই দিনক'টা! আবার ওরা আসে না কেন? এলে ভালো হয়। একলা এমন করে আর পেরে উঠছে না কাজল এখানে থাকতে। কিন্তু আসবে কি করে? ওদের বিপদ হয়ে গেছে। লেখা নাকি কোথায় চলে গেছে, কিম্বা মরেই গেছে। কে জানে? চলেই গেছে হয়তো কারো সঙ্গে? যা একখান মেয়ে! মদ, সিগারেট—কী না খেতো সে, আর কিইবা না করতো? সুজাতা তার চেয়ে হাজারগুণে ভালো মেয়ে। সিগারেট খায়—তা হোক—ও সব আজকাল সবাই খায়। সুজাতার কাছে অনেকগুলো বিষয় শিখে নিয়েছে কাজল। আবার যদি সে আসে তো আরো কিছু শিখতে পারে।—কাজল বেণীটার গোড়ায় ফিতের গেরো দিয়ে ফিতেটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরলো। পদ্ম কোরকের মতন গায়ের উপর কালো ফিতেটা চাপ দিচ্ছে—নীলাভ আকাশে

ছায়াপথ যেন—না—শ্যামল প্রান্তর বেয়ে যেন কালো জলভরা নদী একটি—চমৎকার দেখাচ্ছে। আয়নায় দেখছে কাজল—অঞ্জন বাড়ী ঢুকলো। মাথার ঘোমটা টানা কাজলের নিয়ম—কোনদিন এর ব্যতিক্রম হয়নি—আজ হোল—নীরবে চুল বাঁধতে লাগলো কাজল, অবশ্য যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি। অঞ্জন ঘরে ঢুকে হাতের ঠোঙাটা টিপয়ের উপর রেখে খাটে বসলো—কাটিম যে খাটের একধারে ঘুমুচ্ছে। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে ফিরেছে অঞ্জন। কিন্তু কাজল ওর মুখপানে এখনো তাকায় নি; চুল বাঁধছে। অঞ্জন পিঠের তলায় বালিশটা টেনে নিয়ে আধ-শোয়া হয়ে বিশ্রাম করলো একটুখানি, মিনিট দুই—কাজলের দিকেই চেয়ে আছে, কিন্তু কাজল চুল বাঁধায় নিবিষ্ট। চমৎকার দেখাচ্ছে কাজলকে। এমন উন্মুক্ত অবস্থায় অঞ্জন ওকে দেখেনি কোন দিন। ওর নিটোল গালের উপর গুচ্ছ-গুচ্ছ চুল—ঘাড়ের পেছনে সূক্ষ্ম রোমাবলী—পুঁটিমাছের কাঁটার মতন সোজা সীথিতে সিঁদুরের সরু রেখা—বেশ লাগছে অঞ্জনের!

কাজল উঠে গেল ও-ঘরে—গা হাত মুছতে বোধ হয়। কোন কাজ হাতের কাছে না থাকায় অঞ্জন কাটিমকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে দিল—

—ওঠ নারে শয়তান, ওঠ!

—কী করছো? কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়ো না—কাঁদবে! কাজল শাসাল ও-ঘর থেকে!

—রাতে কিন্তু ঘুমুতে চাইবে না—সেদিকে খেয়াল আছে?

—তা হোক; সে আমি বুঝবো—বলে কাজল এঘরেই এলো। অঞ্জন আর কিছু বল্লে না কাটিমকে। ঘুমটা কাটিমের ভাঙোভাঙো হয়েও ভাঙছে না; কাজল এসে দেখলো—তারপর তাকালো অঞ্জনের দিকে—রোদে লাল হয়ে উঠেছে মুখখানা!

—ওম্মা! কোথায় কোথায় ঘুরেছ—হাতের ভিজে তোয়ালেটা কাজল চেপে ধরলো অঞ্জনের কপালে। কাজলের গায়ের স্নিগ্ধ গন্ধ

লেগে রয়েছে গামছায়—অঞ্জন নিশ্চুপে উপভোগ করছে। কাজল ওর ঘাড়-পিঠ-গলায় গামছাটা বুলুতে বু[illegible]—এমনি করে রোদে ঘুরেছ তুমি ? কেমন চেহারা হয়েছে দেখবে একবার আয়নায়।

হাসলো অঞ্জন মিষ্টি। বললো—আমার চোখে আমায় দেখিনে কাজল তোমার চোখেই নিজেকে দেখা আমার অভ্যাস।

—থামো, হয়েছে!—অঞ্জনের মাথাটা কোলে নিয়ে কাজল মিনিট-খানেক চুপ করে রইল, তারপর বলল—মা'কে কাল লিখছি আমি, তুমি কি রকম শরীর নষ্ট করছো!—

—আজ একটু বেশী কাজ ছিল রে!

—কোন্ দিন কম থাকে। কেউ যেন কোথাও নেই ওর তাই এমনি করে যা-ইচ্ছে করবেন!

রাগে কাজলের চোখের জল আসছে! রাগটা চেপে বললো—ওঠো, কাপড় ছাড়ো দেখি—ও—ঠো! ওঠো বলছি! চলো, হাতমুখ ধোও!

—চল্ যাই। কিন্তু তোর কাটিম উঠে যাবে না ?

—যাবে তো কি হবে। চলো তুমি! ওঠে তো না হয় কাঁদবে একটুকুন!

কাজলের কাপড় ছাড়া হয়নি তখনও। ওঘরে গা মুছে এ ঘরে কাপড় বার করতে এসেছিল। আলনা থেকে একখানা শাড়ী টেনে নিয়ে বললো—এসো দেখি। ঐ শুকনো মুখ আমি দেখতে পারছি না—তোমার পায়ে পড়ি, এসো!

অঞ্জন চেয়ে দেখলো—দুটি চোখ ভর্ত্তি হয়ে গেছে জলে—তার সেই কাজল, সেই পল্লীপ্রিয়া, সেই মাধুর্য্য-মমতা-মাদকতার উৎসভূমি। অঞ্জন এই একটু আগে ভাবছিল—কাজল তার সহুরে হয়ে উঠেছে। নাঃ, অঞ্জন বড্ড নির্ব্বোধ! কাজল সহুরে হবে—হতে পারে কখনো! অসম্ভব!

—কাজল!—অঞ্জন ডাকলো।

—উঃ? কি?

ওকে জড়িয়ে ধরে অঞ্জন বললো—না কিছু না, এমনি। অকারণ।

—চলো—তা'লে।—হাত ধরে টানলো কাজল এবার। চলো, আমি গা ধুইয়ে দি ভালো করে।

—আয়—'অঞ্চল ভরা সৌরভ তোর অন্তর ভরা মধু'—।

অঞ্জন উঠানের দিকে এগিয়ে গেল কাজলকে নিয়ে।

স্তব্ধ অপরাহ্ন—নির্জ্জন গৃহকোণ—অঞ্জনের একটু দুষ্টুমি করবার ইচ্ছে হচ্ছিল। বালতি থেকে এক আঁজলা জল নিয়ে ও কাজলের পিঠে ছড়িয়ে দিল—বেশ লাগলো কাজলের। আরেক আঁজলা দিল অঞ্জন—তার পর বালতির সব জলটাই ওর গায়ে দিল ঢেলে। কাজলের খুবই ভাল লাগছে। আরো খানিকটা জল এনে ও দিল স্বামীর গায়ে ছিটিয়ে। দু'জনে খানিক ছুটোছুটি করলো ছোট্ট উঠানটায়। অঞ্জন শেষটায় ওকে ধরে ওর সারা গা'টা বেশ করে চুবিয়ে দিল চৌবাচ্চার জলে।

—ছাড়ো—ছাড়ো—কাটিম উঠেছে।

—উঠুক।—অঞ্জন ছাড়ে না ওকে। ছাড়িয়ে যাবার আন্তরিক ইচ্ছে অবশ্য কাজলেরও নাই, কিন্তু কাটিম সত্যি উঠেছে। মাম্ মা——ডাক শোনা যাচ্ছে ওর। খাট থেকে নিজেই নামতে গিয়ে শাণবাঁধা মেঝেতে পড়ে যাবে এখুনি। কাজল অস্থির হয়ে উঠলো। ওর অসম্বৃত বেশ—ওর আলুলায়িত কেশ—ওর কৃত্রিম কোপব্যঞ্জনা খুব ভাল লাগছে অঞ্জনের—কাজল ছুটে গিয়ে খাট থেকে নামালো ছেলেকে। কাটিম এখন হেঁটে বেড়াতেও পারে তবে খুব বেশী নয়। কথা ওর ভালো করে ফোটেনি এখনো। কাজল মাস গুণে হিসেব করে, কয় মাসের হোল।

ভিজে কাপড়েই কাটিমকে কোলে নিতে দেখে অঞ্জন বললো,—থামো থামো—বিছানার গরম থেকে একবারে ভিজে কোলে তুলো না—ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

কিন্তু কাজল ততক্ষণ কোলে তুলেছে ছেলেকে। কাটিম ওর গলা জড়িয়ে ধরে বুকের দিকে মুখ আনছে—মাই-দুধ খাবে।

কাজল হাঁফাচ্ছে এখনো, এইটুকু ছুটোছুটি করেই। এই একটু আগে ও যেন ওর বালিকা বয়সে ফিরে গিয়েছিল—ওর সেই কৈশোর জীবনে, যখন ওর বিয়ে হয় নি। ওদের গাঁয়ের কাছেব শাল-নদীর বালি খুঁড়ে যখন জল আনতে যেত, সইদের সঙ্গে এমনই করে ও ছুটাছুটি করেছে নদীর বালিতে। ওপারে বন-কুল পাকলে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে চলে যেত নদী পার হয়ে। কে কত আগে যেতে পারে তার পাল্লা চলতো। গরমের দিনে নদীর এক হাঁটু জলের স্বচ্ছ আবরণে কত রঙ-বেরঙের মাছ দেখা যেত—দুই সখীতে গামছা মেলে জাল তৈরী করে সেই মাছ ধবতো ওরা। ছুটোছুটি কত রকমের খেলা যে ছিল তখন! তার পর বিয়ের এই ক'টা বছর কাজল একেবারে শান্ত বধূজীবনে বদ্ধ হয়ে গেছে। শ্বশুববাড়ীর আদরিণী বধূ সে—কিন্তু পল্লীবধূর ছুটোছুটি করার অবকাশ নাই। এখানে এসেও অঞ্জনের সাহচর্য্য ও এমন করে কোনো দিনই পায়নি—তাই ঐ খেলাটা ওর অতিরিক্ত রকম ভালো লাগছিল।

কিন্তু কাটিম এখন ওর মাইদুধ খাচ্ছে। চোঁ-চোঁ করে টানছে। মাঝে মাঝে দুধে-দাঁত দিয়ে কামড়াচ্ছে। কাজল ওর পিঠে আস্তে একটা চাপড় মেরে বললো—আঃ, কামড়াস নে।—কে কার কথা শোনে। কাটিম সে পাত্রই নয়—ও আরো জোরে কামড় দিল। কাজল বিব্রত হয়ে ওকে সামলাবার জন্ত বসলো ভিজে কাপড়েই।

। বারান্দায় গা মুছছে—আর অল্প অল্প হাসছে। কাজল ভেতর

থেকে বললো,—হাসছো কিসের।—কোনো সাড়া না দিয়ে অঞ্জন গা-মাথা মুছতে লাগল। কাজলের হঠাৎ অত্যন্ত লজ্জা বোধ হচ্ছে। কেন উনি হাসছেন? কাজলের এই ছুটোছুটি আর ছেলেমানুষি দেখে? হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কি! কাটিমের দিকে তাকাতে লাগলো কাজল, এতবড় ছেলে যে-মায়ের কোলে, তার কি আবার অমন ছুটোছুটি করা মানায়? লজ্জায় কাজল লাল হয়ে উঠলো অকস্মাৎ, ম্লান হয়ে গেল যেন। ছিঃ, কেউ যদি দেখতে পেত। ভাগ্যিস দাদু এখানে নাই, মণ্টুও চলে গেছে! না না-না কাজলের আর এসব খেলা মানায় না হয়ে গেল ও সরমে! গায়ে গেঞ্জি চড়িয়ে অঞ্জন বললো—কাপড় ছেড়ে এক কাপ চা দিবি কাজল, আমি আফিস ঘরে রইলাম। কাজল চুপ করে রইল—সম্মতি দেওয়া অনাবশ্যক। অঞ্জন কিন্তু এতক্ষণে ওর মুখের পানে তাকালো—কেমন যেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কাজলকে!

—কি হোল রে, কাজলু?

—নাঃ, বড় বেহায়াপনা করালে তুমি! অমনি করে আবার ছুটোছুটি করে নাকি!

—হ্যাঁ, করে—কেন?—অঞ্জন বিস্মিত হোল। কাজল আর কিছু না বলে মুখটা নামাল। অঞ্জন এক মিনিট দাঁড়িয়ে বুঝবার চেষ্টা করলো কাজলকে, তারপর ধীরে বললো—কালোর কোন রঙ নেই কাজল, তোর কাজল-কালি যেন কোন রঙে রাঙা না হয়। তুই তোর কালোর স্বত্বায় সঞ্জীবিত থাকিস—অঞ্জন ওঘরে গেল। কাজল বারবার কথাগুলা আবৃত্তি করছে আর বুঝবার চেষ্টা করছে।

৬

সকালে শিলাজিত ঐ নদীর ঘাটেই হাত মুখ ধুয়ে এসে পুরোহিত ঠাকুরকে বলল—এক কাপ চা পাওয়া যাবে ঠাকুর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বসুন।

ওখানে গরুও আছে—কাজেই চায়ের জন্য শিলাজিতকে বেশিক্ষণ বসতে হোল না। চায়ের বাটিটা শেষ করে শিলাজিত উঠে পড়ল আবার গ্রামের উদ্দেশে। রাজবাড়ীতে ডাকাতির সংবাদ তখন চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। গ্রামের কাছাকাছি আসতেই একজন লোকের সঙ্গে দেখা—হাল গরু নিয়ে সে ক্ষেতে যাচ্ছে চাষ দিতে। শিলাজিত বললো—সকালের ট্রেণটার কত দেরী আছে হে।

—ট্রেণের আখুনো অনেক দেরী মশাই—কুথাকে যাবে আপুনি?

—কলকাতা!

—এনেক বিলুম আখুনো—যাও। সামালে যেও সাধুবাবা—কাল ডাকাত এসেছিল।

—ডাকাত? কোথায়? শিলাজিত সচমকে প্রশ্ন করলো!

—কুথা আবার আসবেক—ঐ রাজবাড়ীতেই। আর কার ঘরে কি আছে যে নিবেক! শুনছি নাকি একটো ধরা পড়েছে। কুয়োর দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে রাজকুমারী—যাওনা বাবা—দেখবে তো যাও।

লোকটা চলে গেল। নিতান্তই গ্রাম্য স্বভাব ওর, তাই এমন মজাদার খবরটা শিলাজিতকে খামোখা দিয়ে গেল। যারই সঙ্গে ওর এখন দেখা হবে—তাকেই ও জানাবে এই খোস-খবরটি! শিলাজিত একটুক্ষণ ঐখানে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলো—তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে চললো গ্রামের দিকে। গ্রামের মধ্যে ঢুকে দেখতে পেল—এখানে-সেখানে দু'চারজন দাঁড়িয়ে কি সব বলাবলি করছে। ঐ ডাকাতির কথাই বলছে ওরা—শিলাজিত আরো ভাল করে জানবার জন্য একজনকে প্রশ্ন করলো

—কোথায় ডাকাতি হোল মশাই, কার বাড়ী?

—রাজবাড়ীতে। রাজকুমারীর ঘরেই সিঁধ ঢুকেছিল।

—কাউকে নাস্তানাবুদ করেছে নাকি?—শিলাজিত ব্যগ্রভাবে শুধুলো!

—তা কি আর না করেছে বাবা! কুথা থেকে আসা হচ্ছে সাধু-বাবার! হরিদ্বার?

—ন্‌না—উপস্থিত কালীঘাট থেকে। মারধোর করেছে কাউকে? শুনেছ?

—না বাবা সাধুজি! বড়লুকের ঘরের কথা। অত চট্‌ করে কি শুনা যায়!

শিলাজিত বুঝলো, এরা ওর সাধুতায় সন্দেহ করছে—তাই কিছুই বলতে চায় না। ও আর কথা না বাড়িয়ে এগিয়ে চললো। আরো একটু আসতেই সেই নূতন তৈরী স্মৃতিমন্দির—খোলা রয়েছে দরজা। শিলাজিত ঢুকে দেখলো, একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে বসে কালকার সভার রিপোর্ট লিখছেন। শিলাজিতকে দেখেই উঠে বললেন—

—আসুন সাধুজি! কাল রাজকুমারী আপনাকে কত যে খুঁজেছেন! কোথায় ছিলেন রাত্রে?

—গৃহবাস আমি করি না, তাই ঐ কালী মন্দিরে গিয়েছিলাম।

—কষ্ট হয় নি তো কিছু?

—না, ধন্যবাদ। হ্যাঁ, কাল নাকি ডাকাতি হয়ে গেছে?

—এসেছিল ডাকাত—জন দশবারো এসেছিল, শুনছি! কিছু নিতে পারে নি। ঐ যে কি বলে—এই—এঁরই দাদা—ঐ শিয়ালহাটায় থাকেন, কি যেন নাম—তাঁরই দাদুসায়েব নাজির—সেই নাজির সায়েব একাই সবাইকে ভাগিয়েছেন—হ্যাঁ, লাঠির জোর আছে। বারোটা ডাকাতকে একাই সাবাড় করেছেন—একটা তো একেবারে আধমরা হয়ে পড়ে আছে। চলুন না, দেখবেন তো চলুন। মীর সায়েবের টুকচেক চোট লেগেছে মাথায় আর হাতে; তা উ আর কি এমন! চলুন, যাবেন তো—আমিও যাব কি-না—রাজকুমারী কাল অনেক খুঁজেছিল আপনাকে—চলুন, দেখা করবেন।

লোকটা বলেই চলেছে। এই রকম করে বিনিয়ে বিনিয়ে কথা বলা হয়তো গ্রাম্য লোকদের স্বভাব। শিলাজিত শুনলো দাঁড়িয়ে; তারপর বললো,—আমার একটা জিনিষ আছে, রাজকুমারীকে দিতে হবে—কিন্তু উনি এখন হয়ত খুব ব্যস্ত আছেন নাজিরকে নিয়ে। আমি যাই গেলাম, আপনি এইটা দেবেন ওঁকে—কেমন?

শিলাজিত ঝোলা থেকে একটা রোলকরা মোটা কাগজ বার করলো। প্রৌঢ় লোকটি কাগজটা হতে নিতে নিতে বললো—কি আছে কি এতে?

—একটা পোট্রেট—রাজকুমারীকে দিলেই উনি বুঝবেন!

—আপুনি দেখা করলে উনি খুব খুসি হতেন।

—হ্যাঁ, কিন্তু আমার মোটে সময় নাই। এই ন'টার ট্রেণ আমায় ধরতেই হবে। আচ্ছা, আসি।

নমস্কার করে শিলাজিত তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়ল ষ্টেশনের পথে। ষ্টেশন আর বেশি দূরে নয়—এখন ট্রেণখানা লেট না হলেই ভালো। শিলাজিতের কাজ শেষ হয়েছে—ও আর এখানে এক মিনিট অপেক্ষা করতে চায় না। ওকে যেন কে ডাকছে—কার করুণ-কাতর আহ্বান ওর কানে এসে বাজছে—শিলাজিত দ্রুত পা চালালো।

বিশাল তরুচ্ছায়া সমাকীর্ণ পথ—পিছনে বিরাট রাজবাড়ী—পথের দু'পাশে গাছের ওদিকে লাঙ্গল-চষা জমি—এবড়ো-খেবড়ো হয়ে রয়েছে। দূরে দূরে রবিশস্যের ক্ষেতগুলোর শ্যামল ঢেউ দুলছে বাতাসে। কয়েক-দিন পূর্ব্বে হয়ত বৃষ্টি হয়েছিল, তাই চষা ক্ষেতে আগাছা জন্মেছে—হল্দে-হল্দে এক রকম ছোট্ট ফুল ফুটেছে আগাছায়। ঐ অকেজো গাছগুলোকেও মাতা ধরিত্রী তাঁর স্নেহরসে বঞ্চিত করেন না। কিন্তু কে বললো যে ওগুলো অকেজো! হয়ত সৃষ্টিরহস্যে ওদের প্রয়োজন অনেক বেশি—হয়ত ওরাই পৃথিবীর আদিমতম জীবন—হয়তো ওরাই

পৃথিবীর আদিমতম জীবকে খাদ্য জুগিয়েছে। ওরাও অকেজো নয়। এই বিশ্বে কেউই অকেজো নয়—কিছুই অকেজো নয়!

শিলাজিত ষ্টেশনের খুব কাছে এসে পৌছালো। একটা ছোট নালা—সাঁকো রয়েছে—জল বয়ে যাচ্ছে নীচে। একটা ঢোঁড়া সাপ কিলবিল করে চলে গেল ওর পায়ের সাড়া পেয়ে। শিলাজিত ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসছিল—কিন্তু মনকে ও তৎক্ষণাৎ চাবুক কসলো। এতো কিসের ভয়? মৃত্যু যখন জীবনের শেষ পরিণতি তখন তার জন্য তো প্রস্তুত থাকতেই হবে—না-থাকাটাই বোকামী। কোন এক হিন্দি কবির একটা শ্লোক মনে পড়লো—"হে মানুষ, তুমি যখন জন্মেছিলে তখন তোমার আত্মীয়রা হেসেছিল, আর তুমি কেঁদেছিলে—এখন এই পৃথিবীতে এমন কাজ করে চলো, যাতে তুমি হাসতে হাসতে মরতে পারবে, আর দুনিয়া তোমার জন্য কাঁদতে থাকবে"—কথাটা অঞ্জনের কাছে একদিন শুনেছিল শিলাজিত। হ্যাঁ অঞ্জন, মহান অঞ্জন—সুমহান অঞ্জন—ও এই কথাটা মেনে চলে! ও যখন মরবে তখন দেশে দেশে কাঁদবে সব লোক—কাঁদবেই! কী আশ্চর্য্য শক্তি ঐ অঞ্জনের! কোথায় পায় ও এতো শক্তি, এতো হৃদয়মাহাত্ম্য! কোথায় তার উৎসভূমি? জানে শিলাজিত, জানে। সে ওর অন্তরতমা কাজল। ঐ কাজল—যার ঘরে আলো জ্বালে—সে মহৎ না হয়ে পারে না—পারে না; তার অন্তরের দীপ্তিতে বিশ্বভুবন আলোকিত হয়ে উঠবেই। কাজলকে মনে পড়ছে শিলাজিতের; সেই সঙ্কোচনম্রা—নত-নয়না শ্যামলিমা—সেই গভীর কালো জলের উপর পদ্মদলের মত অকলঙ্কিতা, অপাপবিদ্ধা স্নেহামৃত, সেই সান্ধ্য-প্রদীপের মত দুটি চোখের পবিত্র ভীরু দৃষ্টি—ওর পবিত্রতা চির অম্লান থাক—ওর পাতিব্রত্য পৃথিবীকে ধন্য করুক।

শিলাজিত রেল লাইনটা ডিঙিয়ে এ পাশে ষ্টেশনের পাকা ঘরে এসে দাঁড়ালো। এখনো আধঘণ্টা সময় রয়েছে। রাজকুমারী যদি এর মধ্যে

খবর পেয়ে তাকে ডাকতে পাঠিয়ে দেন তাহলেই হয়েছে আর কি! মহাবিপদে পড়ে যাবে শিলাজিত। কিন্তু ডাকতে পাঠাবার তো কোনো কারণ নাই। রাজকুমারী ওকে চেনে না—নাজিরকে বলতে বারণ করে দিয়েছে শিলাজিত। মণ্ট বিশেষ কিছু বুঝবে বলে মনে হয় না। নিজের হাতে আঁকা লেখার ছবিখানা ও মন্দিরে রাখবার জন্য দিয়ে এল—ছবিটা দেখলেই কেয়া বুঝবে—ও ছবি চন্দ্রলেখার—কে দিয়েছে? তার উত্তর শিলাজিত লিখে দিয়ে এসেছে—'জনৈক বন্ধু!' কে সে বন্ধু—কেউ আর খোঁজ করবে না। কিংশুক বলবে না। কারণ লেখা যে বিবাহিতা ছিল, সে-কথা ওরা সবাই গোপন করে আসছে। দাদু জানে না লেখার ব্যাপার বিশেষ কিছু; মণ্টুও না। সে জানে ঐ অঞ্জন; সে তো আসেনি। লেখা এখানে স্বর্গীয়া কুমারী চন্দ্রলেখা রূপেই পরিচিতা থাক—শিলাজিতের তাতে তো কিছু ক্ষতি নাই—না, কিছুই ক্ষতি নাই শিলাজিতের!

এদিক-ওদিক পায়চারি করছে শিলাজিত। সিগারেট ধরালো। সাধু বাবার মুখে বিলেতী সিগারেট দেখে দু'চার জন এ ওর মুখের দিকে বিস্মিত হয়ে তাকাচ্ছে। গাঁজা না খেয়ে সিগারেট খায়—এ কি বরণের সাধু? শিলাজিত বুঝলো ব্যাপারটা; একটু হেসে বললো,—গাঁজা ফুরিয়ে গেছে বাবা!

—ওঃ, তা, তামুক খাবেন?

—না—থাক—এই বেশ চলছে;—শিলাজিত ষ্টেশনের ওজন যন্ত্রের লম্বা-চওড়া লোহার পাতটায় বসলো—দুচার জন যাত্রী ওকে ঘিরলো এসে!

ব্যাপার তো মন্দ নয়! ওকে সবাই সত্যিকার সাধুই মনে [illegible] নাকি? রোগ সারাবার ওষুদ কিম্বা ছেলে হবার কবচ চেয়ে না [illegible] আবার! ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা করলেও শিলাজিত বিপদে পড়ে যা[illegible] [illegible] খোঁজ নেয়নি ও একটা খবর পর্যন্ত। লোকগুলো

কিন্তু ওসব কিছুই করলো—পরম ভক্তিভরে ওকে প্রণাম, নমস্কার জানালো—ওর দেহের সঙ্গে বেশ খানিকটা তফাৎ রেখে বসল। .

—রাত্তে কোথায় ছিলেন সাধুবাবা ? রাজবাড়ীতে ডাকাতি হইছে, শুনেছেন ? —শুধুলো একজন যাত্রী !

—না—আমি ছিলাম ঐ নদীর ধারে কালীবাড়ীতে—ডাকাতরা টাকাকড়ি বা গহনা কিছু নিয়ে গেছে, জানো ?

—না—কিছু লিতে পারে নাই। লিতো ঠিকই—দশ বার জনা নাকি এসেছিল—কিন্তুক পড়েছিল ব্যাটারা শক্ত লোকের পাল্লায়। নাজির সায়েব—ই তল্লাটে এমন লেঠেল আর নাই সাধুবাবা,—বুঝলে ? একাই সব কটাকে ভাগিয়েছে !

—হ্যাঁ !—নাজির সাহেব খুব ভালো লাঠিয়াল নাকি ? শিলাজিত কৌতুহলী হয়ে উঠলো !

—ওরে বাপ ! অমন লেঠেল আছে নাকি কোথাও ! হাতে লাঠি থাকলে তিনশো লোকই হোক আর পাঁচশো লোকই হোক, ওর গা ছুঁতে পারবে না !—সাহঙ্কারে বললো যাত্রীটি !

—ওঃ তাহলে তো খুবই ভালো লাঠি খেলোয়াড় !—শিলাজিত যেন অলস ভাবে বললো কথাটা ! অজানিতে ও হাত দিল ওর নিজের হাঁটুতে, ঐখানে নাজিরের লাঠি চালানোব স্মৃতি রয়েছে—সে স্মৃতির কথা মনে হলে শিলাজিত এখনো লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে—মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করে ওর। কিন্তু ঐ স্মৃতির সঙ্গেই জড়িত রয়েছে আর একটা স্মৃতি—কাজলের সেই হলুদ লেপে দেওয়া, সেই সম্রাজ্ঞীর মতন আদেশ—সেই সৎ হবার অনুরোধ।*

শিলাজিতকে আনমনা দেখে যাত্রী কজন একটু নিরাশ হোল। গল্প জমাবার এমন চমৎকার শ্রোতা পাওয়া যায় কম—কিন্তু আজকার ওদের

* গ্রন্থকার প্রণীত পথের ধুলো দ্রষ্টব্য।

খবরটা খুবই অসাধারণ—দশ বিশ বছরের মধ্যেও ঘটে নি এমন ঘটনা। কাজেই ধার পাশের গাঁ থেকে যত লোক ট্রেণ ধরতে আসছে, সবাইকে ওরা খবর দিচ্ছে; ডাকাতের চেহারা—তাদের বল, বিক্রম আর তার সঙ্গে নাজিরের অসাধাবণ শৌর্য্য-বীর্য্যের আলোচনা চালাতে লাগলো—ডাকাতদিকে কেউই অবশ্য দেখেনি আর নাজিরকেও না দেখার সামিল—কিন্তু ওদের কল্পনা এ-বিষয়ে খুবই তীক্ষ্ণ!

নাজিরের নাম সত্যিই বহু লোকের জানা—বহু ব্যক্তিই বলতে লাগলো—ওঃ সেই নাজির মিয়া—সেই নওঁার জমিদার বাড়ীতে যে লাথি মেরে দুয়োর ভাঙছিল?

—হঁ্যা—হঁ্যা—সেই; সেই; ছিপুরের সেই দাঙ্গার সময় মোল্লুটির হয়ে একাই রুখলো দেড়শ' লেঠেলকে।

—ও আব কি! মামার কাছে শুনেছি—লোহাগড়ের বাবুদের নাকি দুই দারোয়ান ছট্টু সিং আর বিজন সিং; নাজির সেই ছাতুখোর দুটোকে দু'বগলে পুরে এ্যায়সা চাপ দিয়েছিল যে ব্যাটাদের আর উঠ্‌তে হয় নাই।

—ও নাকি রাত বারোটায় থানায় হাজরি দিয়ে রাত দুটোর মধ্যে আট-দশ কোশ দুরের গাঁয়ে ডাকাতি করে ফিরে এসে আবার রাত দুটোর সময় থানায় হাজরি দিত!

—সি আর কি অসম্ভব! রণ-পায়ে ওরা ঘণ্টায় দশ কোশ চলতে পারে......!

এদের আলোচ্য বিষয় কাল রাত্রের ডাকাতি এবং তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনা; নাজির ডাকাত ছিল—জানে শিলাজিত—নাজির যে বিখ্যাত ব্যক্তি, তাও আজ জানলো; আর জানলো—নাজির মহৎ ব্যক্তি, মহাপ্রাণ ব্যক্তি—এই এরাই বলছে—কতবার করে বলছে তার কথা।

—রাজকুমারীর কি আর ধর্ম্ম থাকতো কাল?

—ধর্ম্মের কথা শেষ কস্ বাবা, পিরাণটাই যেত ডাকাতের হাতে!

—ভাগ্যিস নাজির মীর এসেছিল—না হলে—

—ভগবান মালিক ভাই, সতী মায়ের আশীর্ব্বাদ। আহা, রাজকুমারী বড্ড ভালো মেয়ে।

—সত্যি বড়লোকের মেয়ের যদি কোন দেমাক থাকে!

—সিদিন আমার ঘরকে যেয়ে হাজির, সুকাল বেলা—বলেন—কৈগো পাল, কদ্দূর কি কল্লে। তা বল্লুম—আমরা হাঁড়ি-কলসীই বাপ ঠাকুরদার আমল থেকে গড়ে আসছি হুজুর—উসব মুর্ত্তি-টুর্ত্তি কি জানি গড়তে, উনি কিন্তুক ছাড়বেন না—উঠোনেই একটা মোড়াতে বসে বল্লেন—'গড়তেই হবে তোমাকে। কেষ্টনগরের কুমোর গড়ে; তোমরা কেন পারবে না'—তা ভাই গড়তে লেগেছি আমি—মন্দ তো হয় নাই!

—হরি ছুতোরকেও উনি নানা রকম কঠোর কাজ—সৌখিন কাজ করতে বলেছেন!

—ডোম বাউরী যার যত রকম সৌখিন কাজ জানা আছে, করতে বলেছেন সবাইকে! সব দাম দিয়ে কিনবেন আর ঐ মন্দিরে রাখবেন।

—রঘু তাঁতীকে বলেছেন যে ভলো শাড়ী বুনতে পারলে একশ' টাকা পুরস্কার পাবে।

—এমন লোকের ঘর নাই যার ঘরে উনি না যান—উনার কিছু হলে—না বাবা, ভগবান রক্ষে করেছে!—এই বছরের আকালেই সব মরে যেতো, যদি উনি না থাকতেন।

—নাজির ভাগ্যে কাল এসেছিল—তা না হলে…!

—ঐ যে বলছি ভাগ্যিমানের বোঝা ভগবান বয়। নাজিরকে তিনিই এনে দিয়েছেন।

গাড়ী আসছে। অন্যমনস্ক শিলাজিত শুনছিল গ্রামবাসিদের কথোপকথন। টিকিট এখনো ওর কেনা হয়নি। হঠাৎ ষ্টেশনে

তাতার সাড়া জাগায় ওর স্বপ্ন ভাঙলো ! উঠে টিকিট কিনতে গেল, সেকেণ্ড ক্লাস একখানা হাওড়া ! সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট ! সন্ন্যাসী আবার সেকেণ্ড ক্লাসে যায় নাকি। কিন্তু ইনি হয়তো কাল রাজ-বাড়ীতে এসেছিলেন—হয়তো সাধারণ সন্ন্যাসী নন । মাষ্টার টাকা গুণে নিয়ে টিকিট দিল। গ্রামবাসীরাও দেখলো ইনি 'সেকেন্ কেলাসে' যাবেন—বড়লোক তাহলে—ওরা ক্রমশঃ তফাৎ হয়ে যচ্ছে !

গাড়িটা আসছে। সবাই চলে গেল শিলাজিতের কাছ থেকে সবে। সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট নাই বা কিনতো সে, ওরা সবাই এখন পর ভাবছে শিলাজিতকে। হোক সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট, শিলাজিত থার্ড ক্লাসেই ওঠবে ওদের সঙ্গে ! ওর মন যেন এদের আত্মীয়তা খুঁজছে আজ, কেয়া যাদের আত্মীয়তা পেয়েছে, কাজলও নিশ্চয় পেয়েছে, অঞ্জন তো পেয়েছেই—শিলাজিত কেন পাবে না ? নাজিরের মত দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত যদি কোন দিন মহান হতে পারে তো শিলাজিতই বা পারবে না কেন ! কিন্তু নিয়ে কি হবে ? কি কাজ করে নিজেকে প্রকাশ করবে শিলাজিত ! পল্লী-সংগঠন ?—দূর করো, ওর অভ্যাস নাই ! সাহিত্য-শিল্প চর্চ্চা ? না—যে দেশে শতকরা পাঁচজনও শিক্ষিত নয় সে দেশে কোনো সাহিত্য বাঁচে নাকি ! ও করে কিছু হবে না। কী তাহলে করবে শিলাজিত ? অঞ্জনের মত একটা আশ্রম খুলবে নাকি ? না—অঞ্জনের যে শক্তি আছে শিলাজিতের তা নেই ! ভাবতে ভাবতে শিলাজিত গাড়ীর দিকে এগুলো ! সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় এক মাল্যভূষিত দেশ-নেতা। কোনো যায়গা থেকে অভিনন্দিত হয়ে ফিরছেন বোধ হয়—কে উনি ? কংগ্রেস না হিন্দু মহাসভা, না পাকিস্তান ? যে হয় হোক—এত সস্তায় নাম আর কিছুতেই কেনা যায় না—মাহাত্ম্যের স্বর্গে উঠবার এমন উপায়, প্রশস্ত সিঁড়ি আর নেই—দুঃখের বিষয়—সিঁড়িটা বড্ড বেপোক্ত ?

অঞ্জন বলে-ঐ স্বর্গের লোভ মানুষকে দানব করে তোলে—ঐ স্বর্গের সিঁড়ি প্যাঁকাটি দিয়ে তৈরী—ঐ স্বর্গে যাবার ইচ্ছা মানুষকে মাতাল-মানুষ করে তোলে। মহান বলে খ্যাতি ওতে হয়, দুর্দিনে কিন্তু সেই খ্যাতিকে যারা মাথায় তুলে নাচে তারাই যে কোনো মুহূর্ত্তে তাকে পায়ে পিষে ফেলতে পারে—শিলাজিত ঐ কামরাতেই উঠে পড়ল।

লোকটি শ্রমিক নেতা। কোথায় কোন্ এক কারখানার শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট করবার উপদেশ দিয়ে ফিরছেন নিশ্চয়—ফুলের মালা আর ফলাও খাতির! বাঃ, মানুষের চোখে বড় হবার মতন এমন উপায় সত্যি আর কিছু নাই। যাদের উনি ধর্ম্মঘট করতে বলে এলেন—বর্ত্তমানে তাদের ভবিষ্যতের জন্য উনি যে বিন্দুমাত্র চিন্তিত, তা মনে হয় না—ওঁর বক্তৃতাটা কি রকম চমৎকার আর 'ওরিজিন্যাল' হয়েছে এবং কোন্ কোন্ কাগজে আগামী কাল তার রিপোর্ট বেরুবে—তাই নিয়ে উনি একজন রিপোর্টারের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। রিপোর্ট যেন কালই ঠিকমত প্রকাশ হয় কাগজে—এই কথাটাই বারবার বোঝাচ্ছিলেন উনি রিপোর্টারকে! তিনিও বেশ ভক্তিযুক্ত হয়েই বলছেন—হ্যাঁ, নিশ্চয় বেরুবে। এ সব রিপোর্ট বার করতে কাগজওয়ালারা দেরী করে না! হাসলো রিপোর্টার!

চমৎকার! শিলাজিত গদিমোড়া বেঞ্চের এক কোণে বসে শুনতে লাগলো। রিপোর্ট কি ভাবে লেখা হবে—যা এখানে বলা হয়েছে, তার মধ্যে কোন্ কোন্ যায়গা বাদ দেওয়া হবে এবং নূতন কোনো কিছু যোগ করা হবে কি না—এই সবের আলোচনা করতে লাগলেন ওঁরা!—এরই নাম স্বাদেশিকতা! এই অতি সস্তা মাল বেচে এঁরা দুপয়সা বেশ কামিয়ে নিচ্ছেন ঐ গরীব শ্রমিকদের ঘাড় ভেঙে—শুধু ফুলের মালা আর ফলাও মান-খাতিরই নয়—টাকাপয়সাও যোগায় ঐ হতভাগা শ্রমিক দল।

—এইবার একবার দুচার মাস রাজবাড়ী ঘুরে আসতে পারলেই—কি বলেন? নেতা বললেন।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—ফিরে এলেই একটা ভালো চাকরী, মানে শ্রমিকদের পক্ষে কোনো একটা দায়িত্বশীল পদ—কে আর মারে আপনার। আমাকেও দেখবেন যেন সেদিন!

নেতা হাসলেন! কথা খুবই আস্তে চলছে—গাড়ীর মধ্যে যতখানি আস্তে কথা বলা সম্ভব! শিলাজিত শিউরে উঠলো—এই শ্রমিক নেতা! এরাই করবে যত গরীব শ্রমিকদের দুঃখমোচন! হায় ঈশ্বর! কিন্তু ঈশ্বরকে শিলাজিত কমই ডেকেছে জীবনে। ওর ইউরোপ-অভিজ্ঞ মন চিন্তায় গুমরে উঠলো! এই শ্রমিক-আন্দোলন রুশিয়া থেকে এসেছে—মানে, রুশিয়ার নৈতিক নিষ্ঠাকে এদেশের কতকগুলি চতুর ব্যক্তি স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বেঁধে বলিদান করছে! যে আন্তরিকতা আর নিষ্ঠা থাকলে এই শ্রমিক-আন্দোলন সফল হতে পারে—তার কতখানি আছে এই দেশের নেতাদের? এরা তো প্রায় সবাই নিজের স্বার্থটাই খুঁজে বেড়ায়। 'দেশ-দেশ—দেশ-মাতা' বলে এরা যখন চীৎকার করে তখনো ওদের মনের মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে—দেশ নয়—ওর নিজের উন্নতির আবেদন এবং তারই জন্য এতখানি চীৎকার। এই বুকফাটা চীৎকারের লক্ষাংশের এক অংশও যদি আন্তরিক হোত, তাহলে দেশের দুর্দ্দিন বহুদিন পূর্ব্বে অবগত হয়ে যেত! কোথায় সাধনা? কোথায় নিষ্ঠা? রুশিয়ার শ্রমিক-আন্দোলনের প্রবর্ত্তক কয়েকজন বিশ্ববরেণ্য কর্ম্মী এবং সাহিত্যিক, যাদের অমর প্রতিভা একটা বিরাট জাতিকে গড়ে তুলেছে—একটা বিশাল জনসঙ্ঘকে এক রজ্জুতে গ্রথিত করেছে—একটা বিশ্বপ্লাবী শক্তিকে জাগ্রত করেছে! কিন্তু যে ঐকান্তিকতা আর দুঃখবেদনার মধ্যে ঐ রকম সাহিত্য সৃষ্ট হয়—ঐ রকম নেতার আবির্ভাব ঘটে, তা কি আছে এদেশে? কৈ? শিলাজিতের মনে তো পড়ে না! কয়েকখানা

বাংলা বই মাসকয়েক আগে পড়েছে শিলাজিত—যে বইগুলো এদেশে খুবই ভালো বই বলে খ্যাত—কিন্তু কোথাও পায়নি নিষ্ঠার বালাই, ঐকান্তিকতার অনুরাগ—সহানুভূতির আবেদন! সবই ভাসাভাসা এদের!! শ্রমিক সাহিত্যে যারা লিখছে—জীবনে কোনোদিন তারা শ্রমিকের সংস্পর্শে আসে নি; রাজনীতি নিয়ে যারা বই লেখে, তাদের সবটুকু বিদ্যেই পুঁথি-পড়ার মধ্যে নিবদ্ধ এবং নিজের পুস্তকে সেই সস্তা প্যাচ-ঝেড়ে বইএর দুএকজন পাত্র-পাত্রীকে প্রেমে পড়িয়ে জেল খাটিয়ে চোখের জল ফেলায় পাঠকের—বাহবা বই! হু হু করে কাটতে থাকে বাংলাদেশে—লেখকের নামে-নামে জলমাটি আচ্ছন্ন হয়ে যায়—এই তো এদেশের সাহিত্য! ক্লীব, পঙ্গু, উচ্ছ্বাস ভরা নারীজনোচিত ক্রন্দন!

সাহিত্যের মধ্যে কোথায় প্রসারতা—কোথায় নব নব পরিকল্পনা? কোথায় লেখকের চিন্তাবৃত্তি পাঠকের চিত্তে সংক্রামিত হয়? না, নাই! অথচ সব দেশে—সব কালেই সাহিত্যই জাতিকে জাগিয়ে এসেছে—জাতিকে নৈতিক শক্তি দান করেছে—জাতিকে মৃত্যুবরণ করে মরণজয়ী হবার মন্ত্র দিয়েছে। রুশিয়ার সাহিত্য সেই অমৃতমন্ত্রের সাধন-সাহিত্য! বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে শিলাজিত খুব বেশি অভিজ্ঞ নয়—অভিজ্ঞ ছিল লেখা; ও রীতিমত একজন উপাসিকা ছিল বাংলা সাহিত্যের। কিন্তু ও-ও তো বলতো—"একশ" বছর আগে ইউরোপে যে গণ-সাহিত্য গড়ে উঠেছে বাংলা-সাহিত্য আজও তার কাছাকাছি পৌছায় নি! অথচ এদেশেও নাকি গণ-সাহিত্য সৃষ্টি হয়! গণমনের সঙ্গে পরিচয় মাত্র যাদের নাই—তারাই লেখে গণ সাহিত্য! এদেশের লেখকেরা সবাই দুঃস্থ নিশ্চয়—কিন্তু ভদ্র দুঃস্থ! দারিদ্র্যকে তারা পাপ মনে করেই থামে না—লোকের মনোরঞ্জন করে সেই দারিদ্র্য থেকে তারা অব্যাহতি পেতে চায়। পাঠকরাও এদের সমশ্রেণীভুক্ত! কারণ তারাও ভদ্র-দুঃস্থ! আর সত্যিকার যারা আর্ত্ত-পীড়িত—তারা লেখাপড়া জানে না—কাজেই

তাদের সম্বন্ধে কে কি লিখলো, জানতে পারে না তারা। জানলে নিশ্চয়ই তারা প্রতিবাদ করতো।

যে লোকটি হরিজনদের তরফের হয়ে মহাসভায় বক্তৃতা করতে ওঠেন—হরিজনরা তার নামটাও সবাই হয়ত জানে না। মহাসভায় কি হয়—আর কি না হয়—জানবার কোনো উপায়ই তাদের নেই। আবার ঐ নেতা যখন মোটরে চড়ে হরিজন-পল্লী পরিভ্রমণ করতে যান—তখন তারই দুচারজন অনুগত আশ্রয়প্রার্থী আয়োজন করে ওঁর সম্বর্দ্ধনার এবং অন্ধের মত সবাই যোগ দেয় সেই উৎসবে। বীর সাভারকরকেও এরা যেমন অম্লান দেখায়, মহাত্মা গান্ধীর নামেও তেমনি গাল বেয়ে জল আসে—আবার কমরেড অমুক এলেও মালা দিতে এদের কিছুমাত্র বাধে না—পবক্ষণেই এরা, এদেশের এই গণশক্তি—অন্য যে কোনো নেতার আনুগত্যে আকণ্ঠ ভক্তিপ্লুত হয়ে গান ধবে! এমন দেশে নেতাগিরি করার মত সোজা কাজ আর কিছু আছে নাকি?—কেউ তোমাকে কোনো প্রশ্ন করবে না—কোনো কৈফিয়ৎ চাইবে না—তুমি একজন দেশপ্রেমিকরূপে নিজেকে প্রচার করতে পারলেই হল—চাই প্রচার, চাঁদা—চাই খবরের কাগজে রিপোর্ট ছাপা—খদ্দরের পোষাক—আর জনকয়েক অনুগত সেবক—ব্যস—তুমি অনায়াসে নিজের একটা দল গড়ে নিতে পার!…শেষটায় নেতাই তাহলে হয়ে যাবে নাকি শিলাজিত!

—চলুন—নামা যাক্—নেতাকে বললেন রিপোর্টার। চমক ভেঙে শিলাজিত দেখলো, জংশন ষ্টেশনটা এসে গেছে! এইখানে হয়তো আরো কোনো ফ্যাক্টরীতে বক্তৃতা করবেন উনি। নেতাজী ফুলের মালাগুলি গোল করে গলায় গুছিয়ে নিয়ে দু'একবার প্লাটফর্মের দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখলেন—কতজন তাঁকে ট্রেণ থেকে সম্বর্দ্ধনা করে নিয়ে যেতে এসেছে—ওঃ অনেক—অনেক—হাজারখানেক! উলঙ্গ—অর্দ্ধ উলঙ্গ শিশু পর্য্যন্ত! আগে লেই রিপোর্টার দরজার কাছে এসে হাত তুললেন—সঙ্গে

সঙ্গে ব্যাজ পরা কুড়ি-পঁচিশ জন ভলান্টিয়ার এগিয়ে এলো সেই কামরার দিকে। শিলাজিত পিছনে পড়ে গেছে—এরা না নামলে ও নামতে পারছে না। বিপুল হর্ষধ্বনি আর জয়গান গেয়ে নেতাজিকে নামানো হল। লাল লাল কি সব ফুল ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ওঁর চলার পথে—যেন উনি রক্তাক্ত পথেই চলছেন—যেন উনি ওঁর সমস্ত রক্ত দিয়েই তৈরী করে দিচ্ছেন এই গরীব শ্রমিকের জয়লাভের যাত্রাপথ। শিল্পী শিলাজিত মনে মনে প্রশংসা করলো ঐ লাল ফুল ছড়ানোর।—এখানে তিন-চার ঘণ্টা অপেক্ষা করলে তবে কলকাতার গাড়ী পাওয়া যাবে। নেতাজি কোথায় যাচ্ছেন—দেখে এলে ক্ষতি কি? শিলাজিত অনুগমন করতে লাগল। দুখানা গরুর গাড়ীকে একত্র করে চার-চাকা করা হয়েছে—তার উপর চমৎকার চন্দ্রাতপ—ফুলপাতায় সাজানো। মহা সম্মানে নেতাজিকে সেখানে নিয়ে বসানো হোল—তারপর উচ্চকণ্ঠে শ্লোগান গেয়ে সেই রথ টানা হতে লাগলো—গরু ঘোড়া দিয়ে নয়—মানুষ দিয়ে—ঐ সব শ্রমিকদের দিয়েই। ওরাও যেন ঐ রথরজ্জু টানতে পেয়ে ধন্য হয়ে যাচ্ছে—৺জগন্নাথের রথ টানবার জন্যে এত ভীড় হয় কি? কে জানে! শিলাজিত দেখে নি!

রিপোর্টার মশায়ও রয়েছেন ঐ রথে—হঠাৎ তিনি হাত তুলে শোভাযাত্রা থামতে বললেন। পথের ধারে একজন লোক ক্যামেরা খাটিয়ে ছবি তুলল, কয়েক মিনিট দেরী হল সেখানে—রিপোর্টার হেঁকে বললেন, —এক্ষুণি ডেভেলাপ করে ছবি তিনখানা দিয়ে যাবেন!—আবার চলতে লাগলো শোভাযাত্রা। বেশি দূর নয়—আধ মাইলের মধ্যে একটা মাঠ—লোকে লোকারণ্য। রথ একেবারে ভেতরে ঢুকে গেল—অত ভীড়ের মধ্যে শিলাজিত যেতে পারে না—ওর অভ্যাস নাই। বাইরেও লাউড্ স্পীকার রয়েছে—সেইখানেই দাঁড়ালো শিলাজিত।

একজনের পর একজন বক্তৃতা করছেন। কী ওজস্বিনী ভাষা! কী

জালাময়ী সব কথা ! হ্যাঁ, বাংলা ভাষার উন্নতি হয়েছে বটে—বাঃ, চমৎকার বক্তৃতা করা যায় তো বাংলা ভাষায় ! কিন্তু এ ভাষা কি ওরা বুঝতে পারছে ?—ওরা—ঐ শ্রমিকদল—ঐ ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরা মেয়েরা—ঐ উলঙ্গ শিশুগুলো !

"...ভাই সব, ধনতন্ত্রবাদকে এই পৃথিবী থেকে লুপ্ত করে আমরা আনবো সাম্যবাদের সুমহান প্রশান্তি—আমরা গড়ে তুলবো সর্ব্বজনের জন্যে সুখ-ঐশ্বর্য্যের আনন্দ নিকেতন—আমাদের এই শ্রমিকদের সাধনাকে......"

যিনি বলছেন তিনি নিশ্চয় শ্রমিক নন—তিনি উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি—কিন্তু যাদের জন্যে বলছেন তাদের যে অক্ষর পরিচয়ও হয় নাই ! এই জালাময়ী বক্তৃতার কতটুকু ঢুকলো ওদের মনে ? কতখানি কাজ করলো ! হ্যাঁ—কাজ হচ্ছে—ঐ যে সব সোৎসাহে বাহবা দিচ্ছে !—কিন্তু বাহবা ওরা জিনিষটা বুঝেই সত্যি দিচ্ছে তো ? নাকি, ঐ বক্তার সাকরেদ দু'চারজন বাহবা দিচ্ছে—অতএব তাদেরও দেওয়া উচিত মনে করে দিচ্ছে ! শিলাজিতের সন্দেহ জাগল !

—বুঝতে পারছো,—কি বলছেন উনি ?—শিলাজিত প্রশ্ন করলো কাছের এক শ্রমিককে।

—হুঁ—কেনে না পারছে—তু পারছিস না ?—লোকটা সাঁওতাল। শিলাজিত অন্য একজনকে আবার শুধুলো—বুঝতে পারছো হে মাতব্বর ?

—আজ্ঞে ! আপনি শুনেন—বলছে কি—যে মালিকবাবুরা মজুরী না বাড়ালে আমরাও কাজ ছেড়ে দিব—ই আর বোঝা কি শক্ত !

—তারপর ? কাজ ছেড়ে দিয়ে খাবে কি ?

—সি সব কি আর বলছে মুশাই ? হুঁ ! খাব পুলিসের গুঁতো আর বাবুদের গাল !

—তাহলে তোমরা এ সব কথা শোন কেন ? ওদের আসতেই বা দাও কেন ?

—আমরা কি জন্তে দিব ! উওরা লিজেই আসে,—লিজেই বলে, কয়—আবার চলে যায় ! মাঝে মাঝে আমাদের হপ্তাতে কিছু ভাগ বসায়—যে যেমন রুজগার করে তার তেমনি !

—চাঁদা দিতে হয় তোমাদের ?

—আজ্ঞে ! না দিলে কি যো আছে বাবা ! সবাই দেয়, আমিও দি ! হুঁ !—মালিকবাবুরা জানতে পারলে ধমকায়, কিন্তুক উপায় নাই মুশাই ? চাঁদা দিতেই হবেক !

—মালিকবাবুরা মজুরী বাড়িয়েছে কিছু ?

—না তো। কি আর এমন ! তবে ধাওড়াগুলুন ভাল করে দিয়েছে, জল পড়ে না—আর চাল-ডাল কিনে লিবার জন্তে দোকান করে দিয়েছে—আর মজুরীও কিছু বাড়াবেক এই মাস থেকে !

—তা হলে কিছু কাজ হয় বলো !

—হুঁ—হয় বৈ কী ! তবে মালিকদিকে বললেও হয়। না বলাতে উওরা খুব রাগে মুশাই, ঐ যে দেখছেন,—ঐ উনি-না, ঐ যে গো এলেন আখুনি টেনে—ইয়ের আগেও উনি এসেছিল—মালিকবাবুরা পুলিশ এনে বন্ধ করে দিয়েছিল বক্তিতে করা। ইবারও বন্ধ কত্তো—কিন্তুক কে জানে, কেনে যে করলেক না !

—কেন করলো না, শুনেছো কিছু ?

—হয়তো জেহেলে নিয়ে যাবেক ! কী কাজ মুশাই আমাদের উসব কথায় !—চুটি আছে রে মাঝি ?

সাঁওতালটা কানের পাশে গোঁজা শাল পাতার লম্বা বিড়ি দিল ঐ লোকটির হাতে। অন্ত কান থেকে আর একটা নিয়ে নিজের মুখে লাগালো—তারপর চকমকি ঠুকে আগুন বার করে ধরালো। বিড়ি ধরিয়ে চকমকির আগুনটা নিবিয়ে দিতে যাচ্ছে—তাড়াতাড়ি একটা আঠারো-কুড়ি বছরের সুশ্রী মেয়ে এসে বললে—এই, হে আগুনটো।

—চকমকির বাঁশের নলটা ওর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে লোকটা বলল—রূপনী যে রে?

—হুঁ—মেয়েটা জবাব দিয়ে সজোরে একটা টান মেরে বিড়িটা ধরিয়ে নিল! ধোঁয়া ছেড়ে বলল—পা ধরে গেল বাবা; কতক্ষুণ বক্তিমে করবেক আর?

কে জানে গা—চল, ঘরকে যাই! উ বিলা হাটে যাবি তো?

—দেখি! না যাই তো তু যেন একচাপ সাবন কিনে আনিস আমার লেগে, বুঝলি?

—হুঁ—চ না তুইও! রশি খাইবো, মাইরী বলছি—চ—এক সঙ্গে অনেকদিন খাই নাই!

—উ আবার বকাবকি করে ভাই। উয়োকেও নিয়ে গেলে হয়!

—নাঃ, তাহলে কি আমুদ হয় ভাই রূপনী!

শিলাজিত আর শুনলো না। এই নিতান্ত অশিক্ষিত অর্দ্ধ-বর্ব্বর জনসাধারণের কাছে যারা বিদ্যাসাগরী ভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছে—তাদের কথা ভেবে সময় নষ্ট করবার মত সময় ওর নাই। ও ষ্টেশনে ফিরলো। কোন্ পথে ও যাবে—কি ও করবে ওর বাকি জীবনটায়! এই হোল ওর চিন্তা! নেতাগিরির মুখোস পরে ও দেশের চক্ষে মহান হতে পারে—কিন্তু সে মাত্র দুচার দিনের জন্য। যে বস্তুর পিছনে সত্যের আগুন নেই তা বেশি দিন জ্বলে না। আতসী কাচের আলো ততক্ষণই যতক্ষণ সূর্য্যের জ্যোতি সে পেতে পারে। মিথ্যাকে সত্যের মুখোস পরিয়ে রাখা চলে শুধু রাতের অন্ধকারে—দিনের আলোয় তা ধরা পড়বেই। এই অশিক্ষিত লক্ষ-লক্ষ গণমন যেদিন শিক্ষার সত্যে এবং সত্যের শিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হবে, সেদিন এই বক্তৃতার কাজ হবে—আজ নয়। কিন্তু এদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবে কে? কেন—সরকার! কিন্তু কৈ—সরকার কতটুকু করছেন! দীর্ঘদিন এই অভাজনদের তাঁরা শাসন করছেন—কতটুকু উন্নতি হয়েছে এব

জনগণের! প্রায় কিছুই হয় নি—বিশেষ কিছুই হয় নি। না হবার কারণ যাই হোক—এই বক্তৃতা অরণ্যে রোদন—এদের জাগিয়ে তোলবার ঠিক পথ নয়—। কোনটা ঠিক পথ! স্বাধীনতা?

দেশকে স্বাধীন করবার যত রকম পরিকল্পনা যে ক'জন নেতা এ পর্য্যন্ত করেছেন—কারো পন্থাই মনঃপূত নয় শিলাজিতের। দেশের গণ-মনকে আগে গড়ে তোলা দরকার—সেইটাই হবে মূল কথা। সর্ব্বাগ্রে চাই যুক্তি দিয়ে বুঝবার শক্তি—শক্তিতে বিশ্বাস—আর নিষ্ঠা। কয়েকদিনের জন্য নেতাগিরি করবার জন্য নয়, কোনদিনের জন্যেও নেতা না হয়ে যিনি নেতৃত্ব করবেন—তিনিই পারবেন ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

৭

সকালে নাজিরকে গরম দুধ খাইয়ে কেয়া ওর কাছটিতে বসে আছে; মণ্টু এসে পৌঁছাল।—কেমন আছ দাদু? সেরে গেছ?

নাজির হাসল একটু, বললো—হুঁ—সারতে আর ক'দিন লাগবে? ই জান্ বড্ড শক্ত!—মণ্টুর বিশ্বাস, নাজিরের শরীর অতিমানবীয় শক্তিতে গড়া—ওর কিছু হতে পারে না—যদি বা এক আধটু আঘাত লাগে তো সে নিতান্তই সাময়িক—কাজেই দাদু এর মধ্যে ভাল না হয়ে যাবার কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছে না ও। কেয়া হেসে বলল—বসো ভাই মণ্টু। আচ্ছা—দাদু, তোমার দাদুসাহেবকে তো খবর দিতে হয়—আসতে লিখে দেব?

—না—না—নাজির ব্যগ্রভাবে বলল—দাদু বড্ড কাজের ভিড়ে থাকে। আমার জন্তে তাকে ইখানে আসতে হবে না। আমি তো ভালই আছি—উসব কিছু লিখো না!

—খবর দেব কি না?

—হুঁ, খবর দিক মণ্টু—লিখুক যে আমার হাতে একটুক্ চোট লেগেছে—দু'দিনে সেরে যাবে!

কেয়া যেন নিরাশ হলো নাজিরের কথায়। ওর অন্তরের ইচ্ছে—অঞ্জন একবারটি এখানে আসে। আশা করেছিল, এই স্মৃতি-মন্দির উদ্বোধনে আসবে—না আসায় কেয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছে। নাজিরকে দেখতে যদি আসে অঞ্জন! অঞ্জনের সেই ক্ষণিকের দেখা মুখ মনে পড়ল কেয়ার। মণ্টুর সঙ্গে সে-মুখের সাদৃশ্য দেখে আরো ভালো করে মনে পড়ছে এখন। আস্তে বলল—ওঁর কি এত কাজ দাদু যে একবারটিও আসতে পারেন না?

—ওর কাজ? উঃ, সে তুমি দেখলে অবাক হয়ে যাবে কেয়া দিদি—দিন নাই, রাত নাই, কাজ-কাজ আব কাজ! কাজল-দিদি আমার কেঁদে আকুল হয়। ওর কাজ যে কত—কত রকমের, আমিই কি ছাই জানি? ওখানে রাজাবাহাদুর, দেওয়ানজি—আর ওখানের পেজারা সব ওকে নিয়ে মাথায় তুলে নাচে! যেমন ইংরেজী তেমনি হিন্দি আর তেমনি বাংলায় কথা বলতে পারে দাদু—রোজ বক্তিতে, রোজ মিটিন্, রোজ ঝামেলা রাত বারোটা তক্।

কেয়া চুপচাপ শুনে গেল—তারপর মণ্টুকে বললো—তোমার দাদাকে চিঠি একটা লেখ ভাই মণ্টু—দাদুর খবর তো দিতে হবে—চলো, চা দি তোমাকে!

—উঁহু—কিংশুক বাবু আসুন!

—কোথায় তিনি?

—সন্ধ্যে করছেন ঐ মন্দিরে। আমাকে বললেন অপেক্ষা কর্‌তে!

—ওঃ আচ্ছা; চলো দেখি—তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর দাদু, আমি আসছি।

ওরা বেরিয়ে যাবে—হঠাৎ একটি বৌ এসে ঢুকলো ঝির সঙ্গে। কে

বৌটি? কেয়া তার দিকে তাকিয়েই চিনতে পারলো; সরকারদের বৌ।

—এসো ভাই? কি মনে করে?

—বাবা কেমন আছে?—বাবা! বলে বৌটি একেবারে বিছানার কাছে এগিয়ে এসে হাত দিল নাজিরের কপালে। নাজির চোখ খুলে ওকে দেখেই মৃদু হেসে বলল—কে তোকে খবর দিল রে বেটি? আয়—বোস্!

—গাঁময় খবর হয়ে গেইছে বাবা…এই হাতে, আর কপালে, আর কুথা লেগেছে দেখি। খুব বেদনা হয়েছে?—ওর চোখ দুটি ছলছল করছে। নাজির ডান হাত দিয়ে ওকে কাছে বসিয়ে বলল—কিচ্ছু না রে বেটি, কিছুই না! ইমন কতবার কত লাঠি গেল আমার মাথায়—ভাবছিস কেনে তুই? কালই সেরে যাবে!

বৌটি বসল ঐখানে। কেয়া ওদের সম্পর্কটা আন্দাজ করে নিয়ে বলল—তাহলে তুমি একটু বসো ভাই বৌ—আমি আসছি এখনি!

বৌটি ঘাড় নেড়ে সায় দিল। মণ্টুকে নিয়ে কেয়া চলে এল মন্দিরে। কিংশুক সন্ধ্যা করছে। স্নান তো রাত্রেই ও করেছিল—আবার এখন করেছে নাকি? চুলগুলো ভিজে ভিজে দেখাচ্ছে। গায়ে জালের গেঞ্জী। একেবারে খালি গা' দেখাতে হয়তো লজ্জা হয়েছে ওঁর। কেয়া দাঁড়িয়ে পড়ল—অনেকটা তফাতে। মণ্টু বলছে—গায়ে গেঞ্জি পরে সন্ধ্যে করে, নতুন দেখলাম! কেয়া ওকে চোখের ইসারায় শাসন করে চুপ করতে বলল। কিংশুক নাক টিপে প্রাণায়াম করছে। উপবীতটি গেঞ্জীর তলা দিয়ে এসে ওর হাতের বুড়ো আঙুলে জড়িয়ে রয়েছে। মণ্টু একটা বাতাবী গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়ালো। বড় বড় বাতাবীলেবু ফলে রয়েছে গাছটায়; একটার বোঁটা ধরে নাড়াচাড়া করছে। কেয়া ওর উদ্দেশ্য বুঝে বলল—পাকে নি এখনো!

—হুঁ—কিন্তুক উনি কতক্ষণ ধরে সন্ধ্যা করবেন?

—তা কি করে জানবো ভাই। খিদে পেয়েছে তোমার?

—হুঁ, তা হোক ; উনি উঠুন! এক সঙ্গেই খাব—মণ্টু সন্ধ্যা করা দেখতে লাগল।

মাঝে মাঝে ওর হাসি পাচ্ছে, অনেক কষ্টে চুপ করে ছিল—কিংশুক হঠাৎ মাথার উপর হাত দুটো তুলে গোটাকতক তুড়ি দিতেই মণ্টু সজোরে হেসে উঠলো। কেয়া বললো—হাসছো কেনো ?

না—এমনি !

কিংশুকও শুনেছে মণ্টুর হাসি—আড়চোখে তাকিয়ে ও বেজায় বিব্রত হয়ে উঠলো! তাড়াতাড়ি প্রণাম করে উঠে এসে কেয়াকে বললো, —কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন ?

—বেশি না—এই মিনিট কয়েক। চলুন, চা খাবেন!

—হ্যাঁ যাই! ব্রাহ্মণের ছেলে তুমি, সন্ধ্যা করো না মণ্টু ?—আবার হাসছো যে—মণ্টুর উপর অভিযোগ আনছে কিংশুক। মণ্টু আরো জোরে হেসে বলে উঠলো—নিশ্চয় করি। তবে আপনার মতন হাতের তুড়ি মারি না। আমি অমুদয়ে সন্ধ্যা করি।

কিংশুক বুঝলো—মণ্টুকে ঘাঁটানো ভালো হবে না ; তার নিজেরই ভুল হয়েছে এবং মণ্টু সেটা ধরে ফেলেছে—এখন চুপচাপ থাকাই ভাল।

—ওটা গুরুমন্ত্র আমার—বলে কিংশুক এগুলো বাড়ীর দিকে। কেয়া বলল—আসুন—ঠাকুরদাও হয়তো বসে আছেন।

—আপনার বাবা ?

—বাবা চা খান না—আসুন !

রাস্তায় কিংশুক কি যেন ভাবতে লাগল। মণ্টুর উপর ওর রাগ হোতো, কিন্তু রাগতে পারছে না। কেয়া ঠিক ছোট ভাইয়ের মতই হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে মণ্টুকে! মণ্টু হচ্ছে অঞ্জনের ভাই—সেই অঞ্জন, চন্দ্রলেখা যার কথা বলতে অজ্ঞান হোত! নাঃ, মণ্টুর সম্বন্ধে খারাপ কিছু বলা উচিত হবে না কিংশুকের—কেয়া সেটা সহ্য করবে না—কারণ

অঞ্জনকে চেনে কেয়া। কতখানা চেনে, তা অবশ্য জানা নাই—তবু যত-টুকুই চেনা থাক—অঞ্জনের বা মণ্টুর বিরুদ্ধাচরণ করে কেয়ার মনস্তুষ্টি করা সম্ভব হবে না—কিংশুক বুঝেছে। তাছাড়া, ঐ নাজির, যে কাল এদের সম্মান রক্ষা করেছে, সে ঐ অঞ্জনেরই লোক! আর অঞ্জনকে ভয় করবার কারণও তো কিছু নাই। অঞ্জন বিবাহিত। কাজেই কেয়ার মনের পাতে অঞ্জনের স্মৃতির মূল্য কিছুই নয়—কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না অঞ্জন।

ভাবতে ভাবতে কিংশুকরা এসে পৌঁছালো একটা ঘরে। বৃদ্ধ ঠাকুরদা তখন চা খাবার আগের কাজ সারছিলেন—গরম জল খাচ্ছিলেন ক্রুশেন সল্ট দিয়ে।

সকলকে একসঙ্গে সম্বর্দ্ধনা করে বললেন—বসো, বসো ভাইসব!

মণ্টু একটা মস্তবড় অয়েলপেন্টিংএর কাছে দাঁড়ালো গিয়ে। কিংশুক বসল একটা চেয়ারে। কেয়া চা তৈরী করতে আরম্ভ করেছে। কিংশুকই প্রথম কথা বলল—আজ সেই কনে' ডোবার ঘাটটা দেখে আসতে চাই।

—বেশ তো—যাবেন! কেয়া সাড়া দিল। ঠাকুরদা বলেন খুব ব্যথিত স্বরে—হতভাগী কেন যে এল, আর কেনই বা চলে গেল—কিছুই বুঝলাম না!

—ওর দুর্ভাগ্য! নইলে আপনার মতন মহৎ আশ্রয় থেকে চলে যায়। আমাদেরও জানাল না একবার!

—কিন্তু কেন? আজও তার নিরাকরণ করতে পারলাম না আমি। কোনো রকম অনাদর তো আমি করিনি ভাই—আর কেয়া তাকে··· বুড়োর কথা বেধে গেল।

—থাক দাদু! থাক ও কথা—কেয়া বন্ধ করে দিল কথাটা। আজ আর সে ঐ চন্দ্রলেখার কথা নিয়ে আলোচনা করতে পারছে না। কোথায় যেন বাধছে ওর। কোথায় যেন ও নিজেকে অপরাধী মনে করছে! ওর

মনে হচ্ছে, চন্দ্রলেখার ঐ আকস্মিক অন্তর্দ্ধান, হয়তো-বা মৃত্যুর জন্য দায়ী কেয়াই! সত্যিই কি মরেছে লেখা! এই তল্লাটের সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করেও ও তার মৃতদেহ খুঁজে পায় নি। তাই বহু সময় কেয়ার মনে হয়, হয়তো সে চলে গেছে। কিন্তু কেন গেল! আগে থেকে কাউকে কি ভালোবাসতে লেখা? না, তা যদি হবে তাহলে কেয়ার বাবাকে কেন ভালবাসল! ভালো সে বেসেছিল কেয়ার বাবাকে—এ বিষয়ে কেয়ার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবু সে চলে গেল। গেল কেয়ার সৎমা না হবার জন্যে—আর কি কারণ থাকতে পারে? কেয়ার সৎমা হতে ও চাইল না। অথচ যদি হোতো—আজ তাহলে কি সুখেরই না হোত!

—দারোগা আসবেন এখুনি—মীর সাহেব কেমন রয়েছে? দাদু বললেন!

—ভালো আছেন। দাদু বলছিলেন যে ঐ যে-লোকটা ধরা পড়েছে ও দাদুর চেনা—ওর নাম উদ্ধব—বড্ড গরীব, ও—যদি কোনরকমে ওকে বাঁচানো যায় তো ভালো হয়।

—বলেন কি? চোরকে বাঁচাতে হবে—মানে?—কিংশুক বিস্ফারিত কণ্ঠে বলে উঠলো!

—মানে, ও দাদুর বন্ধু ছিল একদিন।—কেয়া ধীরকণ্ঠে জবাব দিল। ওকে যদি রাজসাক্ষী করে নেওয়া যায় দাদু—বাঁচানো যাবে না? কেয়া শুধুলো।

—দেখি! আসুক দারোগা!—বৃদ্ধ বললেন।

—হ্যাঁ, আমাকেও বলেছে দাদু সে কথা! মণ্টু বলল।

—ডাকাতকে বাঁচানোর কোনো মানে হয় না কেয়া দেবী—ছাড়া পেলেই ও আবার ডাকাতি করবে। কিংশুক বলল।

—করে, জেলে যাবে! আমাদের কর্ত্তব্য দাদুর উপর। দাদু চায়, তার বন্ধুকে [illegible] করিয়ে দেওয়া হোক!

—ঐ ডাকাতটা মীর সাহেবের বন্ধু ? যে মীর সাহেব অঞ্জন বাবুর দাদু ?

—হ্যাঁ—কারণ মীর সাহেব নিজেই একদিন ডাকাত ছিলেন ; চোদ্দবার জেল খেটেছেন উনি—না ভাই মণ্টু ?

—হুঁ—মণ্টু চায়ে একটা চুমুক দিয়ে উত্তর দিল !

—মীর সাহেব যে ডাকাত ছিল তাতো জানতাম না ! ওঃ, তাই অত লাঠির জোর।

কেউ কোনো কথা বললো না। কিংশুকের অন্তর যে প্রসন্ন হতে পারে নি নাজিরের উপর, তা ভালই বোঝা যাচ্ছে। ওর ঈর্ষাটা এই দিকে এসে ঘৃণার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে। কেয়া অত্যন্ত চালাক মেয়ে। রুটিতে মাখন মাখিয়ে দিতে দিতে বলল—গত জন্মে যে ডাকাত ছিল, এ জন্মে তার দেবতা হওয়া বিচিত্র নয়।

—না—তা অবশ্যি বলছি না—তবে কিনা···কথাটা কিংশুক শেষ করলো না !

মন্দিরের সেই প্রৌঢ় কর্ম্মচারী এসে অভিবাদন করলো। কেয়া প্রথমে ভেবেছিল, রাত্রের ডাকাতির খবর নিতে এসেছে হয়তো, কিন্তু ওর হাতের গোটান কাগজটা দেখে বললো—কি ?

—এইটে কালকার সেই সাধুবাবা আপনাকে দিয়ে গেলেন। আমি অনেক করে বললাম ওঁকে আসতে এখেনে, তা' উনি এই ট্রেণেই চলে যাচ্ছেন কলকাতা, আসতে পারলেন না !

—দেখি—দেখি ! কাল রাত্রে উনি ছিলেন কোথায় ?

—ঐ কালী মন্দিরে—বলে কেয়ার হাতে কাগজখানা দিল সে !

খুলেই কেয়া বিস্ময়াহত কণ্ঠে বলে উঠলো—বাঃ, সুন্দর ! কিন্তু উনি কে ? তাহলে সাধু তো নন !

কিংশুক, মণ্টু, ঠাকুরদা সবাই দেখলো ছবিখানা। চন্দ্রলেখার ছবি ! চিত্রশিল্পী যে অসাধারণ শক্তিমান, এতে কারো সন্দেহ রইল না ওদের !

ঠাকুরদা বললেন কিংশুককে—আপনি কি চেনেন সেই সাধুকে ?

—না, কৈ আমি দেখি নি তো ? ব্যস্ত ছিলাম সভাপতিকে নিয়ে।

ছবিটা কেয়ার কাছে খুবই মূল্যবান। কারণ চন্দ্রলেখার কোনো ছবিই নাই ওর কাছে ; ওর দাদাদের বলেছিল একটা পাঠিয়ে দিতে ; তা ওরা কৈ আনে নি তো ! যাই হোক, ও ছবিটা তৎক্ষণাৎ বাঁধিয়ে আনতে বলল ঐ প্রৌঢ় লোকটিকেই।

দারোগা সাহেব এসে পড়েছেন—কেয়া ভেতরে চলে গেল—যাবার সময় বলে গেল—বিকেলে কনে' ডোবার ঘাটে নিয়ে যাবে কিংশুককে।

মণ্টু খানিকক্ষণ উস্‌খুস করলো ; দারোগার সঙ্গে কেয়ার ঠাকুরদার কথা শুনলো, তারপর ওঁদের সঙ্গেই এল নাজিরের কাছে ! নাজির শুয়ে শুয়েই দারোগা সাহেবকে সেলাম করে বলল যা কিছু ব্যাপার গত রাত্রের ; শেষে বলল—ধরা পড়া লোকটা এক সময় তার বন্ধু ছিল। দারোগা আশ্বাস দিলেন, তাকে কম শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করবেন যদি সে অবশ্য রাজসাক্ষী হয়। অতঃপর আর যা কিছু তদন্ত করবার, করে তিনি চলে গেলেন।

সরকারদের বৌটি এতটা সময় একধারে দাঁড়িয়ে ছিল চুপ করে ; এবার বললো—আমি যাই বাবা, আবার উ-বিলা আসবো।

—হুঁ মা—আয় !

ও চলে যাচ্ছে, কেয়া বলল—একটু সকালে এসো ভাই, কনে' ডোবার ঘাটে নিয়ে যাব !

—বাবে নিয়ে ? আমি কখনো দেখিনি।

—হ্যাঁ, এসো সকাল সকাল—বলে কেয়া ওকে আদর করলে একটু ; কেয়ারই বয়সী বৌটি। ও চলে গেলে কেয়া বলল—ও কে দাদু ? তোমার গাঁয়ের মেয়ে ?

—না, রাস্তায় ওকে পেইছিলাম।—নাজির ব্যাপারটা আজোপান্ত

বলে গেল সেই রাণীগঞ্জ ষ্টেশনে দেখা হওয়ার ঘটনা থেকে। কেয়া শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যাচ্ছে।

—তুমি এতো স্নেহশীল দাদু—তুমি কি করে ডাকাতি করতে? মানুষকে পারতে লাঠি মারতে?

—হুঁ—পারতুম রে দিদি; হাত একটুকুও কাঁপতো না—আমারই আশ্চর্যি লাগে এখন।

মানুষের এমন পরিবর্ত্তন হয়? ক্রিমিনোলজির বই দু' চারখানা পড়ে একবার দেখবে কেয়া এর মূল কোথায়, এর হেতু কি।

* * * *

কেয়া চলে যাওয়ার পর কিংশুক আরো কিছুক্ষণ বসে ছিল ওখানে কিন্তু শেষটায় উঠে গিয়েছিল, নইলে হয়তো ওদের সঙ্গে অন্দরেও যেতে পারতো। ও এখন ব্রাহ্মণত্ব আয়ত্ত করবার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছে। যে পৈতে ও বহুদিন হোল ফেলে দিয়েছে সেই পৈতেই কাল গোপনে তৈরী করে পরতে হয়েছে ওকে। কোনো কালে ও সন্ধ্যা আহ্নিক করে না, আজ তাও করবার ভাণ করল! যেমন করে হোক ওকে প্রমাণ করতে হবে যে সে খুব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ—নইলে কেয়ার আশা দুরাশা। কোনো অব্রাহ্মণের হাতে মেয়ে দেবে না এরা। কিন্তু কিংশুক কোন্ সাহসে এত বড় আশা পোষণ করছে? নিজেকে ও প্রশ্ন করল এবার। উত্তর দিল নিজেই—এমন কিছু মন্দ পাত্র নয় সে। চেহারা যথেষ্ট ভালো—লেখাপড়াও ভালোই শিখেছে? ধনের অভাব কিছু-মাত্র নাই, না হবে কেন বিয়ে? হয় যদি, তাহলে কিন্তু সারা কলকাতার এরিষ্টক্র্যাটদের একবার দেখিয়ে দিতে পারে কিংশুক। কেয়াকে পাশে বসিয়ে যখন সে মোটরে চড়ে পার্টিতে যাবে—ওঃ—কিংশুক নিজের চিন্তায় নিজেই লাল হয়ে উঠলো লজ্জায় আনন্দে। দেখবে সৌমিত্রা, দেখবে সবাই—কিংশুক নিশ্চয় লাভ করবে কেয়াকে।

কিংশুক যে সমাজে মানুষ সে সমাজে নিজেই নিজের বিয়ের কথা বলা লজ্জার বিষয় নয়—বরং পৌরুষের পরিচায়ক। কেয়াকে ওর পছন্দ হয়েছে—শুধু পছন্দ নয়—কিংশুক মুগ্ধ হয়ে গেছে একেবারে, অথচ কেয়ার অন্তরের বিশেষ কোনো পরিচয়ই ও অবগত নয়—শুধু দেখেছে কেয়ার অনবদ্য রূপ আর শুনেছে আশ্চর্য্য মিষ্ট কণ্ঠস্বর! এই বিরাট প্রাসাদের সেই যে একচ্ছত্র মালিক—এটাও ওর জানা হয়ে গেছে। এমন একটি মেয়েকে জীবনে লাভ করতে হলে যা কিছু করা দরকার—যেমনটি হওয়া দরকার কিংশুক তার সবই করতে প্রস্তুত আছে—কিন্তু তথাপি ওর আশা সফল হবে কিনা—সন্দেহ হচ্ছে ওর। প্রস্তাব করবার কোনো উপায়ই ও খুঁজে পাচ্ছে না—তার উপর কাল রাত্রের ডাকাতির ব্যাপারে ও একেবারে মুষড়ে পড়েছে। রাত্রে দারুণ ভয় পেয়ে ও ভেবেছিল, সকালে উঠেই পালিয়ে যাবে কলকাতা—কে বাপু অজ পাড়াগাঁয়ে প্রাণ দিতে থাকবে এখানে?—কিন্তু দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে ওর ভয় কেটে গিয়ে ভরসা জাগতে লাগল; কাল রাত্রে কেয়ার খবর নিতে আসাটাকে ও কেয়ার অন্তরের স্নেহ-দৌর্ব্বল্য বলে আন্দাজ করলো; আজ সকালের কথাটা কেয়ার হৃদয়ের প্রীতি অঞ্জলি বলে ভুল করলো; 'কনে ডোবার ঘাট' দেখতে যাবার ওর কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই—কিন্তু ঐ সূত্রে যদি কেয়ার কিছুক্ষণের সাহচর্য্য পাওয়া যায়, এই ওর আশা! চন্দ্রলেখা কনে ডোবার ঘাটে গিয়ে মরেছে কিনা তার কোনো প্রমাণ নেই—আর মরেই যদি গিয়ে থাকে তো কি আর করবে কিংশুক! মৃত আত্মীয়ের জন্য শোক প্রকাশের বাড়াবাড়ি করে নাটক সৃষ্টি করে না ও। কিন্তু কেয়া করছে। কেয়া ঐ লেখার নামে স্মৃতি-মন্দির করলো—ওর জন্য আরো কত কি করবে কেয়া—ওর জন্য কিংশুককে জীবনের সাথীরূপে গ্রহণও তো করতে পারে!

কিংশুক লক্ষ্য করেছে, এ বাড়ীর আভিজাত্য, আদব-কায়দা সেই

সুপ্রাচীন আমলের গল্পে-শোনা দিনের মতই। ব্রত-উৎসব-পূজা তো আছেই—এখানে প্রত্যেকটি নারী-পুরুষ রীতিমত নিষ্ঠায় হিন্দু—আচার পালন করে। যে পৈতে কিংশুক কোন্ বিস্মৃত দিনে ফেলে দিয়েছে কাল তাই তাকে সংগ্রহ করে পরতে হয়েছে—আজ সকালে সন্ধ্যাও করতে বসলো। কিন্তু ও সবের নিয়ম কানুন কিছু জানা নেই কিংশুকের, দুচারটা বাজে সংস্কৃত শ্লোক যে ঝেড়ে দেবে, তারও উপায় নাই; কেয়া নিজে যথেষ্ট ভাল লেখাপড়া জানে। বাড়ীতে ওদের টোল রয়েছে। এখানে সবাই পণ্ডিত। সকালে সন্ধ্যা করতে বসে কিংশুক ঠোক্কর খেয়েছে মণ্টুর কাছে, এবার আর যেন সে রকম ভুল না হয়! একখানা "আহ্নিক কৃত্যম্" না কি বই আছে—সংগ্রহ করা যায় না? O. K. হ্যাঁ, কিংশুক দেখেছে। কাছারীতে গিয়ে চাইবে—পি, এম, বাগচীর পঞ্জিকায় সন্ধ্যার মন্ত্র থাকে। পঞ্জিকা চাইলে কেউ সন্দেহ করবে না। কিংশুক পঞ্জিকা থেকে শিখে নিবে মন্ত্রগুলো—তারপর আজ 'কনে ডোবার ঘাটে' গিয়ে দেখিয়ে দেবে সন্ধ্যা-আহ্নিকে সে চিরাভ্যস্ত।

কিংশুক কাছারী বাড়ীর দিকে এসে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। নায়েব মশাই ওকে দেখতে পেয়ে বিশেষ খাতির করে প্রশ্ন করলেন, —আসুন! কোথাও যেতে চান কি?

—না! পঞ্জিকা আছে? পি, এম, বাগচীর পঞ্জিকা?

—হ্যাঁ—ওরে পাঁজিটা দে তো এঁকে।

অত্যন্ত খুশী হয়ে কিংশুক পাঁজিটা নিয়ে নিজের ঘরে চলে এল। আর তাকে পায় কে! মন্ত্র-তন্ত্র যা কিছু সে এখুনি শিখে ফেলবে এর থেকে। কিন্তু হায়রে হায়—"কাগজ-সংকটের" জন্য পঞ্জিকার ডাইরেক্টরী অংশ সংযুক্ত করা সম্ভব হইল না—" দূর কর! রাগ করে কিংশুক পাঁজিখানা ছুঁড়ে ফেলে দিল তিন হাত তফাতে। মিনিট দুই পরে আবার তুলে নিল—যদি সন্ধ্যার মন্ত্রটা থাকে কোনো পাতায়। নাঃ

নেই। কিংশুক পাতার পর পাতা ওলটাচ্ছে—মণ্টু ঘরে ঢুকে বললো,—কি খুঁজছেন? সন্ধ্যার মন্ত্র? আমি বলে দিচ্ছি, শুনুন—

—কে বললে তোমাকে সন্ধ্যার মন্ত্র খুঁজছি? ডেঁপো ছেলে!

—ও, খোঁজেন নি? তাহলে, তাহলে কি খুঁজছেন? বিয়ের দিন? রাগে কিংশুক প্রায় অন্ধ হয়ে গেছে। পাঁজিখানা সজোরে মণ্টুর গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে বলল—গেট আউট; যেমন দাদা তেমনি তো তার ভাই হবে!

এতখানা রাগের কোনো কারণ খুঁজে পেলনা মণ্টু! কিংশুক যে সকালে সন্ধ্যার মন্ত্র না বলে যা খুশি তাই বলছিল; এটা ও শুনেছিল, তাই মনে করেছিল—কিংশুক সন্ধ্যার মন্ত্রই খুঁজছে। তার অস্বীকৃতিতে ঠাট্টা করে বলেছিল—বিয়ের দিন। একথাটায় অবশ্য ওর জ্যাঠামি করা হয়েছে, কিন্তু এত বেশী রাগ করবেন উনি—জানতো না মণ্টু। পাঁজিটা কুড়িয়ে নিয়ে বলল—আপনাকে ঠাট্টা করতে যাওয়া অবশ্য আমার অন্যায় হয়েছে; আপনি বড়মানুষ লোক—তা আমাকে আপনি দু'চড় মারুন, কিন্তু আমার দাদা আপনার কি করেছে যে কাল থেকে আপনি শুধুই বলছেন—'যেমন দাদা তেমনি তো ভাই হবে!' কি করেছে আমার দাদা?

অভিমানে মণ্টুর ঠোঁট ফুলে উঠলো। দাদার নিন্দা ও কিছুতেই সইতে পারবে না। আবার বললো—আমার দাদা—আমার দাদার পায়ের ধুলো নেবার যুগ্যি নন আপনি; আমার দাদার নাম উচ্চারণ করেন কোন লজ্জায়? গোটাকতক ইস্তিরি-করা জামা-কাপড় পরলেই মানুষ' কখনো ভদ্রলোক হয় না—বুঝলেন? বলে—'গেট . আউট—' আপনাকে এমন কিছু খারাপ কথা বলিনি আমি। আমার দাদা কি ক্ষতি করেছে আপনার? কী করেছে?

রাগে মণ্টু থরথর করে কাঁপছে। ওর পল্লীবালসুলভ উচ্চ কণ্ঠ সচকিত করে দিল জায়গাটাকে। কিংশুক বুঝলো, হঠাৎ ধরা পড়ে অনেক বেশি রাগ হয়ে গিয়েছিল কিংশুকের, কারণ ও যে পাঁজিতে সন্ধ্যার

মন্ত্র খুঁজছে, এটা অন্য কেউ জানবে, এ কিংশুক চায় না। মণ্টু সেটা আন্দাজ করে চেঁচিয়ে বলে দেওয়ায় রাগটা ও সামলাতে পারে নি! কিন্তু এখন সামলাতেই হবে, বললো,

—খামোখা মানুষকে বিরক্ত করতে আসো কেন?

—বেশ তো, আপনাকে বিরক্ত করেছি, মারুন আমাকে দু-চার চড়, কিন্তুক আমার দাদাকে কেন টেনে আনলেন? আমার দাদা পৃথিবীর কারো কিছু ক্ষতি করে নাই—কেন তাঁর নাম করবেন আপনি—কেন? কিসের জন্যে?

মণ্টুর চীৎকার আরো এক গ্রাম চড়ল। কিংশুক ওকে ঠাণ্ডা করবার জন্য সোফা থেকে উঠে এসে বলল—আচ্ছা, যাও, তোমার দাদার নাম আর করবো না!

—না—করবেন না। আপনার মুখে আমার দাদার নাম মানায় না!

পাঁজি ফেলে দিয়ে মণ্টু চলে গেল বাইরে। কিংশুক ওর পিছনে পিছনে বাইরের বারান্দায় এসে দেখলো—কেয়া ফিরে যাচ্ছে—মণ্টু তার পাশ কাটিয়ে আগেই চলে গেল নীচে—কেয়াও ধীরে ধীরে নেমে গেল।

কেয়া এসেছিল—কেয়া সবটাই শুনে গেল তাহলে। জেনে গেল মণ্টুর সঙ্গে তার কত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া হয়ে গেছে। বুঝে গেল, মণ্টুর দাদা অঞ্জনকে কিংশুক দেখতে পারে না। তাহলে—তাহলে এতো যে আয়োজন, সব বৃথা হোল কিংশুকের?

মাখনের মতন রং কিংশুকের কালো হয়ে উঠলো অকস্মাৎ।

কেয়া সটান চলে এলো মন্দিরে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলো কিংশুক। মণ্টু রাগে ফুলতে ফুলতে বাগানে গিয়ে ঢুকেছে—একবার করে থামছে একবার করে হাঁটছে, দেখতে পাচ্ছে কিংশুক! বড়ই অন্যায় কাজ করে ফেলেছে ও। এতখানা রাগ করার কি কারণ ঘটেছিল! বললেই হতো যে ফিরে যাবার জন্য যাত্রার দিন দেখছে। এমন বোকামী

কিংশুক তার জীবনে করে নি আর কখনো। এখন সে সামলাবে কি করে সমস্ত ব্যাপারটাকে? কেয়া মন্দিরেই রয়েছে—ডাবের জল ঢালছে একটা গেলাসে—কার জন্যে? নিজেই খাবে হয়তো! কিন্তু রাজকুমারী নিজের জন্য নিজে ডাবের জল ঢেলে নেবে—এ বিশ্বাস করা শক্ত। হয়তো মণ্টুর জন্যই। যা রাগ হয়েছে ওর! ডাবের জল খাইয়ে মণ্টুকে হয়তো ঠাণ্ডা করবে কেয়া? মণ্টু ওর আদরের হয়ে উঠেছে এর মধ্যে! কেন হবে না? অঞ্জনের ভাই। অঞ্জনের উপর কেয়ার অগাধ শ্রদ্ধা!

ঐ অঞ্জনটার মতন অলক্ষণে আর কেউ আসেনি কিংশুকদের পরিবারে। ওরই জন্যে লেখার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল—ওরই জন্যে আজ কেয়ার মনটাকে আকর্ষণ করতে পারছে না কিংশুক—আর ওরই জন্যে—মানে, ওরই ভাইয়ের জন্যে কিংশুকের সমস্ত প্ল্যান ভেঙে গেল! অঞ্জন যে কেন এসেছিল ওদের জীবনে! ভাগ্যের এ যেন একটা নিষ্ঠুর পরিহাস। ওকে কিন্তু এনেছিল তারই বোন লেখা!

কেয়া এখানে কি জন্যে আসছিল? কোন কথা ছিল কি তার বলবার! হয়তো ছিল—হয়তো কিংশুককে ঝগড়া করতে দেখে ফিরে গেল, হয়তো নিতান্ত একটা ইতর শ্রেণীর জীব ভেবেছে সে কিংশুককে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ!—কিংশুক মাথাকুটে মরবে নাকি!—না, মাথা কুটলে কোনো কাজ হবে না। তার চেয়ে ঐ মন্দিরে গিয়েই বরং কেয়ার সঙ্গে আলাপ জমানো যাক—ঝগড়ার কোনো একটা ভালো রকম কৈফিয়ৎ দিতে হবে—বলবে, সে মণ্টুর ডেঁপোমী সহ্য করতে পারে নি! কিন্তু কেয়া মনে মনে প্রশ্ন করবে তাকে—মণ্টুর দাদা কি ক্ষতি করেছে? কি বলবে কিংশুক? সত্যি কি কিছু অন্যায় করেছে অঞ্জন তাদের? না—করেনি তো! করেনি—কিন্তু বলা যায়—বলা যায় যে চন্দ্রলেখা ঐ অঞ্জনকেই জীবন দান করেছে। বলা যায় যে, লেখা ওকে না পাওয়ার

জন্যই এমন করে মৃত্যু বরণ করে নিল। অঞ্জনকেই ভালোবাসতো লেখা—অথচ অঞ্জন ওকে মজিয়ে দিব্যি চলে গেল—এখন দেশ-সেবার ভান করে সে মহামানব হবার আয়োজন করছে! লেখার সঙ্গে মেলামেশা করার সময় সে একবারও আমাদের জানায় নি যে, সে বিবাহিত, তার বৌ আছে! অঞ্জন এমনি করে লেখার সর্ব্বনাশ করেছে—আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে।

এমনি সব কথা যদি বলে কিংশুক তো কেমন হয়? কেয়ার চোখে অঞ্জন একেবারে কালো অঙ্গার হয়ে যাবে তাহলে! বললে কি আর এমন ক্ষতি? লেখা তো মরেই গেছে—সে আর কোনোদিন সাক্ষী দিতে আসবে না—এবং মৃত ব্যক্তির কোনো ক্ষতি হওয়াও সম্ভব নয়। হয় তো কেয়া যতখানি শ্রদ্ধার চোখে দেখে এখন লেখার স্মৃতিকে, সেটা না থাকতে পারে। নাইবা থাকলো—কি তাতে বয়ে যাবে। অঞ্জন যে একটা অতিশয় বদ লোক—এইটা প্রমাণ করতে পারায় কিংশুকের যথেষ্ট স্বার্থ আছে—এবং সেই বদলোকটার নাম কিংশুক ঘৃণাভরে উচ্চারণ করে ফেলেছিল এখনই—তার নাম উচ্চারণ করা ওর উচিত নয়। এমনি কয়েকটা কথা বলবে নাকি কিংশুক?

শিলাজিতের সঙ্গে লেখার বিয়ের কথা কেয়া জানে না—জানতেও দেওয়া হবে না কোনোদিন। লেখা কুমারী ছিল—এই-ই প্রকাশ থাক, কিন্তু লেখা অঞ্জনকে ভালোবাসতো—এই কথাটা বললে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। আর ভালো তো বাসতোই—সে কথা কিংশুকরা তিন ভাইই জানে—যদিও আরো জানে যে অঞ্জনের তাতে কোনো অপরাধ নেই। কিন্তু অপরাধ আরোপ করলে যদি স্বার্থসিদ্ধি হয়—এমন একটা চমৎকার স্বার্থ—তাহলে সেটা করাই উচিত—কিংশুক বারম্বার ভেবে নিল কথাগুলো।

বণ্টু ইতিমধ্যে বাগানের কিনারায় একটা জাম গাছের [illegible] দিয়ে

দাঁড়িয়েছে—কালো জাম পেকে রয়েছে—উঠবে নাকি মণ্টু? ওঠা উচিত হবে কিং না ভাবছে ও। কে আবার কি মনে করবে! কি আবার মনে করবে? ভারি তো! মণ্টু টুক করে একটা ডাল ধরে উঠে পড়ল গাছটায়। কেয়া ওর বাবাকে ডাবের জল খাইয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখছে মণ্টুর কাণ্ডটা। ওদিকে ওর বুড়ো ঠাকুরদাও বসবার ঘর থেকে তাকিয়ে আছেন—মণ্টু তিন লাফে মগডালে গিয়ে উঠলো।

থোকা থোকা পাকা জাম—বেছে বেছে বেশি পাকাগুলি তুলে মুখে দিচ্ছে! ঠাকুরদা এগিয়ে আসছেন এই দিকে। এই রে!—বুড়ো বকবে নাকি? মণ্টু চুপটি করে ডালে বসে পড়লো—যদি বকে তাহলে বড্ড লজ্জার কথা হবে। কিন্তু বকা দূরে থাক—ঐ বুড়ো মোটকা মানুষটি হুঁকো হাতে হাসতে হাসতে আসছেন—আর বলছেন—পাড়ো—পাড়ো ভাই মণ্টু—আমাকেও দুটো দিও—বুঝলে!—কেয়া?

—যাই দাদু? কেয়া উঠে এল।

ঠাকুরদা বললেন—আয়—জাম কুড়ো রে! আয় আঁচল পেতে কুড়ো—নাড়াও তো ভাই মণ্টু? ডাল নাড়া দাও তো!

বুড়োর চোখে জল। মণ্টু অবাক হয়ে গেল। কাঁদছে কেন বুড়োটা? বললো—কাঁদছেন কেন দাদু আপনি?

—না—না ভাই, কাঁদবো কেনো—দাও, ডাল নড়িয়ে দাও—বৃদ্ধ সামলে নিচ্ছেন!

কত দিন—কত দীর্ঘ দিন ওঁর বাগানে এমন করে কেউ উপদ্রব করে নি—কত দীর্ঘ বৎসর ধরে এই সব আম-জাম-কাঁঠাল অকারণে পেকেছে আর ঝরেছে—কেউ কুড়োয় নি। বৃদ্ধ সামলাতে পারছেন না। কেয়া বুঝলো ওঁর অন্তরের ব্যথা! করুণ সুরে বলল—তুমি দিন দিন ছেলেমানুষ হচ্ছো দাদু!

—হ্যাঁ—হচ্ছিই তো! তোর বাবা হবে সন্ন্যেসী, তুই হবি বষ্টোমী—

আমি আর কি হতে পারি! ছেলেমানুষ হচ্ছি!

বৃদ্ধ ঐ জাম গাছটার তলাতেই একখানা ইঁটের উপর বসতে যাচ্ছেন—কেয়া চাকরকে ইঙ্গিত করলে চেয়ার আনতে। গাছের ডালে হনুমানের মত বসে মণ্টু—মোটেই নিরাকরণ করতে পারছে না এই নাতনী-ঠাকুরদার দুঃখের কারণটা। ডাল নড়িয়ে দিলে ওদের পিঠে জাম পাকা পড়ে ছিচ্ছাতুর হয়ে যাবে—রংএ মাথামাথি হয়ে যাবে সারা গা! অতএব ও নিজেই হাতে তুলে জাম খেতে লাগল।

—দাও মণ্টু ভাই—আমাদের দেবে না?—বৃদ্ধ আবার বললেন উপর দিকে তাকিয়ে!

—নিন্—মণ্টু একটু এগিয়ে একটা সরু ডালে ভর দিয়ে নেচে দিল বার কয়েক! ঝরঝর করে বৃষ্টিধারার মত ঝরছে পাকা-জাম—গায়ে মাথায় মুখে পড়ে লাল হয়ে উঠলো ওদের কাপড় চোপড়। মণ্টুর মজাই লাগছে—আরো জোরে সে অন্য একটা ডাল নাড়িয়ে দিল! গাছতলাটা ছেয়ে গেল কালো-কালো জামে। কেয়া আঁচল ভর্ত্তি করে কুড়ুচ্ছে—মণ্টু উপর থেকে বললো—নুন মাখিয়ে রোদে দিয়ে বিকেলে খেতে হবে!

—হুঁ—আমিও ভাগ নেব কিন্তু—বললেন কেয়ার ঠাকুরদা!

—হুঁ—আপনি যত পারেন খাবেন—তারপর আমরা খাবো!

—বিকেলে কিন্তু ভাই 'কনে ডোবার ঘাটে' যেতে হবে—কেয়া বলল।

—হাতীতে চড়ে?

—হ্যাঁ।

—বেশ—আমি হাতীতে কখনো চড়িনি; বড্ড ইচ্ছে করে আমার—বলেই মণ্টু ডাল বেয়ে টপ করে ঝুলে নেমে পড়ে দাদুর বিশাল পিঠের আশ্রয়ে এসে বললো—আপনিও যাবেন তো দাদু?

—তোরা ভাইবোনে যাবি ভাই—আমি নাই গেলাম—বৃদ্ধ এই সুন্দর কিশোরটিকে বুকের কাছে টেনে আনলেন।

—না, আপনাকে যেতে হবে! নাতীর আব্দার ভরা গলায় বলল মন্টু।

—আচ্ছা, যাবো—যাবো আমিও—কেয়া খবর পাঠিয়ে দেতো দিদি, মন্দিরে।

কিংশুক এখান থেকে দেখছে মন্টুর আদর—চোখদুটো ওর জ্বালা করে উঠছে যেন।

৮

কাজল কয়েকদিন কোন রকম আব্দার করে নি—হঠাৎ কিন্তু সেদিন অঞ্জন এসে বলল—চল কাজল, তোমাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি!

বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই। কাজল আজ দু'মাস থেকে ঐ পাহাড় আর বনে বেড়াতে যাবার জন্য অনুরোধ করছিল অঞ্জনকে। অঞ্জনেরই সময় হয় নি। আজ যে ওর সময় হয়েছে তারও কারণ আছে। আজ সকাল বেলা মন্টুর চিঠিতে জানা গেছে যে দাদু আহত—সারতে আট দশদিন লাগবে। মন্টুও এখনো তাপসীপুরে—কেয়া আর তার দাদু তাকে ছাড়তে চায় না—ইত্যাদি! খবরটা শোনার'পর থেকেই কাজল মন-মরা হয়ে আছে—অঞ্জন জানে! তাই হয়তো একটু সময় করে নিল, —আর এতদিন যখন কাজল বারবার করে বলেছে, তখন অঞ্জনের এতোটুকু সময় হয় নি। নাঃ, যাবে না কাজল বেড়াতে। ওর অভিমান কিন্তু অকারণে; স্বামী ভালোবাসে বলেই তো কাজলের মন খারাপ দেখে সময় করে নিয়েছে। অত বেশি ভালোবাসে—তাই কাজলের এত দেমাক—সঙ্গে সঙ্গেই এই রকম সব কথা মনে হোল কাজলের। বেড়াতে তো আজই যাওয়া দরকার—অন্যদিন তো আর মন খারাপ থাকে না—আজ তার মন ভালো নেই—দাদুর জন্যে—মন্টুর জন্যে বড্ড চিন্তায় রয়েছে ও।—হ্যাঁ—অঞ্জন বুঝেছে বলেই তো আজ, এমন দিনে ওকে বেড়াতে

নিয়ে যেতে চায়! অভিমান করতে গিয়ে কাজল আরো বেশি করে ভালোবেসে ফেললো স্বামীকে! হ্যাঁ, স্বামী, ওর স্বামী—ওর সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী স্বামী—কত ব্রতপুণ্যের ফল এই স্বামী ওর—কত জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার সিদ্ধি ওর এই স্বামী। ক'টা মেয়ে এমন স্বামী পায়—এমন উদার—এতো মহান্—এমন একনিষ্ঠ?

নিশ্চয় একনিষ্ঠ—নিশ্চয়—নিশ্চয়! কারো এমন সাধ্য নাই, কাজলকে তার স্বামীর অন্তর থেকে একচুল নড়াতে পারে—কারুর সাধ্য নাই। মাধবী পারে নি—লেখা পারে নি—কেউ পারে নি—কেউ পারবে না। কোথাকার কে কেয়া—সে আর কি ক্ষতি করতে পারে কাজলের? চেনা নেই, জানা নেই—দেখাশুনো নেই—কেয়া নাকি শ্রদ্ধা করে! করে তো করে! কার কি বয়ে গেছে? করুক না! তার স্বামীকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড শ্রদ্ধা করে। না করবে কেন—শ্রদ্ধা পাবার যোগ্যতা ওঁর আছে বলেই তো করে!

মণ্টু লিখেছে—আর একবার পড়ল কাজল চিঠিখানা :—

"শ্রীচরণাম্বুজাসু"—ওঃ, ছেলের দিনে দিনে যত বিদ্যে বাড়ছে—ততই শক্ত শক্ত সব কথা লেখা হচ্ছে। "শ্রীচরণকমলেষু"ই তো লেখে বাপু—এ আবার কি রকম?—কেয়াই শিখিয়ে দিল নাকি! পড়ছে কাজল—

"শ্রীচরণাম্বুজাসু"

তোমার স্নেহের কোল থেকে এসে বৌদিভাই, সারা রাস্তা কান্না পাচ্ছিল—আমার, দাদুরও। কিন্তুক এখানে এসে—সত্যি বৌদি, অন্য রকম অবস্থা ঘটল! যাঁদের বাড়ী এসেছি তাঁরা খুব বেশি বড়লোক—রাজা একেবারে। মোটর তো আছেই—হাতীও আছে একটা, আর বিশ-পঁচিশটা ঘোড়া—আর আছে কেয়া দিদি। কেয়া দিদি যে কি চমৎকার বৌদি—তোমাকে কি বলবো, —আমার আপন দিদি থেকে একটুও তফাৎ মনে হচ্ছে না।

আর দাদাকে যে কী আশ্চর্য্য শ্রদ্ধা করেন উনি—দাদাকে মাত্তর একবার দেখেছেন ট্রেণে কখন—তাই মনে করে রেখে দিয়েছেন। দাদার চেহারার একদম ঠিক ঠিক বর্ণনা করলেন—এই রকম রং—এমনি চোখ—এই রকম কালো নরম থোকা থোকা চুল—এতখানি লম্বা—চলার ভঙ্গীটা ম্যাগ্নেষ্টিক, এমন কি, দাদার বাঁ পায়ে যে একটা জড়ুল আছে, তাও বলতে পারলেন—আমি একদম্‌সে অবাক মেরে গেলাম। দাদাকে উনি খুব—খুউব ভালোবাসেন !

বেশ আরামেই ছিলাম বৌদি ভাই—কাল সেই মন্দিরের উৎসবও হয়ে গেল—দাদার লেখা কবিতাটা আমিই দিলাম পড়ে।—দাদু সাহেবও বেশ ছিল—কিন্তু রাত্রিতে বাড়ীতে ডাকাত পড়ল—বারো-চোদ্দজন ডাকাত! আমি ঘুমিয়েছিলাম—যখন জেগে ছুটে দেখতে এলাম, তখন দাদু সব ডাকাতদের মেরে ভূত-ভাগা করে দিয়েছে আর একজনকে ধরেছে, কিন্তুক দাদুর কপাল কেটে গেছে—আর বাঁ হাতে খুব লেগেছে। কেয়া দিদি অন্দরেব ঘরে রেখেছেন দাদুকে— খুব যত্ন করছেন ওঁরা সবাই। ডাক্তার বললেন—দিন আট-দশ লাগবে দাদুর সারতে। দাদু একটু ভালো না হলে আমি বাড়ী যাব কি না, দাদাকে শুধিয়ে লিখো ! দাদাকে আমার অনন্ত-কোটী প্রণাম দিও আর তুমি নিও, আর কাটিম্‌কে দিও আমার স্নেহচুমা ! ইতি—

তোমার ভাই—লক্ষ্মণ।

পুঃ—কেয়া দিদি বারবার করে বলেছেন—দাদা যেন একবার এখানে আসেন। দাদু সাহেবকে দেখবেন আর দেখবেন শ্রী স্মৃতিমন্দির। উনি তোমাকে প্রণাম জানিয়ে তাঁর অনুরোধ দাদাকে জানাতে বললেন। মণ্টু।

চিঠিখানা পড়ে বোঝা যায়, কেয়া নাম্নী কোনো ধনীকন্যা কাজলের স্বামীকে শ্রদ্ধা করে—বেশ তো—করুক না! কত বড় মেয়ে? মণ্টু যখন 'দিদি' বলছে তখন নিশ্চয় মণ্টুর চেয়ে বড় হবে! দেখতে কেমন? কিছু লেখে নি মণ্টু সে সম্বন্ধে। আচ্ছা ছেলে তো? এত কথা লিখল—আর সে মেয়েটা দেখতে কেমন—এক ফোঁটাও লিখলো না! জমিদারের মেয়ে—দেখতে নিশ্চয় ভালো হবে—মণ্টুর থেকে ছোট হলে না হয় মণ্টুরই বৌ করে দিত কাজল তাকে! যত খুশি শ্রদ্ধা করতে পারতো তাহলে ভাসুরকে—কেউ মানা করতো না। কিন্তু সে যখন হবার নয়—কাজল ঠোঁট উল্টে কেমন একটা ভঙ্গী করলো মুখের।

উনি নিশ্চয় দেখেছেন সেই কেয়াকে। হ্যাঁ—মণ্টু তো লিখেইছে যে ট্রেণে কখন নাকি দেখা হয়েছিল,—কৈ, কাজলকে উনি সে কথা বলেন নি তো? কাজলের কাছে কোনো কথা তো কখনো লুকোন না। কেয়ার কথা বলেছেন কি? না তো! কেন বললেন না? জিজ্ঞেস করবে কাজল, নিশ্চয় জিজ্ঞেস করবে। হয়তো খুবই সুন্দর মেয়েটা—হয়তো কাজলের থেকেও সুন্দর। কাজল তো কালো, সুন্দর কোথায় আবার! একে আবার সুন্দর বলে নাকি!' কেয়া নিশ্চয়ই খুব ফর্সা আর খুব লেখাপড়া জানা মেয়ে—আর খুব আপ্-টু-ডেট্!

কাটিম্‌কে দুধ খাইয়ে ঝির জিম্মায় রেখে যেতে হবে—নিজের কাপড়-চোপড় পরতে হবে—চুলবাঁধা হল। ফ্লাস্কে দুকাপ চা ভরে নিতে হবে ওখানে গিয়ে খাবার জন্যে, আর কিছু ভাজা খাবার। কাজলের বিস্তর কাজ! যতদূর সম্ভব ত্বরা করে কাজ সারছে ও; ঝি ওকে সাহায্য করছে! অঞ্জন এলেই এখুনি তাগাদা লাগাবে—হোল রে কাজলু! কী আবেগ ভরা স্নেহ-মাখানো ডাক ওর। কখনো বলেন 'তুই' আবার কখনো বলেন 'তুমি'! হঠাৎ এসে হয়তো বলবেন—'আয়রে কাজলা—কাজল পরিয়ে দি'—না হয় এসে বলবেন—'তাড়াতাড়ি করো কাজল!' কি যে বলবেন,

কাজল ভেবে রাখতে চায় না। নিত্য নূতন ভাবে নূতন কথায় ওর স্বামী ওকে ডাক দেয়—ভেবে রেখে কাজল তার না-জানা মাধুর্য্যকে নষ্ট করতে চায় না—যা বলবেন, তাই ওর ভালো লাগবে। ওর স্বামী, ওর পরম গৌরবের ধন। ওর স্বামীকে বহু মেয়েই তো শ্রদ্ধা করে, করলোই বা; কাজল কি তাদের উপর ঈর্ষা করবে! নাঃ, কাজল বড্ড ছোট লোক হয়ে যাচ্ছে! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

মাধবী ওর স্বামীকে ভালোবাসতো—বেশ তো, বাসতো! মাধবী ছিল ওর খেলার সাথী! আহা, বেচারা মাধবীকে কাজল সয়ে নিয়েছে। তারপর লেখা! লেখা কোন্ আক্কেলে যে ওর স্বামীকে ভালোবাসতে গেল, কে জানে? কিন্তু সেও কিছু ক্ষতি করতে পারে নি কাজলের। তারই বরং বিস্তর ক্ষতি হয়ে গেল। আসে কেন ওরা ওসব করতে! আবার ঐ আর একজন আসছে—ঐ কেঁয়া! কে জানে, কি মৎলবে শ্রদ্ধা জানাতে চায় সে!—কাজলের ভ্রূ-দুটো কেমন কুঁকড়ে বেঁকে উঠছে—কিন্তু এ কি করছে সে? এইমাত্র ভাবলো যে ওদের উপর ঈর্ষার ভাব পোষণ করবে না কাজল, আবার করছে—ছিঃ!

কাজল তাড়াতাড়ি কাজ গুছিয়ে নিল। কাটিমকে খাওয়ালো—চা তৈরী করে ফ্লাস্কে ভরলো। এবার কাপড় ছাড়বে—অঞ্জন এসে উঠানে দাঁড়িয়ে বললো,—"কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া, রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া"—চল্ তবে কাজলু—দেরি কি?

কাজল কাপড় ছাড়বার জন্য জামাটা সবেমাত্র খুলেছে। ভিজে তোয়ালে দিয়ে গা'টা এবার মুছে নেবে ও—এমন সময় অঞ্জন! ঐ যে দাঁড়িয়ে ওর স্বামী, ওর প্রাণাধিক স্বামী, ওর প্রিয়-প্রিয়তম স্বামী

—একটু বসো—হয়ে গেছে আমার—ঐ কবিতাটির বাকিটা বলো তো—কাজল ঘর থেকেই বলল।

অঞ্জন জানে, কাজল কবিতা ভালোবাসে—তাই কবিতা ও বহু রকমে

বলে প্রায়ই; বলল—'আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি, তুমি অবসর মত বাসিও—আমি নিশিদিন হেথা বসে আছি, তোমার যবে মনে পড়ে আসিও।'

—যা—ও! ঐটা বলতে বল্লুম? না বলো, "কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া, রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া" তারপর?

—তারপর হচ্ছে—

তাড়াতাড়ি করি কাপড় পরিয়া আমার সঙ্গে চলো বাহিরিয়া,
দেখিবে ওখানে বন-পথ দিয়া চলেছে হরিণ-হরিণী—
সাজ-গোজ করে কিবা কাজ প্রিয়া—আমি যে কিছুই করি নি!

—তুমি না করতে পারো—তাই বলে আমি অমন করে বাইরে যেতে পারবে না—দাঁড়াও একটু।

—আচ্ছা—আচ্ছা দেবী—করো সাজো-গোজ—দেরি হলে বেশিদূর যাওয়া যাবে না কিন্তু; ঐ নদী-বাঁকে আর পাহাড়ের ফাঁকেই সূর্য্যিমামা অস্ত যাবেন!

—তা যান্! কাজল কাপড় পরতে লাগল। ভ্রমণের বেশ ওর এই নূতন। গ্রাম্য কন্যা কাজল স্বামীর হাত ধরে টক্ টক্ করে খড়ম-ঠ্যাং জুতো পায়ে বেড়ায় নি কখনো; আজই ওর হাতেখড়ি—কিন্তু ও দেখেছে, আর সবাই কি রকম করে যায় বেড়াতে।

ও কেন যাবে না? ও কি মানুষ নয়? ওর কি সাধ থাকতে নেই!—কাজল কাপড় পরছে! অঞ্জন দাঁড়িয়ে আছে উঠোনে একটা মরশুমী ফুলের গাছের কাছে। বেশ দেরী হচ্ছে কাজলের! কী এত সাজ করছে ও? অঞ্জন বিস্মিত হচ্ছে আজ। ওর সেই পুরোনো বৌ কাজল—সেই সাত চড়ে রা-না-কাড়া গ্রাম্য জড়-পুত্তলি—কতক্ষণ সাজ করবে সে আরো! নাঃ, কাজল বেশ খানিকটা বদলেছে। সেদিনকার কাজল যে ছিল ধরণীর ধূলিকণা সেকি স্বর্ণকণায় পরিণত

হচ্ছে আজ! অঞ্জনের বড় ভয়—বড় ভয় করে অঞ্জন ঐ স্বর্ণকণাকে। ওর কাজল কালো থাক্—মাটির সঙ্গে মিশে থাক মৃন্ময়ী হয়ে, মাধুর্য্য ছড়াক সে মাটির বাসে। কাজল বাইরে এল।

স্তম্ভিত হয়ে গেল অঞ্জন। নিখুঁত সুচারু সজ্জা—যেন একটি নিটোল নীল মরশুমী ফুল! নতুন ডিজাইনের ব্লাউজ—কাঁধের উপর হাতাটা সুন্দর একটি কার্ভ সৃষ্টি করেছে—বুকখানা বন্ধন বস্ত্রের বিলাসে সুন্দর তরঙ্গায়িত হয়ে গেছে—পাঁজরার পাশের কোমল কার্ভগুলি মিলিয়ে গেছে শাড়ীর তলায়। পেটিকোটের উপর শাড়িটাও আশ্চর্য্য রকমে বসেছে ভাঁজে ভাঁজে! পায়ে নীচু হীল তোলা জুতো—চমৎকার! মুগ্ধ হয়ে গেল অঞ্জন! কোথায় শিখলো কাজল এমন সাজ করার কায়দা? কখন শিখেছে? আর এসব জামাকাপড় ছিল কোথায় এদ্দিন ওর। বাবা কিনে দিয়েছেন, নাকি, হিরণ না, আর কেউ? অঞ্জন কোনদিন দেখে নি তো এ সব! কাজল ওকে ভাববার অবসর না দিয়ে ফ্লাস্ক আর খাবায়ের ডিবেটা তুলে নিতে নিতে বলল—চলো! স্বামীকে ও মোট বইয়ে যেতে দেবে না কিন্তু অঞ্জনও চায় না—কাজল এই বেশে কিছু একটা হাতে করে নিয়ে যাবে। ওর হাতে থেকে সেগুলো কেড়ে নিয়ে বললো—বোঝা নিয়ে হাঁটতে পারবে না—দাও আমায়?

—ঠাট্টা করছো?

—না খণি পাহাড়ে রাস্তা যে—কষ্ট হবে তোর—আয়!

পাশাপাশি চললো দু'জনায়। কাজল হাসছে লজ্জার হাসি! ও যে যথেষ্ট লজ্জিত হয়েছে, সেটা ওকে দেখলেই বোঝা যায়। অঞ্জন কিন্তু এখন আর চাইছে না—কাজল লজ্জা করুক, যদিও এই একটু আগেই সে কাজলের আপ্-টু-ডেট হওয়ার চিন্তায় ভয় পাচ্ছিল। এখন তো বেশ লাগছে কাজলকে, খুবই ভালো লাগছে—এতো ভালো

লাগছে যে এর পূর্ব্বে আর কখনো লেগেছিল কি না মনে পড়ছে না অঞ্জনের। কিন্তু অঞ্জন চিন্তাশীল দার্শনিক—এই নূতনত্বের একটা মোহকরী শক্তি আছে—এটা আবিষ্কার করতে বেশি সময় লাগে না তার। এই সাজ-সজ্জার একটা যে অপ্রতিহত "চার্ম্ম" আছে একে অস্বীকার করবার উপায় নেই! বেশ তো—কাজল যদি চায় তো করুক না সাজগোজ!

ও কিন্তু বড়ো সঙ্কোচের সঙ্গে হাঁটছে। অঞ্জন বুঝতে পারলো ওর ব্রীড়ানম্রতা, বলল, খোঁপা না বেঁধে বেণী দুলিয়ে দিস নি কেনরে? আরো ভালো লাগতো! দে, খুলে দে! নিজেই অঞ্জন ওর মাথার ঘোমটাটা টেনে খুলে দিল—তারপর খোঁপাটাও!

—আঃ, দিলে তো খুলে?

—হ্যাঁ—অমন আড়ষ্ট হয়ে হাঁটছিস কেনো—আয়—জোরে চল!

অঞ্জন গতি বাড়িয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে কাজলও! ছোট্ট একটা নালা—অঞ্জন লাফিয়ে পার হয়ে গেল—কাজলও পার হয়ে গেল লাফিয়ে—ঠিক পাশে পাশে হাঁটছে ও! পাহাড়ের পর পাহাড়—উঁচু নীচু পাথরে ভরা পথ—ধীরে ধীরে হাঁটছে। বন, ঝোপ, কাঁটাগাছ—ক্রমে সেটা বেশ নিবিড় হয়ে আসছে; নীচে সেই গিরি নদীটি—ওর স্রোত এখন খুবই কম—কিন্তু দেখতে তাই বেশী সুন্দর হয়েছে এখন—ঝিরঝির করে জল যাচ্ছে। বনঝাউয়ের পাতায় লাগছে জলের ধারা, ফেনা হচ্ছে একআধটু। ফুল ফুটেছে কত রকমের—কত রংএর। সুন্দর চারদিক! কাজল মুগ্ধ চোখে চাইল! আরো—আরো দূরে বন আরো নিবিড়, আরো গভীর—নীলাভ পাহাড়গুলো আরো মায়াময়। কাজল রুষ্ট হরিণীর মত ছুটছে; ঘোমটা নেই—মাথার বেণী পিঠে দুলছে পায়ে শক্ত জুতো, উপলে ব্যথিত হবার কোনো কারণ নেই—তবু কিন্তু চলতে পারছে না অঞ্জনের সঙ্গে। হাতখানা ধরে

বলল—অত জোরে না, আস্তে!

—ওঃ আস্তে—আচ্ছা—অঞ্জন গতি মন্থর করে দিল! তাকালো কাজলের দিকে। না—লজ্জার কোন চিহ্ন নেই ওর মুখে। বেশ হাসি মুখেই চলেছে কাজল এখন!

—ফিরতে হবে তো—কাজেই আর বেশি দূর না গিয়ে চলো, ঐ নদীধারে বসি—অঞ্জন বলল।

—না, যাবো আরো একটু, ঐ পাহাড়টার কাছ তক্।

—বেশ চল্—কিন্তু ওদিকে এই নদীটা নেই—জল পাওয়া যাবে না!

—নাই গেল! জল তো রয়েছে সঙ্গে।

—আচ্ছা, চল তাহলে!—ওদিকে দেখছিস্—মেঘ করছে, বৃষ্টি হতে পারে!

হোকগে। চলতে চলতে কাজল গুণগুণ করছে:—

—চল ভাদু চল্ লো, মেঘে এলো জল,
সরু কাপড় ভিজে যাবে—গেবে যাবে মল
চল ভাদু চল্ লো···

—গা'না, বেশ লাগছে! অঞ্জন বলল!

কাজল কিন্তু গান থামিয়ে একটা কাঁটা-ফুলের গাছের ডাল নুইয়ে ফুল পাড়ছে। অঞ্জন দেখলো—খানিক তফাতে কি একটা ময়া পাখীর গোটা কয়েক পালক পড়ে আছে—কুড়িয়ে এনে ওর চুলে গুঁজে দিয়ে বলল—ফুল নয়—এই পালক পর আজ!

—বেশ তো—দাও? কড়ি-ঝিনুক-শামুক যা আছে দাও!—হাসছে কাজল!

মুখখানা ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে কাজলের। সত্যি তো! কাজলকে ও বন্দী করে রেখেছিল এতদিন! অঞ্জন এতো স্বার্থপর? কেন সে কাজলকে এমন করে এই প্রকৃতি রাজ্যে মুক্তি দেয় নি? সে কেন কাজলকে শুধু

তার গৃহকাজের জন্যই আটকে রাখে? মুক্তির এই অবাধ আশ্রয়ে কাজলের মাধুর্য্য যেন শত শত গুণে বেড়ে উঠেছে। অঞ্জন ইচ্ছে করছে, কাজল নাচুক—বনভূমি নৃত্যশীলা হয়ে উঠবে।

তুমি দুষ্টু কিছু পরছো না যে? দাঁড়াও—কাজল একটা গাছের কচি পাতা ভেঙ্গে অঞ্জনের কোঁকড়া চুলে গুঁজে দিল—সাঁওতালরা যেমন করে মাথায় পাতা গোঁজে—হাততালি দিয়ে দিয়ে গাইল—

রাত বিহানে রাজা এলো, মাথার চুলে পাতা লো
মাথার চুলে পাতা,
ও সুকালের লাল্‌চে রোদে কে ধরবি ছাতা লো
কে ধরবি ছাতা!—রাত বিহানে রাজা এল…।

কাজল এতো সব পারে? বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাচ্ছে অঞ্জন; আনন্দে আত্ম-বিস্মৃত হচ্ছে!

—চলো বসবো এবার—ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কাজল এই উঁচুনীচু পথ হেঁটে। কিন্তু ওর মুখে ক্লান্তির কোন লক্ষণ নেই। সুন্দর, স্নিগ্ধ জোৎস্নার মত হাসি ওর সর্ব্বাঙ্গে!

ফাঁকা একটা জায়গা দেখে অঞ্জন বসতেই কাজল ওর কোলে সটান শুয়ে পড়ল! হাসছে। অঞ্জন ওর স্ফুরিত ঠোঁটে চুমা দিয়া বলল, —চা খাবি?

—দাও—তুমি একচুমুক আগে খেয়ে তারপর দাও আমাকে!

ওর কথামত কাজ করতেই হবে, নাহলে ও খাবে না। স্বামীকে না দিয়ে কিছুই খায় না ও। চা ত খায়ই না কোনো দিন! অঞ্জন চা ঢেলে নিজে একঢোক খেয়ে ওর ঠোঁটের কাছে ধরলে, কাজল চোঁ চোঁ করে খেয়ে নিল খানিকটা। পিপাসা পেয়েছিল ওর বড্ড! বলল, —দাদু আর মন্টু থাকতে দুষ্টু তুমি একটা দিন এলেনা বেড়াতে!

অঞ্জন ওর গালে টোকা দিয়ে বলল—দাদু আর মন্টু কাছে থাকলে

এমন করে তুই আমার কোলে শুতে পারতিস ? নাকি, এমনি করে গান গাইতে পারতিস ?

—হুঁ—তা পারতুম না—ঠিক—একটু থেমে বলল—দাদুকে দেখতে যাবে নাকি তুমি ?

—দেখি, যাওয়ার কি দরকার হবে ? দাদু দু'চারদিনেই সেরে যাবে। ওখানে মণ্টু আছে, কেয়া আছে ?

—কেয়াকে চেন তুমি ?

—হ্যাঁ—দেখেছিলাম সেই লেখাকে যখন ও নিয়ে যায়।

—আমায় বলো নি তো ? কৈ—বলো নি আমায়—বলেছ ?

—কি জানি ! বলিনি হয়তো।

—কত বড় মেয়ে কেয়া ? দেখতে কেমন ?

—মণ্টুর থেকে বড়—দেখতে সুন্দর খুবই। জমিদারের আদুরে মেয়ে।

—ওঃ—কাজল চোখ বুজলো স্বামীর কোলে। অঞ্জন খানিকক্ষণ ওকে শুইয়ে রেখে বলল—ওঠ—খেতে দিবি না আমায় ?

—হুঁ—মণ্টুও হয়তো এতক্ষণ কেয়াদিদির সঙ্গে বেড়াতে গেছে, নাকি ?

—যেতে পারে। ওরা বড় লোক—মোটরে চড়ে বেড়াচ্ছে হয়তো !

—হাতীও আছে। মণ্টু লিখেছে !

—হবে।

কাজল উঠে স্বামীর জন্য দুখান কাঁচা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে এল। খাবার সাজাল তাতেই। অঞ্জন একটু নিজের মুখে দিয়ে কাজলের মুখে অনেকখানি গুঁজে দিল খাবার !

—আঃ, তুমি আগে খাও !

—না, এক সঙ্গে খাই, আয় !

—[illegible] ছেলেমানুষ হচ্ছ তুমি দিনদিন ! কাজল ভ্রূকুটি করলো একটা।

—তোর ছেলের কথা মনে পড়ে গেল নাকি যে এর মধ্যেই বুড়ো হয়ে গেলি! এইতো, এখুনি ছিলি ছেলেমানুষ!

—না—আমি ছেলের মা।

—আমি ছেলের বাবা—অঞ্জন টেক্কা দিয়ে কথা বলছে!

কাজল কেমন যেন উদাস, কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ!

—কি হোল রে?

—দাদু ভালো হয়ে চলে আসুক, তোমার ওখানে যেতে হবে না। আমি বাপু এখানে একলা থাকতে পারব না—বলে কাজল চুপচাপ বসে রইল অনেকক্ষণ। ফেরার সময় কাজলের কলচাঞ্চল্য একটুও দেখা গেল না। অঞ্জন ভাবল, কাজল ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তাই এমন চুপচাপ!

৯

হাতীতেই চড়ে যাওয়া ঠিক হয়েছে, কিন্তু ঠাকুরদা মোটা মানুষ হাতীতে চড়া সম্ভব নয়—তাই উনি যাবেন পাল্কীতে। ধানক্ষেতের মাঝ দিয়ে পথ—মোটর বা ঘোড়ার গাড়ী যায় না! চারটা নাগাদ সবাই তৈরী হয়ে বেরিয়ে এল। মণ্টুর স্ফুর্ত্তি দেখে কে—সে সর্ব্বাগ্রে উঠে পড়ল একবারে মাহুতের কাছ ঘেঁসে। কিংশুক উঠলো তারপর; এর পরে কেয়া আর সরকারদের সেই বৌটি। ঝি না নিয়ে কেয়া এই বৌটিকে সঙ্গে নিল—কিংশুকের সঙ্গে যাবে—ঝি সঙ্গে নেওয়ার বড়মানুষী ও দেখাতে চায় না—অথচ একা-হয়েও সে যাবে না। বৌটি হাতী দেখেই বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কেয়া আর মণ্টুকে উঠতে দেখে সাহস করে উঠে পড়ল! কেয়া শুধুলো—

—তোমার শাশুড়ী খুসী মনে মত দিয়েছেন তো ভাই?

—হুঁ—তোমার সঙ্গে যাব—মত দিবেন না কেনে?

অতঃপর হাতী চলতে লাগল। ঠাকুরদা পিছনে আসছেন পাল্কীতে!

মণ্টু হঠাৎ বলে উঠলো—বৌদিকে একবার এনে হাতীতে চড়াতে হবে কেয়াদি।

—অত ভাগ্যি কি আমার হবে ভাই, তোমার বৌদি আসবেন! দাদাই তো আসলেন না একবার!

কেয়ার কণ্ঠস্বর বেশ আশাহত শোনাল! কিংশুক বসে আছে পিছনে; মনটা ওর ক্রমাগত জ্বালা করছে। মণ্টু আর ঐ বৌটা না থাকলে কিংশুক এখনি কোয়ার কাণে বিষ ঢেলে দিতে পারতো অঞ্জনের বিরুদ্ধে। আচ্ছা, চলুক তো—ঐ মন্দিরের কোথাও একটু ফাঁকা দেখে কিংশুক বলবে কেয়াকে—অঞ্জন কি রকম বদ লোক। অঞ্জনের চরিত্রকে কালো, কদর্য্য করে দেবে সে আজ কেয়ার কাছে। কি-কি বলবে আর কেমন ভাবে কথাগুলো বিশ্বাসযোগ্য করে বলবে—আর একবার ভেবে নিল কিংশুক!

হাতী খুব জোরে চলে—মাঝে মাঝে অবশ্য গাছের ডাল পেলে শুঁড় দিয়ে ভেঙে খায়—ক্ষেতের দুএকগোছা শস্যও উপড়ে নেয়—কিন্তু এগুলো হচ্ছে এখানকার অধিবাসীদের কাছে আনন্দের ব্যাপার। রাজবাড়ীর হাতীকে ওরা দেবীর বাহনরূপে দেখে—এমন কি, কেউ কেউ পূর্ণ ঘট পর্য্যন্ত দেখায়—ঘরের চাল-ধান এনে খাওয়ায়—ফলন্ত কলাগাছের কাঁদি কেটে নিয়ে গোটা গাছটা এনে ধরে হাতীর সামনে। হাতীটার নাম "রণজিত"। খুব শান্ত লক্ষ্মী হাতী; কেয়াকে ও এতটুকু থেকে পিঠে করে বইছে—কেয়া কাছে দাঁড়ালে শুঁড় দিয়ে ওর মাথার চুলে হাত বুলোয়—ছোট্ট ছোট্ট চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে কেয়ার মুখের দিকে। দাদু বলেন—তোর বিয়েতে তোকে রণজিতের পিঠে চড়িয়ে শ্বশুরবাড়ী পাঠাবো।

কেয়া বলে—না দাদু—রণজিতকে তারপর তারা যদি ফেরৎ না দেয়।

—নাই দিল—থাকবে সেখানে!

—না—কেয়া বারবার মাথা নেড়ে বলে—না-না দাদু—রণজিতের যত্ন আর কেউ করতে পারবে না।

হাতীটা খুবই আদরের। কেয়ার মা'ই ওটাকে কিনেছিলেন আর ওর পিঠে চড়ে এই মন্দিরে আসতেন। উনি যেদিন স্বর্গে যান—সেদিন নাকি এই হাতীটা সারাদিনরাত কেঁদেছিল; মুখে কুটোটি কাটে নি! তারপর থেকে রণজিত নাকি কেয়াকে আরো বেশি করে ভালোবাসে। দুচার দিন কেয়াকে দেখতে না পেলে ও চীৎকার করতে থাকে—খাওয়া বন্ধ করে দেয়। কেয়া তাই রোজ সকাল বেলা একবার ওকে দেখতে যায়—নিজের হাতে খাবার কিছু খাইয়ে আসে। কেয়া আজ অনেকদিন পরে ওর পিঠে বসেছে—চঞ্চল আনন্দে হেঁটে চলছে রণজিত—মন্দিরের পথ ওর বহু পরিচিত। কিংশুকের কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে। হাতীতে চড়া কখনো ঘটেনি ওর। ক্রমাগত ঝাঁকুনিতে অস্থির হয়ে উঠছে।

—হাতী চড়া কি এমন আরামের! মোটরে এলেই তো পারতেন! কিংশুক অপ্রসন্ন মুখে বলল।

—মোটর চলে না। ক্ষেতের মাঝ দিয়ে, আলপথের উপর দিয়ে যেতে হবে—পাল্কী চলাও কষ্টকর।

—আলপথে এই বিশাল জানোয়ারটি চলবে কি করে?—ঝাঁকুনিতে পড়-পড় হতে হতে কিংশুক ধরে ফেলল দড়িটা।

—এক হাত চওড়া আলপথের উপরও দিব্যি চলে যেতে পারে ও! আপনি একটু এদিকে ঘেঁসে বসুন!

—হুঁ—গায়ে ব্যথা ধরে গেল!

—এর মধ্যেই? কেয়া হেসে উঠলো—একে বলে এলিফ্যান্ট সিক্‌নেস্—কিন্তু এখনো তো একমাইল আসিনি—এর মধ্যেই ব্যথা ধরেছে আপনার?

কিংশুক আরেক বার ঝাঁকুনি সামলাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে;

উত্তর দিল না।

আসৎ কথা হোল, কিংশুকের অপ্রসন্নতার কারণটা হাতী চড়ার অসুবিধার জন্য নয়—কেয়ার সঙ্গে ও ভালো করে কথা বলতে পারছে না—তারই জন্য। মণ্টুকে যে কেন আনল কেয়া? মণ্টু তো দাদুর সঙ্গে আসতে পারতো কিম্বা আর যে কোনো রকমে পারতো যেতে! তারপর এই আর একটা গ্রাম্য বধূ। যেমন চুল বাঁধার ছিরি—তেমনি কাপড় পরবার ঢং। বসে আছে যেন কাবুলীদের কাপড়ের পোট্‌লা একটা। এতক্ষণের চেষ্টাতেও কিংশুক ওর মুখখানা দেখতে পেল না। ওর মুখখানা কিন্তু দেখতেই হবে কিংশুককে!

মণ্টু বেশ নিশ্চিন্ত বসে আছে হাতীর ঘাড়ের দুদিকে দুটি পা ঝুলিয়ে; মাঝে মাঝে আনন্দে চীৎকার করছে—

"হস্তীর হস্তটি—এ যে মুখেরই লেজুড়,
জানে না অবোধ লোকে তাই বলে শুঁড়"।

আবার বলছে—কুলো কাণী—মুলো দাঁতী—থামের মতন পা—

শ্বশুর ঘরের দুয়োরে তোর সেঁধোয় নাকো গা'
মনের দুখে তাই কি হাতী এলি গহিন বনে?
আবার বিয়ে দিব তোমার রাজকন্তের সনে।

খিল্‌খিল করে হেসে উঠলো সরকারদের বৌটি—সঙ্গে সঙ্গে কেয়াও। মণ্টু ফিরে তাকিয়ে বলল—হাসছেন কিসের লেগে? গেঁয়ো ছড়া—দাদা খুব ভালোবাসে—বলে—যত পারিস, শিখিস। দাদা বলে—এই সব হচ্ছে বাংলার লোক-সাহিত্য—সরল—সুন্দর—শুনুন আরো—

রাজকন্তের বিয়ে হবে—হাতীতে এল বর—
চৌদোলাতে রাজকন্তে গেল শ্বশুর ঘর;
সঙ্গে গেল আসাসোটা—মাকুন্দ তার ভাই
হাতী এল—ঘোড়া এল—কন্তে এল নাই!

খোঁজ খোঁজ খোঁজ কল্লে—কে করলো চুরি—
রাজপুত্তুর হাতী চেপে বনে বেড়ায় ঘুরি—
ইদিকে-সিদিকে ভালে—ইতিউতি চায়—
রাজকন্তের পায়ের ঘুঙুর পথে দেখতে পায় ;

—হাসছেন যে বড় ! শুনুন।

পথ—পথ—পথ ভাই—কন্তে কোথায় বল ?
পথ বলে—নদীর ঘাটে খেতে গেল জল !
নদী বোন—নদী বোন, রাজকন্তে কৈ ?
নদী বলে—ভিনগিরামে কিনছে চিড়ে-দৈ !
ভিনগিরামে রাজপুত্তুর হাতীতে চড়ে যায়—
হাতী দেখে গাঁয়ের লোক দৌড়িয়ে পালায় ;
যেও না গো যেও না—রাজকন্তের কিরা,
গাঁয়ের লোকে বলে—আমরা চাই লক্ষ হীরা।
লক্ষহীরা কোথায় পাবে—রাজপুত্তুর ভাবে
হাতী বলে—আমার দাঁতে লক্ষ হীরা পাবে !

—চমৎকার তো !—কেয়া সাড়া দিল আনন্দে !—এ কোথায় শিখলে ভাই মণ্টু ?

—বৌদির কাছে ! বৌদি আরো কতো যে জানে ! বৌদিকে খুব ভাল লাগবে আপনার—দেখবেন !

—কি করে দেখবো ভাই ! উনি কি আসবেন কখনো !

—হুঁ—পুজোর সময় যখন ঘরে আসবে—আমি লিখে দেব, আপনার কাছে একদিন থেকে যাবে !

—তোমার কথা যদি না রাখে ?

—ওঃ, আমার কথা রাখবে না আমার বৌদি ! তাহলে তো…হুঁ—! সীতা ছিল লক্ষ্মণের বৌদি—আমার বৌদি তার থেকে এক চুল কম না—

এক চুল না!—আর কতটা রাস্তা আছে কেয়া দিদি ?

ঐ তো দেখা যাচ্ছে!

—ওঃ, ফুরিয়ে গেল রাস্তাটা! আমি কিন্তু আরো খানিক বেড়াবো ভাই হাতী চড়ে।

—আচ্ছা!

বৌদি-ভক্ত এই দেবরটির দিকে এতক্ষণ তাকিয়ে ছিল কিংশুক। যেভাবে ও ওর দাদা আর বৌদির গুণকীর্ত্তন করছে তাতে কিংশুকের প্ল্যানটা মাটি না হয়ে যায়। ভারী তো দাদা—একটা নগণ্য মাষ্টার! তার আবার বৌ। তিনি আবার এর বৌদি। কাজলকে কখনো দেখেনি কিংশুক—শুনেছে, গ্রাম্য মেয়ে। হবে এই বৌটার মতই একটা জড়পুটলি। কতকগুলো ছড়া শিখে রেখেছে হয়তো। না পারে গাইতে না বা বাজাতে। নাচ তো একটা অশুচি কাজ ওদের কাছে! কেয়া চমৎকার গাইতে পারে। আই, এ, পাশ করেছে, বি, এ, ও পড়বে হয়তো; কেয়া আর সেই বৌদি—ফুঃ। লজ্জা করছে না ঐ ছেলেটার কেয়ার কাছে ঐ সব কথা বলতে!

হাতী মন্দিরের আঙ্গিনায় পৌঁছালো। গত রাতে ডাকাতের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য কেয়া আজ এখানে মা-কালীর পূজা দেবার আয়োজন করেছে। নদীর ওপারের গ্রাম থেকে এবং কেয়াদের গ্রাম থেকেও কয়েকজন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন; আরো অনেকে এখনো এসে পৌঁছান নি। হাতীটা বসতেই মণ্টু লাফ দিয়ে নীচে পড়ল।

আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে আছে। ওদিকে ঠাকুরদাও এসে ওধারের বারান্দায় কয়েকজন মাতব্বরেব সঙ্গে মজলিস জমালেন। মণ্টু তিন লাফে নদীর জলে নেমে হাত পা ধুয়ে এসে বেলপাতা বাছতে লেগে গেল। কেয়া আর সরকারদের বৌটি মন্দিরে গিয়া প্রণাম করল। কিংশুক কোথায় যাবে? ওর আভিজাত্যের অহঙ্কার, ওর পরিপাটি বেশ-ভূষা, ওর

মার্জ্জিত রুচিবোধের মিথ্যাচার ওকে এদের কারো সঙ্গে কথা কইতে মানা করছে যেন। কেয়ার ঠাকুরদার কাছে অবশ্য গিয়ে বসা চলে। কিন্তু ওখানে যত সব বুড়োর আড্ডা। কিংশুক নদীর জলের কাছাকাছি এসে একটা পৈঠায় রুমাল পেতে বসল পা ঝুলিয়ে। কাল রাত্রে শিলাজিত যেখানটায় বসেছিল—লেখার জন্যে চোখের জল ফেলেছিল—আজ ঠিক সেইখানটাতেই কিংশুক বসে লেখার পরম শ্রদ্ধাভাজন অঞ্জনের বিরুদ্ধে কেয়াকে কি কি বলবে--ভাবতে লাগল ! কিন্তু এর কেউ সাক্ষী নেই ঐ পাষাণঘাট ছাড়া ; তবে পাষাণ কথা কয় না।

কেয়া এদিক-ওদিক তদারক করে দেখলো, সব ঠিক আছে। পূজোও আরম্ভ হবে এবার। সন্ধ্যামুখেই পূজো সারা হবে—মানত পূজো—সময়ের কোনো বাঁধা ধরা নেই। কেয়া হঠাৎ দেখতে পেল—কিংশুক চুপচাপ বসে আছে জলের ধারে। হয়তো বোনটির জন্য মনটা ব্যথিত হয়ে রয়েছে ওর। ওর সহোদরা লেখা—হয়তো এই কনে ডোবার ঘাটেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে। কোথায় যে ফেলেছে কেউ জানে না—তবে জনশ্রুতি, সেদিন দু'একজন এই পথে একটী অল্পবয়স্কা ভদ্রবেশী মেয়েকে যেতে দেখেছিল। —কিংশুকের জন্যে মনটা সহানুভূতিতে ভরে উঠলো কেয়ার। ওর উচ্ছ্বাস-প্রবণ বালিকা-হৃদয় লেখাকে ভালবেসেছিল—ঐ কিংশুক সেই লেখার ভাই। লেখার মতন অমন চমৎকার বোনের জন্য কার না দুঃখ হয় ? হয়তো এই ঘাটে লেখার স্মৃতিটা বেশী করে পীড়া দিচ্ছে কিংশুককে। কেয়া ধীরে নেমে এসে বসল কাছে—

—মন খারাপ লাগছে আপনার ?—প্রশ্ন করলো কেয়া। কিংশুক একটু চমকে উঠলো। তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করে বলল—লাগবার কি কথা নয় ? হতভাগী এই ঘাটে এসে জীবন দিয়ে গেছে। আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে একটি মাত্র বোন—কত আদরে ওকে বড় করেছিলাম আমরা……।

কেয়া চুপ করে রইল। এর কি উত্তর সে দেবে? কিই বা বলবে। কিংশুকই আবার বলতে লাগল—চোখ তার সজল—কি দুঃখে সে যে চলে গেল, তা আমি ভালোই বুঝতে পারছি; কিন্তু কি আর বলবো!

লেখা কি দুঃখে আত্মহত্যা করেছে, আজও কেয়ার কাছে তা অজ্ঞাত, রহস্যময়—তাই ব্যগ্র ভাবে শুধালো—কেন? কি দুঃখে! কি কারণে উনি চলে গেলেন? জানেন আপনি?

—জানি বৈকি। আমার মা'র পেটের বোন—আমি জানবো না? কারণটা খুবই স্বাভাবিক আর খুবই মর্ম্মান্তিক। কিন্তু বলে আব কিছু লাভ নেই। প্রতিকারেরও কোনো উপায়ও নেই—কিংশুক সত্যিই জল বার করে ফেললো চোখে! সখের থিয়েটারে নামা ওর অভ্যাস আছে। কেয়া বিব্রত, ব্যাকুল হয়ে বলল—আমি কোনো কাবণ ঘটিয়েছি? বলুন, আপনি বলুন লক্ষ্মীটি!

—না,—না, আপনি কি কাবণ ঘটাবেন! আপনি তো তাকে বাঁচাতেই চেয়েছিলেন। ঐ যে মণ্টুর দাদা—অঞ্জন না খঞ্জন কি নাম, যা কিছু সর্ব্বনাশের কারণ সেই হতভাগা।

কেয়ার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করে গেল। আধ মিনিট নিশ্চুপ থেকে নিঃশ্বাস ফেলে বলল—অঞ্জন বাবু! কেন? কি করেছেন তিনি লেখার! বলতে বাধা আছে কিছু?

হিংস্র আনন্দে কিংশুকের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো এক মুহূর্ত্তের জন্য। তৎক্ষণাৎ করুণ কণ্ঠে বলল না—আজ সে স্বর্গে। এখন আব বাধা কি? তবে এ নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি কবতে চাই না আমরা। মরেই যখন গেল সে, তখন আর তাকে নিয়ে কেন টানা-হ্যাঁচড়া—চুপ হল কিংশুক।

—ব্যাপারটা আমার শুনতে যদি বাধা না থাকে তো অনুগ্রহ করে বলুন আপনি।

—বলতে পারি—যদি প্রতিশ্রুতি দেন, এ নিয়ে আর কোনো রকম

ঘোঁট করবেন না।

—না—দিচ্ছি আমি প্রতিশ্রুতি। আপনি বলুন—বলুন আপনি!

—হ্যাঁ, শুনুন। অনেক দিন আগেই লেখার সঙ্গে ঐ অঞ্জনের আলাপ হয়; কলকাতায়। খুবই মেলামেশা করতো তুজনে; বাড়ীতে নিয়ে আসতো, খাওয়াতো—যেমন সবাই করে। আমাদের আদুরে বোন—কিছুই আমরা বলতাম না—মা-মরা মেয়ে, মনে তার কোনো তুঃখ দিতে চাইতাম না আমরা; অঞ্জনও দেখতে শুনতে ভালো, জাতে ব্রাহ্মণ, লেখাপড়ায় খুবই ভালো; বৃত্তি পেয়েছে বরাবর; আপত্তির কোনো কারণও তো থাকা উচিত নয়। কিন্তু আমরা জানতাম না যে অঞ্জন বিবাহিত। অঞ্জনের স্ত্রী শুধ্ নয়, ছেলে পর্য্যন্ত আছে। অঞ্জন বরাবর সে-কথা গোপন করে ওর সঙ্গে মিশেছিল।

—আচ্ছা, তারপর?

—তারপর যা হয়। হয়তো লেখা তার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু পরে জানা গেল—লেখাকে বিয়ে সে করতে পারে না—তার বৌ আছে—তখন মনের তুঃখে বোনটি আমাদের পশ্চিমে চলে যায়—আপনার সঙ্গে সেখানেই তার দেখা।

কিংশুক থামলো একটু, পরে আবার আরম্ভ করলো—শয়তান একটা! লেখার সর্ব্বনাশ করে এখন সাধু সেজে বসেছেন—ও যে কেমন সাধু, তা আমি ভালোই জানি।

কেয়া এখনো চুপ করে আছে। কথাগুলো কি বিশ্বাস করছে না কেয়া? কিংশুক চোখ তুলে তাকালো। নাঃ, কিছু বোঝা যায় না। আবার বলল—ওর দেহ অশুচি হয়েছিল নিশ্চয়—এই অঞ্জনের দ্বারাই, তাই এখানকার এই বংশে ঢুকতে পারলো না সে, এ ছাড়া আত্মহত্যা করবার আর কি কারণ থাকতে পারে? অঞ্জন তাই এলো না এখানে। আসবে কোন্ লজ্জায়?

উঃ, মানুষ এমন কুটিল হতে পারে, এমন হিংস্র হতে পারে, এতখানি শয়তান হতে পারে? জানতো না কেয়ার সরল মন। এই পবিত্র মন্দিরের পাদপীঠতলে—এই যেখানে লেখা হয়তো আত্মবিসর্জ্জন করেছে, সেইখানে বসে যে-কথা কিংশুক জানালো কেয়াকে—কেয়া সেটা কেমন করে বিশ্বাস করবে! মনে পড়ল লেখার সেই পরিচয় করিয়ে দেয়া—কেয়াকে দেখিয়ে—"এইটি আমার মেয়ে দাদা—কেয়া প্রণাম করো…।" মনে পড়লো লেখা বলেছিল—"ঐ দাদার স্নেহ-বৃন্তেই আমি আজো ফুটে আছি—ওর থেকে বড়ো সম্পদ আর আমার নেই—" মনে পড়ল, সেই আয়ত তুটি চোখে অঞ্জন প্ল্যাটফর্ম্মে তাকিয়ে আছে—গাড়ীর জানালায় তাকিয়ে আছে লেখা—সেই চোখের জলে-ভেসে-যাওয়া লেখার চকচকে গাল! "আমার দাদা—আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন—যদি কোথাও না আশ্রয় পাই, তোমার তুয়ার নিশ্চয় খোলা থাকবে, আমি জানি।" অঞ্জন সম্বন্ধে একথা লেখার নিজের মুখের কথা। এর পরে অঞ্জনের বিরুদ্ধে এমন কুৎসিত অভিযোগ কোন মুখে জানায় এই লোকটা! কেবল স্বার্থের সিদ্ধির জন্য এ এতগুলো মিথ্যে কথা বলল? অঞ্জনের সেই দীর্ঘায়ত পবিত্র মূর্ত্তি, সেই ধীর চলন ভঙ্গিমা—সেই সস্নেহ আশীর্ব্বাদ—"মনের মত বর হোক—" মনে পড়ল না-না, অঞ্জনকে কলঙ্কিত করবার মূঢ়তা এর বরদাস্ত করবে না কেয়া! ও উঠে পড়ল!

—যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ—দেখি। ঠাকুর পুজোয় বসেছেন—কেয়া উঠে চলে এল পুজোর কাছে। মন্দিরের মধ্যে ও যেন পালিয়ে আসতে চাইছে, ঐ লোকটার কাছে থেকে লুকুতে চাইছে। ও অতিথি—নইলে কেয়া ওকে বার করে দিত বাড়ী থেকে এখনি। উত্তেজনায় নীল হয়ে উঠলো কেয়া। ঐ লোকটা সেই মাধুর্য্যময়ী লেখার দাদা? আপন সহোদর ভাই? না সৎ ভাই, নাকি শত্রু! ধিক!

কিন্তু লেখার মৃত্যুর একটা কারণও নিশ্চয় আছে। কি কারণ? কিসের জন্য সে এত আদর যত্ন উপেক্ষা করে চলে গেল? সেটা যদি আর কেউ না জানে, অঞ্জন নিশ্চয় জানে। লেখা ওর কাছে কোনো কথা গোপন করে নি নিশ্চয়। ভালো—কেয়া অঞ্জনকেই শুধুবে। তার নামের পরে এই অভিযোগ অঞ্জন যেন খণ্ডন করে।

কিংশুক দেখলো, কেয়া খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কাজ ঠিক হয়ে গেছে। অঞ্জনের নামও আর করবে না কেয়া কখনো। কিংশুক তার বুদ্ধিকে বারম্বার ধন্যবাদ জানাচ্ছে। বেশ একখানা প্ল্যান মাথায় গজিয়েছে তার। শিলাজিতের সমস্ত দোষটা অঞ্জনের ঘাড়ে চড়িয়ে দিল সে। চমৎকার হয়েছে। কিংশুক উঠে এল মন্দিরে। কেয়া ওকে দেখে ঘাড় নুইয়ে ধান-দুর্ব্বার স্বস্তিক সাজাচ্ছে।

আকাশে মেঘটা জমাট হয়ে এল, বৃষ্টি হবে হয়তো। মণ্ট দীর্ঘ দিন বাংলা ছেড়ে ছিল, বৃষ্টি দেখে নি—আনন্দে ও গান ধরে দিল কলকণ্ঠে :—

বর্ষা এসো, বৃষ্টি এসো ঘাসের ফুল,
তোমার তরে রাজকন্যে বাঁধেন নাকো চুল।
বান এসো ভাসান্ এসো, এসো ব্যাঙের ডাক্,
তোমার তরে রাজকন্যে বাজান্ নাকো শাঁখ।
বাজ এসো, বিজ্‌লী এসো, এসো জলের ছাঁট,
তোমার তরে রাজকন্যের শুকনো হোল ঘাট।

—বিষ্টি এলে বাড়ী যাবে কি করে? কেয়া হেসে শুধুলো ওকে
—যাবো না! কি তার বয়ে গেছে!

উঁহু—কেয়া তো মণ্টুর সঙ্গে তেমনি হেসে কথা কইছে। কিংশুকের কথাগুলোয় কি ফল হোল তাহলে! বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়ল ও। কেয়া যদি তার কথা বিশ্বাস না করেছে, তাহলে ইহ জীবনের মত কেয়ার আশা তাকে ছাড়তে হবে! বাইরে এসে ও মেঘের দিকে তাকালো।

অঞ্জন হয়তো তখন সেই পাহাড় আর বনে কাজলকে নিয়ে খেলা করছে—হয়তো সেই সেখানকার মেঘটাই এখানে এসে বর্ষণ সুরু করলো, আর অঞ্জনের চরিত্রের অপবাদটাকে ধারায় ধারায় ধুয়ে দিতে চাইল।—কে জানে, ঈশ্বরের কি অভিপ্রায়!

১০

এক ট্রেনেই আসছে শিলাজিত আর সেই শ্রমিক নেতা। একই কামরায় ইচ্ছে করেই উঠেছিল শিলাজিত। গাড়ীতেও সেই এক কথা—'কাগজে রিপোর্ট যেন ভালভাবে বের হয়—আর ছবিটাও!' শুনতে শুনতে শিলাজিত ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠছে। দেশসেবার নামে এই ভণ্ডামী অসহ্য। ওরা বলাবলি করছে—"একখানা নিজেদের কাগজ অবিলম্বে বার করা উচিত, নইলে প্রপাগেণ্ডার জোর হয় না। দেখুন-না দুদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কাগজ চালাবার খরচ? তার জন্যে ভাবনা কি—সে আসবে ঐ গৌরীসেনদের টাকা থেকে!"

চমৎকার দেশ-সেবা! শিলাজিতকে ওরা বাঙালী বলে বুঝতে পারে নি—পশ্চিমা সাধু মনে করেছে—তাই বাংলা কথায় দিব্যি আলাপ জমাচ্ছে! এই রকম দেশসেবক আরো কতগুলি ভারতে আছে? আরো অনেক আছে। এমন মীরজাফর—উমিচাঁদ না থাকলে আর এত দুর্দশা কিসের? আরো দুচারজন লোকের কথা শুনেছে শিলাজিত যারা এখন বেশ মোটা রকম টাকা আয় করছেন এই সব কাজে হাত পাকিয়ে। কেই-বা করছে না! প্রায় সবাই তো বেশ গুছিয়ে নিল এই পথে এসে। বোকা যারা—তারাই জেল খেটে মরে। শিলাজিত একজনকে জানে—সে বার দুই-তিন কংগ্রেসের হয়ে পিকেটিং ইত্যাদি করে এখন জেলার ডিষ্ট্রীক-বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়েছে।

'কিন্তু দেশবন্ধু সর্বস্ব দিয়ে গেলেন—দেশপ্রিয় দেহত্যাগ করলেন—তা'

অমন নিষ্ঠাবান সেবক কটাই বা জন্মায়? একটা দুটোও তো জন্মায়। উমীচাঁদ—মীরজাফরের মধ্যে মোহনলালও থাকে—এই আশার কথা। নাহলে দেশসেবার নাম করে টাকা রোজগার আর নাম খাতির—ও তো চমৎকার ব্যবসা একটা! কিন্তু ওর চেয়ে চুরি ডাকাতি কেন করে না ওরা? —পাপ কম হোত! নাঃ, এ পথ শিলাজিতের নয়।

কেন নয়? শিলাজিতের ধনবল আছে, জনবলও সংগ্রহ করা যেতে পারে—কেন সে একজন নিষ্ঠাবান দেশসেবক হতে পারবে না? দেশবন্ধু, দেশপ্রিয় না হোক, একজন দেশভক্ত তো হতে পারে। কে না ভালোবাসে তার স্বদেশের মাটিকে! য়ুরোপে এই বিরাট যুদ্ধ চলছে শুধু স্বদেশের এক টুকরো মাটির জন্যই তো। এই যে দিনে দিনে হাজার হাজার লোক ক্ষয় হচ্ছে—এর মূল কারণ তো তাদের দেশমাতার সম্মান রক্ষা। স্বদেশের মাটিকে পরপদ-লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত রাখা। দেশকে কে না ভালবাসে! মনে পড়ল মহামানবের সেই কথাটির অগ্নি-জ্বালা :—

"স্বদেশকে ভালোবাসা যদি পাপ হয় তবে সর্ব্বাগ্রে আমি পাপী" কি অসাধারণ শক্তির আর সাহসের কথা! এই নিষ্ঠাবান পুরুষ সিংহরা যে দেশে জন্মেছেন সেই দেশে আবার এই সব নেতাও জন্মায়—ধিক্! শিলাজিত বাইরের দিকে মুখ বাড়ালো!

পরাধীন দেশের মানুষ এই ভারতবাসী। দুঃখ-বেদনা-অভাব-দুর্ভিক্ষ নিয়ে কোনো রকমে বেঁচে আছে। আর কয়েকটা চতুর লোক এই নিরীহ নির্ব্বোধ লোকগুলোর মাথায় কাঁঠাল ভেঙে বেশ আরামে চরে খাচ্ছে। কেউ হয় কংগ্রেসী, কেউ হিন্দু মহাসভা, কেউ বা সাম্যবাদী, শ্রমিকবন্ধু, সমাজসেবক—আসলে এরা সবাই চায়, কি করে তার নামের ঢাকখানা জোরে বাজে আর কি উপায়ে দুপয়সা ঘরে আসে! সরকার দু'একবার জেল ঘুরিয়ে দিলে ওরা পরমানন্দে বড় বড় স্বদেশী চাকরীর উমেদারী করতে পারে—নয়তো ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী হয়ে স্বদেশী জিনিষের

দোকান খোলে কিম্বা ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দীদের সার্টিফিকেট নিয়ে আর একটা নতুন দল খাড়া করবার চেষ্টা করে! কতজনকে এরকম করতে দেখেছে শিলাজিত—বেশীর ভাগই তো এই রকম। নৈতিক শৈথিল্যে নরকের প্রায় কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছে এবা—এরা করবে দেশোদ্ধার? না—তার থেকে অঞ্জনের ঐ আশ্রম, ঐ মানুষ তৈরী করবার মন্ত্র, ও ঢেব ভালো। কিন্তু অঞ্জনের কাছে যাবে না শিলাজিত। যাবে না, কারণ, কাজলের চোখে সে ছোট হয়ে আছে। যদি—যদি কোনো দিন শিলাজিত তার সঙ্গে দেখা কবাব যোগ্য যতে পারে—তাহলে যাবে। কিন্তু কিসের জোরে হবে? কে তাকে সাহায্য করবে? অঞ্জনের আছে কাজল; আর শিলাজিতের!

ওর বক্ষ বিদীর্ণ করে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। দেশসেবার কথায় কতো যেন উত্তেজিত হয়ে উঠতো লেখা। এমন এমন সব কথা বলতো, যা শুনে মনে হোত, এখনি ও হয়তো স্বদেশী-আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। সে যদি থাকতো আজ! নাঃ, সে থাকলে শিলাজিত এ সব কথা ভাবতো না এমন করে। বিলাসের স্রোতে ভেসে যেতো শিলাজিত! লেখা তাকে মুক্তি দিয়ে গেছে। ভালই কবেছে। শিলাজিত মুক্ত আজ—আর তার কোনো বন্ধন নেই। কারো জন্যে ভাবতে হবে না। শিলাজিত অবাধে দেশের কাজ করতে পারবে। অনায়াসে জেল খাটতে পারবে—প্রয়োজন হলে মৃত্যু বরণ করে নিতে পারবে।

গাড়ীটা ষ্টেশনে থামলো। নেতাজি তিন আনায় একটা ডাব কিনে খেলেন। আছেন বেশ—পয়সার তো অভাব নাই—শ্রমিকদের তহবিল থেকেই আসবে দিব্যি! ভাবনা কিসের। হ্যাঁ—এই সাম্যবাদ! এটা কি বস্তু? রাশিয়া থেকে অল্প কিছুদিন হোল এর আমদানী হয়েছে—আর খুব জোর চলেছে! ইদানিং যে ক'খানা বাংলা বই পড়লে, শিলাজিত, সব এই সাম্যবাদে ঠাসা। কিন্তু এ জিনিষ ভারতবর্ষে কি

করে চলতে পারে, কেউ কি ভেবে দেখেছে? ভেবে দেখেছে, কি, যে, সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সাম্যবাদ দাঁড়াতে পারে না। ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশে এই শ্রমিক আন্দোলনের এত ব্যাপকতা কেন? শ্রমিকদের জন্য সরকার আইন করে দেবেন যাতে মালিকরা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য ঠিকমত দিতে বাধ্য হয়। না দিলে সরকার থেকে শাস্তি হবে মালিকদের—এ আইন না থাকলে এই আন্দোলনের কি মানে হয়? কয়েকদিন ধর্ম্মঘট করে খিদে সহ্য করা, তারপব আবার কাজে যোগ দিয়ে পুনর্মূষিক হওয়া—এই তো! এই-ই হয় এখানে। রাশিয়ায় যা হওয়া সম্ভব হয়েছে, ভারতে তার স্বপ্ন দেখা যায়—কাজে করা চলে কী? এতে শুধু সুযোগ হয়ে যাচ্ছে কয়েকজন লোকের! আর কি!

গাড়ী ছাড়লো! আর বেশী দেরী নাই; কলকাতার কাছাকাছি এসে পড়েছে শিলাজিত। আজকার দিনটা ও বাড়ী ফিরে বিশ্রাম করবে, তারপর কাল থেকে বেরুবে কাজের খোঁজে। আর যদি কাজ পায় তো আজ থেকেই। কিন্তু কাজ কি সত্যি পাবে ও? নানা দলে বিভক্ত এই ভারতবর্ষ, এর উপর আবার দেশীয় রাজ্যের আর একদল আছেন। জেলায় জেলায় এখানে রেষারেষি, প্রদেশে প্রদেশে ঠোকা-ঠুকি—দলে দলে মতবাদ নিয়ে মনান্তর! এত রকম দল থাকলে কোন্ দলের কথা কে শুনবে? তার চেয়ে সরকার যদি সব দলকে নিশ্চিহ্ন করে দেন তো বরং একরকম হয়, কিন্তু সরকার তা করবেন কেন? হায় দ্বিজেন্দ্রলাল—তুমি না বলেছিলে—

"ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মেলিল নেত্র;
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এশিয়ার তুমি তীর্থ ক্ষেত্র!"

হায় তীর্থক্ষেত্র! দ্বিজেন্দ্রলালের "স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা—" ঐ স্বপ্নেই থাক—ঐ স্মৃতির মধ্যেই রইল।

কিন্তু নিরাশ হলে তো চলবে না! এই বিরাট ব্যাপক যুদ্ধ চলেছে—এর

পরে একটা পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এর দূর-প্রসারী ফল ফলবেই একদিন। তখন? তখনো কি ভারত পরাধীন থাকবে? শিলাজিতের চিন্তার গতি বাঁক ফিরলো। নাঃ ভারত তার স্বাধীনতা নিশ্চয় অর্জ্জন করবে—করবেই—হোক তা দেরীতে—থাক এই সব ময়ূরপুচ্ছধারী স্বদেশ-সেবক দাঁড়কাকের দল—সত্যিকার ময়ূরও জন্মেছে অনেক, জন্মাবেও অনেক। তাদের কঠোর চঞ্চুর আঘাতে একদিন এই নাগপাশ বন্ধন থেকে নিশ্চয় মুক্ত হবেন ভারতমাতা। হোক সেদিন দূরে—তবু আসবে সেদিন, আসিবেই, কিন্তু শিলাজিতকে সেই পথের দু'কোদাল মাটিও অন্ততঃ কেটে যেতে হবে, দুটো গাছ অন্ততঃ উপড়ে যেতে হবে, দুখানা পাথর অন্ততঃ সরিয়ে দিয়ে যেতে হবে।

গাড়ী ষ্টেশনে ঢুকলো। নেমেই শিলাজিত একখানা খবরের কাগজ কিনলো। আজ দু-তিনদিন ও খবরের কাগজ পড়েনি। একখানা ট্যাক্সিতে বসে পড়ছে কাগজখানা।

এই আবার একটা দল খাড়া হোল—পড়তে লাগল শিলাজিত—মোটা মোটা অক্ষরে হেডিং দেওয়া "মহাজাতি সংঘ'—কোথায় আবার মহাজাতি সঙ্ঘ গড়ে উঠলো! খবর তো জানা নেই শিলাজিতের।

"গত কাল সন্ধ্যা সাতটায় বোম্বাইএর একটি বিরাট জনসভায় মহাজাতিসঙ্ঘের নেত্রী শ্রীযুক্তা চন্দ্রিকা দেবীকে অভিনন্দিত করা হয়। সভায় লোকসংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে তিল ধারণের স্থান ছিল না—" সব সভাতেই ও রকম হয়—ভাবতে লাগল শিলাজিত—বিশেষ যখন মহিলা নেত্রী, দেখতেও সুন্দর হয়তো—পড়ে চললো—"কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির পর সভানেত্রী মহোদয়া তাঁহার অনুপম ওজস্বিনী ভাষায় যে বাণী পাঠ করেন—তাহা সকলেরই মর্ম্ম স্পর্শ করে।" তিনি বলেন—"এই বিশাল ভারতভূমিকে ঐতিহাসিক যুগে একমাত্র চন্দ্রগুপ্ত, অশোক ইত্যাদি কয়েকজন একত্র করেছিলেন—তাঁদের তিরোধানের পর থেকে

এই পবিত্র দেবভূমি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে, বিচ্ছিন্ন হয়ে, দুর্ব্বল হয়ে কোন রকমে টিকে আছে। ব্যক্তিগত প্রথাবিরোধ, দলগত বৈষম্য, ধর্ম্মগত বিভেদ তার সঙ্গে স্বগঠিত রাজনৈতিক মতবিবাদ ভারতকে বন্দীত্বের সুদৃঢ় শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছে কোন স্মরণাতীত যুগ থেকে! ভারত যে এই মাত্র কয় বৎসর ইংরেজের অধীন হয়েছে, তা নয়—ভারত বহুদিন থেকে পরাধীন। মাঝে অবশ্য দু একটা প্রদেশ স্বাধীন হয়েছে, আবার পরাধীনতার শৃঙ্খল পরতে বাধ্য হয়েছে। এর কারণ—ভারতের বহু বিচ্ছিন্নতা। এই বিচ্ছিন্নতাকে একত্র করবার সাধনা কেউ যদি করেন তবে তিনিই হবেন ভারতের প্রকৃত উদ্ধার কর্ত্তা।"

শিলাজিত তো এমনি সব কথাই ভাবছিল···আরো মনোযোগ দিয়া পড়তে লাগল শিলাজিত—"ভারতে বহু ধর্ম্ম, বহু জাতি, বহু সমাজ—কিন্তু তারা সবাই এই ভারতের পুত্রকন্যা—সবাই তারা ভারতীয়। তাই আমি বলতে চাই, আমাদের এই মহাজাতি সঙ্ঘে একটি মাত্র জাতি থাকবে—সে জাতি ভারতীয়। একটি মাত্র ধর্ম্ম থাকবে, ভারতের সেবা—একটি মাত্র দেবতা থাকবেন—ভারত-মাতা। একটি মাত্র কর্ত্তব্য থাকবে—ভারতকে উন্নত করা—একটি মাত্র চিন্তা থাকবে ভারতের কল্যাণে মৃত্যু—আর সে মৃত্যু এই ভারতের উদার মাটিতে! যদি সে হিন্দু হয় তবে তার চিতাধূম থাকবে আকাশের কোলে, আর যদি সে মুসলমান কি খৃষ্টান হয়, তার দেহ থাকবে মাতা ভারতের মাটির বুকে। এই হবে পণ, এই হবে ধ্যান আর এই হবে ধর্ম্ম। বন্ধুগণ—কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা, মুসলিম লীগ, পাকিস্তান—হরিজন—ইত্যাদি হাজার রকম দলের নাম মুখস্থ না করে এই একটা নাম আপনারা মনে রাখুন—আমরা ভারতীয়। হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান এখানে সবাই ভারতমাতার সন্তান—সবাই ভারতের সেবক—সকলেই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিক—। এখানে সবাই এক জাতি,

এক ধর্ম্ম, এক কর্ম্ম! বন্ধুগণ, দীর্ঘ, দীর্ঘ দিন হোল—আমরা পরাধীন থেকে স্বাধীনতার স্বাদ ভুলে গেছি, তাই এত দলাদলি আর ভেদা-ভেদীর মধ্যে আমাদের বন্দীত্বেরই বনেদকেই শক্ত করে তুলছি! তাই তুচ্ছ চাকরীর মোহে দেশকে প্রতারিত করতে পিছোই না, তাই আমরা প্রবঞ্চক আর কাপুরুষ হয়ে রয়েছি! এই দলগত বৈষম্যের সুযোগ সুবিধার মধেই আমাদের বাধা আরো দৃঢ় হচ্ছে—এ আর কে না জানে। কিন্তু না—আমাদের এ জড়তা, এই কাপুরুষতাকে ধ্বংস করবার দিন এসেছে! আপন আপন দলের স্বার্থ দেখিয়ে নিজের কোলে ঝোল টানার চেষ্টা বহুদিন ধরে বহু ব্যক্তিই করে এসেছেন, এবার ওঁদের দিন কেটে গেছে! এবার আমাদের দিন—আমরা, যারা নতুন ভাবে ভাবতে শিখেছি, যারা নতুন কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ হতে পারবো, যারা নতুন মন্ত্রে দীক্ষা দিতে পারবে দেশবাসীকে! এসো—তারা সবাই এই এক মন্ত্রে দীক্ষিত হও—আমরা ভারতীয়!"

শিলাজিতের ট্যাক্সি বাড়ীর কাছে পৌছালো। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকলো ও—কাগজখানা একটা টিপয়ের উপর ফেলে রেখে বাথরুমে ঢুকলো গিয়ে স্নান করতে! বিস্তর নোংরা বোঝাই হয়ে আছে গায়ে—শিলাজিত এ সবে অভ্যস্ত নয়; গা ঘিন ঘিন করছে ওর। ঐ সব নোংরা জায়গা—মন্দিরের ধুলো—রাস্তার আবর্জ্জনা—মিটিংএর সাঁওতাল আর বাউরীদের কাপড়ের দুর্গন্ধ—শিলাজিত খুব ভালো করে স্নান করবার জন্ত জামা-কাপড় সব খুলে নিজের নির্জ্জন স্নানাগারের কল ছেড়ে দিল। স্নানাগারটা চিন্তা করবার একটা ভালো জায়গা। যে কোনো গভীর চিন্তা, যে কোনো সাংঘাতিক ভাবনা বাথরুমে বসে ভাবা যেতে পারে। কেউ ডাকবে না—কেউ দেখবে না, কেউ কোনো রকম চিত্তবিক্ষোভ ঘটাতে আসবে না। চিন্তায় এতো প্রগাঢ় মনোসংযোগ আর কোথাও হয় না। বাথরুম সত্যি একটা ভালো

থায়গা ; পাঠাগারের থেকেও ভালো !

শিলাজিত আরামে স্নান করছে আর চিন্তা করছে। কাগজটা বাইরে রেখে না এলে এইখানে বসেই পড়া চলতো—নিয়ে আসবে নাকি গিয়ে ? থাক, কে আবার কাপড় পরে বাইরে বেরুতে যাচ্ছে। শিলাজিত সর্ব্বাঙ্গ মুক্ত করে স্নানের আয়োজন করছে আর ভাবছে! বর্ত্তমানে ও যেন প্রকৃতির শিশু, কোথাও ওর কোনো আবরণ নেই, কোনো আচ্ছাদন নেই! দেহে যেমন কোনো কিছুর আবরণ নেই—মনেও তেমনি থাকবে না, থাকতে দেবে না শিলাজিত! দেহমন একসঙ্গে সুস্থ, সুন্দর, মুক্ত করে দেবে সে। একটা সরলতম নিষ্ঠায়—ঠিক মা'র কাছে কথা-না-শেখা শিশু যেমন নিষ্ঠাবান, ঠিক তেমনি সহজ নিষ্ঠায় শিলাজিত তার কর্ম্মপদ্ধতির পথ ধরে চলবে। কোনো গোপনত্বের আশ্রয় নেবে না, কোনো ছলনার মুখোস পরবে না—কোনো ছদ্মবেশ ধরবে না! শিলাজিত কোন্ কর্ম্মে নিজেকে নিয়োজিত করবে, তাই এখন ঠিক করা দরকার। রাজনীতি খুবই ভাল জিনিষ, কিন্তু বড্ড বেশি প্রলোভন ও-পথে। রাজনীতিতে একটু সাফল্য অর্জ্জন করতে পারলেই দুদিনও দেরী লাগবে না—তোমাকে মাথায় তুলে নাচবে দেশের লোক। বড় বড় খেতাব, লম্বা লম্বা জয়গান, চওড়া চওড়া দু'কলমে সাজিয়ে বক্স করে খবরের কাগজের ঠিক মাঝখানে ছাপা বাণী হু-হু করে বেরিয়ে যাবে। তারপর আসবে 'তার', আসবে মানপত্র, আসবে টাকার তোড়া—আসবে নানারকম সভায় যোগ দেবার আহ্বান, নানা সমস্যার সমাধান সাধনের জন্য দেশে বিদেশে প্রতিনিধি হবার প্রস্তাব—কত কি। এসব হতে মোটে দেরী লাগে না। আরো আছে—দেশনায়ক, মহাপ্রাণ, মহাত্মা ইত্যাদি হয়ে একেবারে নিজেকে উচ্ছয়ে দেবার পথ প্রশস্ত করা। এতো প্রলোভন জয় করা মানুষের প্রায় অসাধ্য !

ধর্ম্মনীতিতে গেলে কেমন হয়? ওরে বাপরে! ও জিনিষ আরও ভয়ঙ্কর। সদ্য সদ্য দেবতা বানিয়ে দেবে শিলাজিতকে ওরা। ফুলজল দিয়ে পূজো করেই শুধু ছাড়বে না—ধূপ দিয়ে, শাখ-ঘণ্টা বাজিয়ে আরতি করেও ক্ষান্ত হবে না—হাজার রকম বিভূতির মিথ্যা কথা রটিয়ে পায়ের ধুলো দেবার কাকুতি করে শিলাজিতকেও ভাবতে বাধ্য করবে যে সে দেবতাই! এতো বেশি অধঃপতন আর কিছুতে হয় না—যতখানি হয় ঐ ধর্ম্মনীতিতে! ও পথ ভয়ঙ্কর পথ!

সমাজনীতি? না, সমাজের কোন কিছু করতে পারবে না শিলাজিত। সমাজ যে দেশে আছে সে দেশে তার নীতি থাকতে পারে—এখানে সমাজ কৈ। কতকগুলো গোঁড়ামী আর কতকগুলো উচ্ছৃঙ্খলতা। গোঁড়া যারা তারা মেয়েদের কোঁচানো কাপড় পরা অবস্থায় জুতো পরে কারো সঙ্গে বেরুতে দেখলেই ভাববে—গেল, গেছে উচ্ছন্নে। আর উচ্ছৃঙ্খল যারা তাদের কোনো নীতি নাই, কোনো ধর্ম্মের বালাই নাই, রাত দুপুরে দাদার বন্ধুর কোল ঘেঁসে কাফেতে কফির বদলে বিয়ার খেতে ওদের কিছুমাত্র বাধে না! সতীত্বকে স্বীকার করে না ওরা; অবাধ বিহারকে ওরা উন্নতির সোপান বলে মনে করে। এর মাঝখানে আর একটা দল আছে, যারা দরিদ্র ভদ্র-শিক্ষিত। সংখ্যায় তারা অনেক—কিন্তু ওরা গরীব! গোঁড়ামী ওরা করতে চায় না—উচ্ছৃঙ্খলতাও পছন্দ করে না—কিন্তু এর মাঝামাঝি কিছু করবার শক্তিও ওদের নেই! সহুরে বিলাসিতায় পল্লী ছেয়ে যাচ্ছে—ওরা চোখবুজে নিরুপায় হয়ে সেই স্রোতে ওদের বৌদের, বোনদের, মেয়েদের ভেসে যেতে দিতে বাধ্য হচ্ছে! আর দেরী নাই! সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতাটাই জোরালো হয়ে উঠেছে—কারণ এইটাই অধিক লোভনীয় এবং বর্ত্তমানে এই ধুয়া ধরেই চলছে সমাজ!

তাহলে আর কি বাকি রইল? যুদ্ধোত্তর ভারতের পুনর্গঠন? ভারতকে নৈতিক নিষ্ঠায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা—ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি

সভ্যতাকে পুনরায় জাগরিত করা? হ্যাঁ, কিন্তু অঞ্জন ঐ কাজটাই করছে। ও কাজ করতে গেলে শিলাজিতকে যেতে হয় অঞ্জনের সঙ্গে যোগ দিতে, না—অন্য কিছু একটা খুঁজে নেবে শিলাজিত! কত রকমের কাজ করবার আছে—সে কি একটা মনের মত খুঁজে নিতে পারবে না!

সে শিল্পী; শিল্পের ভেতর দিয়ে সভ্যতা আর সংস্কৃতি গড়ে তোলা যায়—কিন্তু সে যায় স্বাধীন চিত্তবৃত্তির দেশে। এখানে তার অর্থ কাঁঠালের আমসত্ব খাওয়া! এদেশে সাহিত্যও যেমন শিল্পও তেমনি জলো—জলো সব! কয়েকটা সস্তা রাজনৈতিক প্যাঁচ ঝেড়ে, না হয় প্রাচীন ভারতের কতকগুলো ঐতিহ্যের উল্লেখ করে হা হুতাশ লাগিয়ে সাহিত্যও হয়না, শিল্পও চলে না। দেশটাকে "এফিমিনেট" করে দিয়েছে যেন। পুরুষগুলো নারী হয়ে গেছে আর নারীরা হচ্ছে পুরুষ! কয়েক বছর থেকে দেখছে শিলাজিত, এই গরম দেশে অনেক বয়স পর্য্যন্ত বিয়ে না হওয়ার জন্য, আর পূর্ণ যৌবন-বয়সেও কিশোরী-কুমারী মেয়েদের মত চাঞ্চল্য বজায় রাখতে গিয়ে আজকালকার মেয়েগুলোর গোঁফ গজায়। নাকের নীচে একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়—সেখানকার লোমগুলো বেশ বড়। দু'একটা মেয়ের রীতিমত গোঁফই গজাতে দেখেছে শিলাজিত! কিন্তু এ সব কথা বললে ওকে সবাই গাল দেবে। নারী চিরদিনই শ্রদ্ধেয়া। কিন্তু নারী তারা থাকলে তবে তো শ্রদ্ধা করা যেতে পারে। তারা যে সব পুরুষের ডাইনে যাচ্ছে! আর পুরুষগুলো করছে কি! দাড়ি গোঁফ মুড়িয়ে—ঢিলে পাঞ্জাবী আর চাদর লেপ্টে রঙিন নাগরা পরে ঠিক মেয়েদের মত হয়ে উঠেছে। চুলও কেউ আবার লম্বা করে রাখে! কোনো দেশের পুরুষদের মধ্যে এতখানি মেয়েলিপনা দেখা যায় না আর।

কিন্তু এত সব ভাবনার তো কোনো দরকার নাই শিলাজিতের! ও একটা করবার মত কাজ চায়—তা সে যাই হোক—যতটুকু উপকারই

হোক দেশের। শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমেই যাবে নাকি শেষটায়! দুর্ ছাই কি জন্য যাবে! তিনি যে কি করছেন, আজও জানা গেল না! ওখানে কেন!

ভেবে কিছুই স্থির করতে পারছে না শিলাজিত! আবোল তাবোল ভাবনায় কোনো লাভ নেই! একটা কিছু ঠিক করে ফেলতে হবে! ঐ যে কাগজে পড়ল—মহা জাতিসঙ্ঘ—দেখা যাক না ওটা কি বস্তু। কী ওদের কর্ম্মধারা আর কতখানি নিষ্ঠায় ওরা এগুচ্ছে! দেখলে কেমন হয়!

"টিক—টিক—টিক"—দেওয়ালে একটা টিকটিকি শব্দ করলো। শিলাজিত কোনো কালে হাঁচি টিকটিকি মানে না—কিন্তু আজ যেন মনটা ওর বড় দুর্ব্বল হয়ে গেছে। বাপ্‌পিতামহের রক্তটা যেন কোথায় চঞ্চল হয়ে উঠলো। হ্যাঁ ঠিকই। ঐটাই দেখা যাক নেড়ে চেড়ে, শিলাজিত ঠিক করলো, কালই বোম্বাই যাবে ঐ মহাজাতিসঙ্ঘের নেত্রীর সঙ্গে দেখা করতে!

১১

স্নান সেরে শিলাজিত বাইরে এসে চা খেতে বসল। এখনো খানিকটা বেলা আছে। আজ রবিবার। ওর বাড়ীর কাছেই একটা ছোটমত পার্ক—ছেলেমেয়েরা খেলা করে। কিন্তু শিলাজিত দেখতে পেল, ওখানে কিসের একটা সভা হবে। প্ল্যাটফর্ম্ম বাঁধা হয়েছে—লাউডস্পিকার বসানো হচ্ছে—বেশ সোরগোল। কিসের মিটিং হবে? শিলাজিত কাকে শুধোবে? ওর বোনেরা কেউ বাড়ী নেই—শ্বশুরবাড়ীতে। ওর চাকরগুলো উড়ে আর পশ্চিমা! দোতালার বারান্দা থেকেই শিলাজিত দেখতে পেল—মিটিংটা একটা রাজনৈতিক দলের! একদলের সঙ্গে অন্যদলের কি একটা বিষয়ে মীমাংসা হবার কথা হচ্ছে—এদের দলের মত কেউ চায় নি—তাই প্রতিবাদ করবেন এঁরা সভা করে। চমৎকার! জিতবাটের

কথা চুলোয় গেল—এঁরা এখন কালনেমীর লঙ্কা ভাগ করছেন। কেইবা করছেন না! ঐ রকম করে কি কিছু মীমাংসা হবে মনে করেন আপনারা? ততদিন হবে না যতদিন সরকার কোনো মীমাংসা করে না দেন। হবে না—হতে পারে না! আবার এই যে বড়সভা—এরা আর একটা নতুন ধুয়ো—হিন্দুস্থান বা ঐ রকম কিছু না তুললে হয়। তুলবেনই তো! ঐ ধুয়ো তুলেই তো দলের অস্তিত্ব রক্ষা করেন! হায় মা ভারত! তোমার ছেলেরাই তোমাকে কেটে কুটে রান্না করে খাবে—আর কারো দরকার হবে না। এই চল্লিশ কোটি লোকের খাওয়ার পক্ষে তোমার মাংস এমন কিছু বেশি নয়।—শিলাজিত একটা নিশ্বাস ফেললো!

সভা আরম্ভ হয়ে গেছে! লাউডস্পীকারের জোরালো আওয়াজ কাণে আসছে শিলাজিতের। বক্তা তেজস্বী ভাষায় বলছেন—যেমন বলে থাকেন তিনি বহুস্থানেই! লোকও তো বিস্তর হয়েছে শোনবার জন্য! ঐখানে একটা বক্তৃতা দিলে কেমন হয়! শিলাজিত হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ল! সেই খবরের কাগজটা নিয়ে গটগট করে গিয়ে উঠল একেবারে প্ল্যাটফর্মে—সভাপতির কাছে! ওকে কেউ চেনে না এরা! কিন্তু ওর চেহারা সুন্দর—আর সারা মুখে বুদ্ধির দীপ্তি! একটাও খালি চেয়ার না পেয়ে ও অতি সাবধানে সভাপতির কাছে এসে ফিশ ফিশ করে বলল—শুনুন মশাই, আমার কিছু বলবার আছে—আমার নাম শিলাজিত সেন—অনুগ্রহ করে যদি অনুমতি দেন …।

সভাপতি নামটা টুকে নিয়ে ওকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। শিলাজিত একপাশে দাঁড়িয়েই থাকলো! জন দুইতিন বক্তার বলার পর শিলাজিতের নাম করলেন সভাপতি। শিলাজিত সবিনয় নমস্কারান্তে আরম্ভ করলো!—

"আমার প্রিয় বন্ধুগণ, আমার ভারতমাতার পুত্রকন্যারা আমার প্রিয়তম ভাইবোন সব—আমি একটি মাত্র ছোট কথা বলতে এসেছি! বলতে এসেছি:—আমরা ভারতীয়! আমরা ভারতের সন্তান, আমরা ভারতের

অধিবাসী! কংগ্রেস আছে—আরও দুচারটা দল আছে, মহাসভা আছে, তার বিরোধী দলও আছে—কোনো দলই অজাতশত্রু নয়—কত মতবিরোধ, কত মতান্তর, কত মনান্তর—কত বিদ্বেষ যে রয়েছে তার সংখ্যা নাই। দেশকে স্বাধীন করবার জন্য কি এই দলাদলি আর মতবিরোধই বড় হবে? একদল চলেছে অন্য দলের সঙ্গে মীমাংসা করতে—তৃতীয় দলেরা তার সমর্থন করেন না—করবেন না; কারণ কেউ তাঁদের মত চায় নি! তাই এই প্রতিবাদ সভা। এ সভা না করলে—তৃতীয় দলের অস্তিত্ব থাকে না। নিজের অস্তিত্বকে বজায় রাখবার জন্যই এই সভা! কিন্তু এমনি করে যদি সবাই নিজের অস্তিত্বের জন্যই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন তাহলে অগ্রগতি-পথে চলবে কারা? কংগ্রেস প্রাচীনতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান—এবং সর্ব্ব ভারতীয়—তাই তার শক্তি বেশি—অন্য দল শুধু হিন্দুদের—বা শুধু মুসলমানদের। এইরূপ আরো অনেকে আছেন—কৃষক সভা আছেন—মজদুর ইউনিয়ন আছেন—শ্রমিকসংঘ আছেন—তা ছাড়া বৌদ্ধ আছেন, খৃষ্টান আছেন—কোল, ভীল—সাঁওতাল—এঁরাও আছেন—তাঁরাও এক একটা মহাসভা করে লড়াই আরম্ভ করে দিলে—দেশ চমৎকারভাবে উন্নত হয়ে উঠবে। এই তো চলছে ভাই সব···এই তো আমাদের দেশভক্তি!

—থামুন—থামুন আপনি···সভাপতির পাশ থেকে জনৈক ব্যক্তি বললেন।

—বলতে দিন—বলুন—আপনি—উপস্থিত জনতা চীৎকার করে উঠলো! সভাপতি বলতেই ইঙ্গিত করলেন।

শিলাজিত বলল—অথচ একটা মোটা কথা—সব থেকে বড় আর সব থেকে সোজা কথা কেউ কেন বলছেন না যে আমরা ভারতীয়। আমরা হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান-শিখ-পাঞ্জাবী-গুর্খা-কোল-ভীল যাই হই না—সবার উপরে আমরা ভারতীয়। ভারত আমাদের জন্মভূমি—ভারত

আমাদের মাতৃভূমি—ভারতের স্বাধীনতা আমাদের সকলের স্বাধীনতা—ভারতের কল্যাণ আমাদের সকলের কল্যাণ। ভারত স্বাধীন হলেই তার হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান সমস্যা ভারতেই মীমাংসিত হবে—এমন কি ওটা কোনো সমস্যাই থাকবে না সেদিন!

সম্পূর্ণ এক ধর্ম্মের লোক খুব কম দেশেই বাস করে ভাইসব, ধর্ম্মগত বা জাতিগত বিভেদ প্রত্যেক দেশেই আছে—কিন্তু দেশের স্বাধীনতা লাভে সে বিভেদ কোথাও পরিপন্থী হয় না—হয় শুধু এই ভারতে। এর কারণ আর কিছু নয়—দলগত স্বার্থসিদ্ধির তাগিদ! ভেবে দেখুন ভারত যখন স্বাধীন ছিল, তখনো এখানে বহু ধর্ম্ম, বহু জাতি, বহু মতবাদ ভারতকে স্বাধীন থাকতে কোনো বাধা দেয় নি! ও থাকবে—ওরকম বিভেদ প্রত্যেক বড় দেশেই থাকে—তাতে দেশের স্বাধীনতা কিছুমাত্র ব্যাহত হয় না—কারণ সে দেশের প্রত্যেকটি লোক জানে—সে সেই দেশের ছেলে—ধর্ম্ম বা মতবাদ তার যাই হোক—তার জীবন সেই দেশেরই জন্য। আর এখানে ঐ মতবাদ আর ধর্ম্মবাদকে আশ্রয় করে গড়ে উঠছে দলাদলি—ঈর্ষা—আত্মপরায়ণতা! দেশের স্বাধীনতা এখানে লক্ষ্য নয়—লক্ষ্য নিজের দলকে বাঁচিয়ে রেখে লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করা আর দেশের মানুষদের বোকা বানানো!

—হিয়ার—হিয়ার—চমৎকার বলছেন! বলুন স্যার—বলুন! জনতা উৎসাহ দিল!

—আপনি কোন্ দলের স্যার? কাদের পক্ষে বলছেন?—প্ল্যাটফর্ম্মের একজন চীৎকার করে উঠলো!

—আমি কোনো একটা বিশেষ দলের নই—আমি ভারতীয় দলের। আমি কংগ্রেসে আছি যদি সে কংগ্রেস স্বাধীনতা এনে দিতে পারে। আমি মহাস্থানে আছি যদি মহাস্থানে স্বরাজ পাই—আমি হিন্দু মহাসভায় আনতে প্রস্তুত যদি হিন্দু মহাসভা স্বরাজ আনতে পারে! আমি প্রজা

দলের—আমি ভারতীয় তাই আমার দল সকল দলের থেকে বড়, আমার দল সকল দলের মধ্যে শক্তি যোগায়। আমি জীবনে-মরণে ভারতীয়—এর বেশি আমি কিছু নই—আর কিছু হতে চাই না।

—থামুন—থামুন আপনি—এটা একটা বড় পার্টির অর্গানাইজড্ সভা।

—না—না—না, বলুন আপনি স্যার। পাবলিক কারো মাইনে খেয়ে সভা করতে আসে নাই।

—বলবার আর বেশি কিছু নাই ভাইসব। আমরা সবাই ভারতীয়—এই কথাটাই এই দুর্ভাগা দেশের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে—সকলকে জানিয়ে দিতে হবে সকলের জানা এই কথাটা—আমরা ভারতীয়। ভারতের সুখে আমাদের সুখ—ভারতের দুঃখে আমাদেব দুঃখ। ভারতের স্বাধীনতায় আমাদের সকলের স্বাধীনতা। আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের এখানে ঠাঁই নেই—বাকচাতুর্য্যের অবসর নেই—জাতিভেদের ক্লীবতা নেই—এখানে সবাই একটি মাত্র কথা উচ্চারণ করবেন—আমরা ভারতীয়; সোজা সরল সত্য কথা।

—বলুন স্যার—বলুন—আমরা ভারতীয়···ভারতীয় আমরা···আমরা ভারতীয়!

—হ্যাঁ—তারস্বরে চীৎকার করে নয়—খবরের কাগজে ঢাক পিটিয়ে নয়—বিরাট বিরাট মিটিং করে নয়—কাণে কাণে গুরুমন্ত্রের মত এই অতি পুরাতন কথাটা বলে দিন—আমরা ভারতীয়!

—আমরা ভারতীয়!

—বোম্বাইএ একজন মহিলা—নাম শ্রীমতী চন্দ্রিকা দেবী—এই মহাজাতি সঙ্ঘ স্থাপন করেছেন—সে সঙ্ঘের কোনো জাতি নেই—তাই মহাজাতি সঙ্ঘ। আসুন—আমরা বাংলায় তাঁর সুমহৎ প্রেরণা আর বাণীকে মানুষের অন্তর থেকে অন্তরে ছড়িয়ে দিই—আমরা সবাইকে জানাই—শুধু ভারতীয় আমরা, আর কিছু নয়—ভারতীয়! ঐ যে

দেখছেন বড় বাড়ীটা—ঐটা আমারই বাড়ী—ঐ আটচল্লিশ নম্বর মধু সেন ষ্ট্রীট—মধু সেন আমারই বাবার নাম···ঐ বাড়ী আপনাদের জন্ম খোলা রইল—যারা এই "আমরা ভারতীয়" কথাটা সারা মন প্রাণ দিয়ে স্বীকার করবেন—তাঁরা অনুগ্রহ করে ঐখানে আসবেন! আমি আজই বোম্বাইয়ে চিঠি দিচ্ছি—বাংলায় ঐ মহাজ্যাতি সঙ্ঘের শাখা স্থাপনের অনুমতি চেয়ে!—এঁরাও আছেন, এই সভা—এই কংগ্রেস, এই আরো কত কি—এঁরাও আসতে পারবেন—কারণ ভারতীয় সকলেই—সকলেই ভারতীয়!

শিলাজিত বেরিয়ে পড়ল প্লাটফর্ম্ম ছেড়ে! ও ভাবতে পারে নি যে সত্যই ও বক্তৃতা করতে পারবে আর সেই বক্তৃতা শোনবার মতন কিছু হবে—কিন্তু অবাক হয়ে দেখলো, বিশ-পঁচিশটি যুবক ওর চারিদিকে ঘিরে নানা প্রশ্ন করতে আরম্ভ করেছে। শিলাজিত হাত তুলে সকলকে বলল, —দয়া করে যদি আমার বাড়ীতে আসেন তো একে একে সব কথার উত্তর দিতে পারি।

—চলুন স্যার—চলুন! বলে ওরাই এগিয়ে চলল এবং আরো জন পঞ্চাশ পিছু নিলো!

হুজুগ।—কিম্বা সত্যি এদের মধ্যে কিছু প্রেরণা জেগেছে? শিলাজিত চেয়ে দেখলো ওর চারপাশের লোকগুলিকে—বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ বছরের জোয়ান ছেলে সব—দু-চারজন আরো কম বয়সী—গোটা চার-পাঁচ মেয়েও আসছে! হুজুগই! যাই হোক—দেখা যাক না। শিলাজিত ওর বাড়ীর মধ্যে ওদের নিয়ে এল—মস্ত বড় লন্—ঘাসে ঢাকা, চারধারে ফুলের গাছ—মালী ছুটো রবারের পাইপে করে গাছে জল দিচ্ছে—মনিবকে আসতে দেখে সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়ালো! শিলাজিত একটা বয়কে ডেকে এক কাপ হিসাবে একশ জনের মত চা আর সিঙ্গাড়া-নিমকী আনতে বলে দিয়ে ওদের বলল—এই ভারতের মাটিতে এই নরম ঘাস—

আসন-কুশনের অভাব আমার নেই ভাই, কিন্তু এই ঘাসেই যদি বসি...।

—স্বচ্ছন্দে—স্বচ্ছন্দে !—ওরা সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল সুন্দর নরম ঘাসগুলোর ওপর। শিলাজিত গুণে দেখলো, সর্ব্ব সমেত তেশটি জন এসেছে। ও এবার ওর কার্য্যকরী পন্থা বলতে আরম্ভ করলো! শিলাজিত নিজেই জানতো না—সে এতো ভালো বক্তৃতা করতে পারে। দরকার পড়লে মানুষ যে সব-কিছু করতে পারে—এটা তার বড় প্রমাণ। বেশ গুছিয়ে শিলাজিত বলে গেল—দেশের দুরবস্থার কথা; দেশের লোকেদের পরস্পরের মধ্যে দলাদলি—স্বার্থানুসন্ধান—ফাঁকিবাজি আর তার সঙ্গে কতকগুলো চতুর লোকের অর্থলোলুপতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা!

আজই একজন মাতব্বরকে শিলাজিত কি সব বলতে শুনেছে তাও বলল—শেষে বলল—ভাই সব, এদেশের অগণ্য অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে দেশাত্মবোধের যে স্পন্দনটুকু আমরা দেখতে পাই—তার বেশির ভাগই হুজুগ। সত্যিকার স্পন্দন খুব কম লোকের মধ্যেই এসেছে। তাছাড়া আরও একটা ভাববার কথা আছে—যে পথগুলো এই দীর্ঘ দিন ধরে আমরা অবলম্বন করে আসছি—তার পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার। অসহযোগ নীতিতে আজো বিশ্বাস আছে অনেক লোকের, কিন্তু আমার নাই। ঐ খোকার আব্দার একান্তই অকেজো! বৈপ্লবিক পন্থা এদেশের জন্য নয়—ও চলতে পারে না। ওতে বরং ক্ষতিই হয়েছে—অনেক চিন্তাশীল নিষ্ঠাবান কর্ম্মবীর অকালে জীবন দিয়েছেন। আমাদের কর্ম্মশক্তিকে আমরা সহযোগিতার পথেই চালাব—কারণ, আপনারা ভেবে দেখুন—শাসক আর শাসিতের মধ্যে একটা ভাল রকম বোঝাপড়া হওয়া দরকার—যাতে কেউ কাউকে ভুল না বোঝে! আমরা বেশ ধীরভাবে আমাদের কর্ম্মের দ্বারাই বুঝিয়ে দেব যে আমরা যে-দাবী করছি তা না মেটালে ওঁদের ক্ষতিও বড় কম হবে না—কারণ এই বিরাট দেশের বিপুল জন-শক্তিকে ওঁরা চোখ রাঙিয়েই চিরকাল বশে রাখতে পারবেন

না—একটা না একটা উপায় আমরা বার করবোই। এর জন্য আমাদের চিন্তাশক্তি হবে অক্লান্ত, কর্ম্মশক্তি হবে অবাধ এবং জীবনী শক্তি হবে অমর। অন্যদিকে আমাদের দাবী মিটিয়ে ভারতকে বন্ধুত্বে পরিণত করলে ওঁদের শক্তি থাকবে পৃথিবীর সকল শক্তির বড়। এই কথাগুলি শাসকদের বুঝিয়ে দিতে হবে তাঁদের সাহায্য করেই—সহযোগিতা করেই, তাঁদের বিশ্বাস অর্জ্জন করেই। নইলে এত বড় বিরাট সাম্রাজ্য কেউ কোনো দিন ছেড়ে দিয়ে যায় না—যাওয়া অসম্ভব। শিলাজিত একটু-ক্ষণ থামলো, তারপর আবার আরম্ভ করলো—আমাদের কর্ম্মধারা ঠিক কি রকম হবে তা স্থির করতে একটু সময় লাগবে—তবে সে ধারা বিপ্লববাদ নয়—অসহযোগ নয়—সে ধারা সহযোগিতার পথে, বন্ধুত্বের উপত্যকা দিয়ে বয়ে চলবে!—এটা ঠিক রইলো!

—আমাদের এই সঙ্ঘের নাম কি হবে স্যার?

—মহাজাতি সঙ্ঘ! বোম্বাইয়ে যে মহিলাটি প্রথম এই আন্দোলন আরম্ভ করেছেন, তিনিই দিয়েছেন এই নাম।

—কিন্তু স্যার—নামটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। 'জাতি' কথাটা নাই বা থাকলো আমাদের মধ্যে। ঐ জাতি আর ধর্ম্ম নিয়েই তো যতো গোল ঘটেছে এদেশে! জাতি আর আমরা চাইনে স্যার—আমাদের নাম হোক 'মহাভারত মণ্ডল'—দেখুন আপনি ভেবে!

নামটা শিলাজিতের পছন্দ হয়ে গেল—তৎক্ষণাৎ। যে ছেলেটি বলল কথাটা তার দিকে শিলাজিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো—দেখলেই বোঝা যায়—সে মুখে আভিজাত্যের ছাপ। ধনীর সন্তান বলেই মনে হয়। শিলাজিত সোৎসাহে বলল—নামটি সত্যি পছন্দসই। কিন্তু বোম্বাইয়ে যে নাম দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে তো মিলছে না!

ওঁদের লেখা যেতে পারে স্যার, ও নাম না দিয়ে এই নামটাই রাখুন ওঁরা। যদি আপত্তি করেন তাহলে তখন ঐ নামই নেব আমরাও।

—হ্যাঁ—তা হতে পারে। একটা রিজলিউশান করে নাম বদল করে দিতে কতকক্ষণ!

—খাতা কলম আনুন স্যার—আমরা উপস্থিত সবাই আজই সভ্য হব! কে কে সভ্য হতে চান—হাত তুলুন!

—সবাই হাত তুললো এক সঙ্গে। শিলাজিত ওর পড়ার ঘরে ঢুকে একখানা মোটা খাতা বার করে নিয়ে এল! একটি কুড়ি বাইশ বছরের মেয়ে খাতাটা নিয়ে সকলের নাম আর ঠিকানা লিখিয়ে নিচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে যে যা পারে চাঁদা দিয়ে দিল—দশ টাকা থেকে চার পয়সা পর্য্যন্ত। মেয়েদের শিলাজিত নিতে চায় না। এই জাতটাকে ওর বড় ভয়। বলল—মেয়েদের এই মণ্ডলে নেওয়া সম্বন্ধে আমার আপত্তি ছিল। ওরা গৃহ-কাজেই ভালো থাকেন!

—কিন্তু স্যার—যিনি এই মতবাদ প্রথম দিন প্রচার করলেন, তিনি মেয়ে। বলল সেই মেয়েটিই!

শিলাজিত আর কথা কইল না। মহা উৎসাহে যুবকটি 'একশ' টাকার একটা নোট বার করে শিলাজিতের হাতে দিয়ে বলল—আমি এবার কিছু বলতে চাই স্যার।

—বেশ তো, বলুন।

ও আরম্ভ করে দিল:—"আদরের বোনেরা, স্নেহের ভাইসব! আমার এই সাতাশ বছরের জীবনে কত আন্দোলন যে দেখলাম—কত রকমের—কত নামের নেতা—কিন্তু সব ফাঁকা! প্রত্যেকটি আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে আর হচ্ছে! এর কারণ কি জানেন? কারণ এই ইনি—এই শ্রীযুক্ত সেন পূর্ব্বেই বলেছেন। নেতৃত্ব বড্ড বেশী প্রলোভনের বস্তু। পরাধীন দেশে নেতার সম্মান—রাজার সম্মানের চেয়ে বেশি—সম্রাটের চেয়েও বেশি!. থার্ড ক্লাশের ট্রেণের কামরায় তাঁর যাওয়া মানে আরো বেশি সম্মান আদায় করা—আতপ চাল কলা খেয়ে লোক দেখানো মানে

নিজেকে অতিমানব বলে জানানো—মাঝে মাঝে সতর্কতার সঙ্গে উপবাস দিয়ে—যাতে যথাসময়ে উপবাস ভঙ্গ করানো হয় মানে কি জানেন? মানে হচ্ছে নিজেকে মানুষের কাছে দেবতা বানানো—অবতার বানানো! এই অবতার-বাদের দেশে এ একটা চমৎকার ব্যবসা। এই উপায়ে সম্মান চমৎকার ব্যবসা। এই উপায়ে সম্মান যখন উত্তুঙ্গ হতে থাকে, সরকার যখন নেতাকে একটু সমীহ করে বলেন—'একটা আপোষ হোক'—তখন আর কিছু বাকি থাকে না তাঁর পাবার। পরাধীন দেশে আশার অতিরিক্ত পেয়ে যান্ তিনি আর তার পরেই তাঁর সমস্ত নিষ্ঠা, দেশ সেবার সব-কিছু আকাঙ্ক্ষা—কর্ম্ম-নিষ্ঠার সবটুকুই আত্মসেবায় পর্য্যবসিত হয়। এই হয়ে আসছে এত কাল ধরে! আমরা সাধারণ মানুষ, নির্ব্বোধের দল যখন ভাবি—নেতাজি আমাদের উদ্ধার করছেন—নেতাজী তখন সম্মানের গদিতে পায়ের উপর পা রেখে পরমানন্দে ইহলোকের আনন্দ উপভোগ করছেন!

এই নিষ্ঠা-হীনতা, এই কর্ত্তব্যচ্যুতি আমাদের এতকাল ধরে ঠকিয়ে এসেছে! কোনো ব্যক্তিগত নেতার কথা আমি বলছি না— দোষ নেতার নয়—আমাদেরই; আমরাই এই প্রাপ্যের অতিরিক্ত সম্মান আগেই দিয়ে বসি নেতাকে! এবং তিনি সেটা পেয়ে আরো পেতে চান। সম্মান লাভটাই তখন হয় তাঁর ল[illegible]ার টাকাটাও। দেশ যায় চুলোয়! এই মোহ থেকে মুক্তি পেতে হবে আমাদের। সম্মানকে আমরা অবজ্ঞার চোখে দেখবো। আমরা দেখবো শুধু দেশের সম্মান—আমরা দেখবো শুধু দেশের কল্যাণ, দেশের উন্নতি। যেদেশ একদিন পৃথিবীর সেরা ছিল—আজ তার নামে কুৎসা রটে বিদেশে! যে প্রথা এদেশে যুগযুগ ধরে সম্মানিত হয়ে আসছে, আজ সেই প্রথাগুলির কদর্য্য ব্যাখ্যা করে পৃথিবীর লোকের কাছে ধরা হচ্ছে! কেন? কারণ আমাদের ঠিকমত নেতা নেই। যদি থাকতো, তবে দেখিয়ে দিত—আমরা আজও মরে যাইনি—

কয়েকটা বছর ঘুমিয়েছিলাম মাত্র!—কিন্তু যাক ও সব কথা! বর্ত্তমানে এক সুরে আপনারা বলুন—আমরা ভারতীয়—আমরা মহাভারত-মণ্ডল—আমাদের কোনো জাতি নেই—আমাদের কোনো ধর্ম্ম নেই—আমাদের কোনো শ্রেণী নেই। আমাদের জাতি ভারতীয়—ধর্ম্ম ভারতীয়—কর্ম্ম ভারতীয়—বলুন সকলে—ভারতমাতরম্ বন্দে!"

ও বসে পড়তেই অন্য একজন—একটু বয়স্ক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালেন :—"স্নেহের ভাই বোনেরা,—এঁরা যা বললেন সে সবকয়টি কথাই আমি পূর্ণভাবে সমর্থন করি! আরো ভেবে দেখুন,—আমরা এই দেশে বহু পুরুষ ধরে বাস করে আসছি! এই দেশের জল-মাটি-হাওয়ায় আমাদের শরীর মন গঠিত—কিন্তু এই দেশের আবহাওয়াকে আমরাই করে তুলেছি বিষাক্ত। পার্টিতে পার্টিতে ঠোকাঠুকি, নেতায় নেতায় রেষারেষি—ধর্ম্মে ধর্ম্মে দাঙ্গা-হাঙ্গামা—প্রদেশে প্রদেশে ছোঁয়াচ বাঁচাবার প্রচেষ্টা—যত রকম ঘৃণ্য অনুদারতা—সবই এসেছে আমাদের মধ্যে। আজ নয়—বহুদিন থেকে—সেই জয়চন্দ্রের আমল থেকে, যেদিন মহম্মদ ঘোরীকে তিনি ডেকে এনেছিলেন। তাই আজ আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—দেশকে, জাতিকে বড় করতে হলে অনুদারতার প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না—সবাইকে সাথে করে এগিয়ে যেতে হবে। আর সহযোগিতার পথই আমাদের পথ। অসহযোগ ব্যর্থ হয়েছে, এ কথা বেদনার সঙ্গেই স্বীকার করতে হবে। সহযোগিতা ছাড়া আমাদের অন্য কোনো পথ নেই। দীর্ঘ দিন আমরা যাঁদের শাসনাধীন আছি—তাঁদের সঙ্গে আমাদের অনেক বোঝাপড়া হয়েছে—আরো অনেক বোঝাপড়া হতে পারবে—তার সুযোগ আছে। দুঃখ এবং দুর্ভাগ্য এই যে, আমাদের দাবী ঠিক মত জানানো হয় না। উত্তেজনায় আমরা হয়তো অতিমাত্রায় পাবার দাবী করে বসি কিম্বা কিছুই নেব না বলে ছেলেমানুষের মত গোঁ ধরে থাকি। আমরা আজ তবুও অনেক দূর এগিয়েছি—আরো এগিয়ে যেতে পারবো এবং শেষে আমাদের

লক্ষ্যে পৌঁছাব—সে লক্ষ্য স্বাধীনতা। কিন্তু এপর্যন্ত যতগুলি উপায় এ পর্য্যন্ত ঠিক করা হয়েছে—কোনটাই সার্থক হোল না। না হবার কারণ—আমাদের অনুদারতা, কুৎসিত মনোবৃত্তি, হীন স্বার্থানুসন্ধান। আমরা যদি আজই হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এক হয়ে যাই, তাহলে ওঁদের কি করবার থাকবে? আমরা যদি আজ প্রদেশে-প্রদেশে ভেদবুদ্ধি ঘুচিয়ে দিয়ে সকলেই নিজেকে ভারতীয় বলে ভাবতে শিখি, ওঁদের কি করবার থাকবে! এই কৃত্রিম ভেদ-বিভেদকে বাঁচিয়ে রাখবার মূলে তো আমরাই রয়েছি। শাসকশ্রেণী আমাদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে চান আর ভাবেন—কী নির্ব্বোধ এরা—আর কতখানি নীচ!

বৈপ্লবিক পন্থা গ্রহণ ভারতের ধর্ম্ম নয়—যাঁরা ওটার প্রবর্ত্তন করেছিলেন—তাঁরা বিদেশ থেকে ওটার আমদানী করেছিলেন; ওটা তাই টিকলো না। আমাদের ভারতীয়রা বিপ্লবকে শুধু ভয় করে না—অন্তরে অন্তরে ঘৃণা করে, 'পাপ' বলে মনে করে। যারা এ পথে গিয়েছেন—তাঁরা শেষে অনুতাপ করেই ফিরে এসেছেন! ও নীতি পরিত্যজ্য! অসহযোগ নীতিবাদকে আমরা যথেষ্ট বিশ্বাস করেছিলাম—কিন্তু আমাদের ভাবা উচিত, আমরা না খেয়ে উপোস দিয়ে মরলেই রাজ্য-শাসনের নীতি বদলায় না। যাঁরা শাসন করেন তাঁদেরকে কঠোর হতেই হবে। আমরা যদি কোনো দিন দেশ-শাসন করি তো আমাদেরও কঠোর হতে হবে তখন। সাম্রাজ্য শাসনের কতকগুলো নীতি থাকে; ওঁদের সেটা মানতেই হয়। ধনতন্ত্রবাদ আর সাম্যবাদ নিয়ে ঝগড়া করবার মত অবস্থা নয় আমাদের। ওটা একান্ত ভাবেই বৈদেশিক এবং হয়তো কোনো স্বাধীন দেশে চলতেও পারে—আমার মনে হয়, ওর অংশ বিশেষ চলবে—কারণ ঈশ্বর সব মানুষকে এবং সব জাতিকে সমান শক্তি দিয়ে গড়েন নি। সব সমান হতে পারে না! গুণ এবং কর্ম্ম অনুসারে তফাৎ থাকবেই মানুষে মানুষে—যাই হোক, ওটা আপাততঃ বিচার্য্য

নয় এবং ও নিয়ে স্বাধীনতার আন্দোলন চলে না! এখন একটি মাত্র পথ বাকি রইল—সেটি সহযোগিতার পথ। এই পথ কেন বেছে নিতে চাই—, বলছি—মনোবল ছাড়া আমাদের আর কোনো বল নেই—শাসক শক্তির কাছেই আমাদের অন্য বল সংগ্রহ করে নিতে হবে—নইলে আমরা আত্মরক্ষা করতে পারবো না।—আমাদের সেই শক্তি আদায় করে নিতে হবে ওঁদের বিশ্বাস জন্মিয়েই। যাতে আমরা শক্তির অপব্যবহার না করি—এটাও বুঝিয়ে দিতে হবে। যেমন ধরুন, জাপান যদি ভারতে ঢুকবার চেষ্টা করে—ওদের বাধা দেবার জন্য আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে—কারণ, জাপান যদি একবার আসতে পারে তাহলে ভারতের স্বাধীনতা লাভ আরো হাজার বছর পিছিয়ে যাবে।

—কেন? জাপানের কাছ থেকেই আমরা সেটা পেতে পারি তো!—বললে একটি মেয়ে।

—না—পেতে পারি না। আপনাকে স্বাধীনতা দেবার জন্যে জাপান এতো ধনক্ষয়—আর জনক্ষয় করে যুদ্ধ করছে না। অত নির্ব্বোধ নয় সে। স্বাধীনতা যদি আমরা পাই কোনো দিন তো এই ইংরেজের কাছ থেকেই পাবো।—জাপান চায় রাজ্য বিস্তার করতে। সে চায় প্রাচ্য ভূখণ্ডে তার প্রভাব অনমনীয় রাখতে, তার পতাকা ভারতেও উড্ডীন রাখতে!

—কিন্তু জাপান বলছে যে···

—জাপান বলে—বলবে! আমাদিগে প্রতারিত করবার জন্যই ওরা বলবে যে 'আমরা তোমাদের স্বাধীন করে দেব।' কিন্তু ওদের সেই কথায় কোনো নির্ব্বোধও বিশ্বাস করবে না। না করবার কারণটা খুবই সোজা। প্রাচ্যকে স্বাধীন করবার মতলবই যদি ওদের থাকে তো চীনকে অমন করে গলা টিপে মারতে চায় কেন? চীন প্রাচ্যভূমিরই অংশ। অস্ত্রবলে হীন—দুর্ব্বল চীনকে জাপান পিষে মারতো এত দিন যদি মিত্রশক্তি তাকে সাহায্য না করতেন! জাপান যে ক'টা দেশ জয়

করেছে—তাদের মধ্যে কাউকে স্বাধীনতা দিয়েছে কি? শুনেছেন? দেবে না। দেওয়া অসম্ভব।

—কিন্তু এর পরে···

—এর পরেও দেবে না! কোনো দিনই দেবে না। দেবার জন্য এত ক্ষতি সইছে না—নেবার জন্যই সইছে! তার যুদ্ধনীতি অপরিবর্ত্তনীয় আছে—শাসন-শোষণ নীতিও ঠিক তেমনি অপরিবর্ত্তনীয় থাকবে। তার চেয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্য আমাদের অনেকটা চিনেছেন। দীর্ঘ দিনের একটা সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে তাঁদের সঙ্গে—যে-সম্বন্ধের আত্মীয়তায় আমরা উপোস করে বলি—"আমাদের স্বাধীনতা দাও—না দিলে আমরা না খেয়ে মরে যাবো। আমরা সবাই প্রায়োবেশন করবো।" ওঁরা সেটা শোনেন—তাই নিয়ে চিন্তাও করেন। কিছু একটা উপায় করা যায় কি না—ভেবে দেখতেও বলেন আমাদের। ওঁরা শাসক—আমরা শাসিত—তবু আমরা সাহস করে বলি—'যদি না দাও স্বাধীনতা, আমরা অসহযোগ করবো।" করেছিও কতবার। ওঁরা দেখেছেন—পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলে কঠোর নীতি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন—কারণ—রাজ্যশাসনের কতকগুলি নীতি থাকে। এবং সে নীতি প্রয়োজন মত কাজে লাগাতে হয়।

—ওঁদের সহযোগিতা করতেও চেয়েছি আমরা। এই তো সেদিনের একটা প্রস্তাবে আমরা যা চাইলাম—ওঁরা তার সবটা দিতে চাইলেন না।

—শনৈ শনৈ! ঐ প্রস্তাবটাই চূড়ান্ত নয়—প্রস্তাব আবার হতে পারবে! কিন্তু ভেবে দেখুন—অতখানাও তো ওঁরা এগিয়ে এসেছেন! আরো যে এগিয়ে আসবেন না—তার তো কোনো প্রমাণ নেই! সহযোগিতার পথই আমাদের পথ—আর—আমাদের পরাধীন থাকতে হলে ইংরাজ শাসনেই থাকা ভাল যত দিন স্বাধীনতা না পাই! এক শাসকের উচ্ছেদ কামনা করে অন্য জাতির শাসন কামনা যাঁরা—দুর্ব্বল,

উত্তেজিত মনোবৃত্তির পরিচায়ক! স্বাধীনতা এই ইংরাজকেই দিতে হবে আমাদের—দিতেই হবে! আমরা তা' আদায় করবোই। এর জন্যে জাপান বা অন্য কোনো বৈদেশিক শক্তির সাহায্য গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা মারাত্মক রকমের দুর্ব্বলতা। যার নিজের যোগ্যতা নেই—সেই এরকম চিন্তা করে থাকে। জাপান আমাদের স্বাধীন করতে আসবে না—আসতে দেব না আমরা—কারণ আমরা বেশ জানি—ভারতের উপর লোভ আছে সকলেরই—জাপানেরও কিন্তু কম লোভ নেই! জাপান প্রাচ্যের সাম্রাজ্য—তাই প্রাচ্যে সে একচ্ছত্র হতে চায়—। আর আমাদের বোঝাতে চায় ধোঁকা দিয়ে যে সে প্রাচ্যকে মুক্ত করবে। ঘরের খেয়ে এমন করে বনের মোষ কেউ তাড়ায় না। জাপানও তাড়াবে না। যাক সে কথা। জাপানের সম্বন্ধে কিছুই এখন আমাদের আলোচ্য নয়। আমরা চাই স্বাধীনতা, এবং সম্মানের সঙ্গে সেটি অর্জ্জন করে নিতে চাই। এই হোক আমাদের, এই মহাভারতমণ্ডলের নীতি, ধর্ম্ম—কর্ম্ম। এর জন্য অসহযোগী বা সহযোগী, কংগ্রেস বা মহাসভা বা অন্য কোনো দলের সঙ্গে আমাদের কিছুমাত্র বিরোধ নাই। যারা ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের সৈনিক তারাই আমাদের আত্মীয়, তবে আমাদের পথ আমরাই ঠিক করবো, যে-পথ হবে শাসকের সঙ্গে সসম্মানে সহযোগিতা করবার বন্ধুত্বের পথ—আপনারা সমর্থন করেন কি না?

—হ্যাঁ! বর্ত্তমানে আমাদের আর কোনো পথ নাই। আমাদের পথটাকে সাধারণ লোকের উত্তেজিত মস্তিষ্কের কাছে ঘৃণ্য বলে মনে হতে পারে—কিন্তু ধীরভাবে বিবেচনা করলেই তারাও বুঝবে যে এ ছাড়া অন্য পথ নাই। আমাদের একনিষ্ঠতা, আমাদের ঐকান্তিক কর্ম্মশক্তি—আমাদের আত্মবিশ্বাস অটুট থাকলে আমরা নিশ্চয়ই সফল হব!

—বেশ—সকলে আর একবার বলুন—আমরা মহাভারতমণ্ডল আমরা ভারতীয়!

—আমরা ভারতীয়—ভারত মাতরম্ বন্দে !

ওরা একটা গান ধরে দিল···সঙ্গে যোগ দিল দুটি মেয়ে :—

জয় ভারত, ভারত জয়—জয় ভারত মাতা—জয় ভারত-মাতা !

কন্যাকুমারী গৌরীশঙ্কর—গাহে জয় গান ভরি নীলাম্বর

ইরাবতী নদী, দ্বারাবতীপুর—গাহে তব জয় গাথা—

জয় ভারত, ভারত জয়—জয় ভারত-মাতা !···

গানটা থামতেই চায় না—কিন্তু অনেক কাজ বাকি আছে—খবরের কাগজে সর্ব্বাগ্রে রিপোর্ট পাঠাতে হবে—নাম রেজেষ্টারী করার ব্যবস্থা করতে হবে—বড় রকম হল ভাড়া নিয়ে বড় মিটিং অর্গানাইজ করতে হবে। বক্তা গানটা থামিয়ে দিয়ে বলল—সবুর করুন সবাই। উচ্ছ্বাস, আনন্দ প্রকাশের দিন আসে নি আমাদের। অর্থ না-বোঝা-শ্লোগান গাইবারও দিন নয়। এখন চাই কাজ—ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে কাজের মধ্যে আমাদের। জয়গান আমরা বিস্তর গেয়েছি—এবার বন্ধ করুন! অন্য একজন বললেন, —কিন্তু এতে আমাদের মর‍্যাল ষ্ট্রেংথ বাড়বে।

—না। মর‍্যাল ষ্ট্রেংথ কম যদি থাকে তো এ পথে আসবেন না। ওসবে কেবল সময় নষ্ট হয় আর হয় হুজুগ। হুজুগকে একেবারে বাদ দিতে হবে আমাদের। আমরা ধীর দৃঢ়পদে এগুবো সহযোগীতার পথে। এখন যে সব অবশ্য করণীয় কাজগুলো রয়েছে, তাই করা হোক। আমাদের অফিস হবে কোথায়?

—আমার এই বাড়ীতে! বাড়ীটা আমি এর জন্যে দান করছি। শিলাজিত বলে উঠলো। আর একবার ভারত মাতার জয় ঘোষণা করে ওরা তখুনি বাকি সব কাজ আরম্ভ করে দিল এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সব ঠিক করে ফেলল। চা-খেয়ে সবাই চলে যাওয়ার পর শিলাজিত নিজের ঘরে গিয়ে শুলো—বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ও—কিন্তু উত্তেজনায় ওর চোখের পাতা বন্ধ হতেই চাইছে না! এত শীঘ্র একটা কিছু করে

ফেলতে পারবে ও—একবারও ভাবে নি! বহু রাত্রি পর্য্যন্ত শিলাজিত বিনিদ্রিত থেকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে—উঠে দেখে সকালের আলোব সঙ্গে একপাল যুবক-যুবতী কোলাহল করছে বাইরে। মিটিং বসবে ওদের!

১২

প্রায় সাবাটা রাত কেয়ার ঘুম হয় নি। ঘুমিয়েছে, আবার একটু পরেই জেগে উঠেছে। কথাগুলো সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছে না। কিন্তু—একটা বড় রকমের কিন্তু জেগে উঠছে ওর মনে। লেখা এখান থেকে চলে গেল কেন? কী সে কারণ? তাহলে কি কিংশুকের কথাগুলোই সত্যি? অঞ্জনই সর্ব্বনাশ কবেছিল লেখার! নিজের দেহ-মনকে অপবিত্র ভেবেই এই পবিত্রবংশের বধূ হতে চাইল না লেখা? কিংশুক তো তাই বলল! এর মধ্যে কিছুটা সত্যি না থাকলে নিজের বোন সম্বন্ধে কে আর এমন কুৎসিত কথা বলে! কেয়ার তরুণ মন বেদনায় আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে! অঞ্জন, সেই ক্ষণেকের দেখা অঞ্জন—না, কেয়া তাকে কোনোদিন ভুলতে পারবে না। সেই আশ্চর্য্য সুন্দর গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি কেয়ার মনের পটে আঁকা হয়ে গেছে—চোখের উপর নাচছে—সেই অঞ্জন এমন ভয়ঙ্কর লোক!

অঞ্জনকে ব্যক্তিগত ভাবে প্রায় কিছুই চেনে না কেয়া। চোখে একবার দেখেছে মাত্র আর লেখার কাছে শুনেছে তার কথা। এখন খবরের কাগজে প্রায়ই অঞ্জনের কৃষ্টি-সাধনার কথা—প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের উপর নবীন ভারতের ভিত্তি স্থাপনার পরিকল্পনার কথা—যুদ্ধোত্তর ভারতের পুনর্গঠনের প্রস্তাবের কথা পড়ে আর ভাবে—সেই লোকটি,—সেই যিনি কেয়ার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন—"মনের মত বর হোক।" সব থেকে বড়ো আশীর্ব্বাদ—মেয়েদের জীবনে এত বড় আশীর্ব্বাদ আর নেই। সেই তিনি—সেই দেশসেবায় আত্মনিয়োজিত-প্রাণ কুমার অঞ্জন—তিনিই এতোখানি অসচ্চরিত্র! নাঃ, কেয়া আর

কাউকে বিশ্বাস করবে না। মানুষকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।

লেখার অটোগ্রাফের খাতায় লেখা অঞ্জনের কবিতাটি পড়েছে কেয়া। যিনি ঐ কবিতা লিখতে পারেন তিনিই করেছিলেন এমন সর্ব্বনাশ! অঞ্জনের লেখা দু-তিনখানা উপন্যাস রয়েছে কেয়ার সেল্‌ফে—এই সেদিন যেটা সে লেখার কাছে চেয়ে নিয়েছিল সেই বইটাও—কী করুণ, কি মর্ম্ম-স্পর্শী ঐ উপন্যাস! "ভারতের দুঃখ-বেদনার শান্ত-সমাহিত মূর্ত্তি যেন ভাদ্রের ভরা ভাগীরথীর স্রোতে ভেসে চলেছে অনন্ত দুঃখাপহারী মহাসাগরের উদ্দেশে—সম্মুখে মৃত্যুর শান্তি পারাবার"—ঐ যার লেখা—যার হাত দিয়ে ঐ রকম গভীরতম বাণী উৎসারিত হয়—তিনি চরিত্রহীন—শয়তান!—না-না-না, কেয়া বিশ্বাস করবে না—বিশ্বাস করা উচিত নয় কেয়ার! যাবার আগের দিন পর্য্যন্ত লেখা তাকে ঐ অঞ্জনের কথাই বলে গেছে—আর বলে গেছে, অঞ্জন মানুষের জগতে দেবতা! লেখার নিজের মুখের কথা এ! কিন্তু লেখা চলে গেল কেন? কেন? কেন?

সকালে উঠে স্নান সেরে কেয়া একখানা সুতার কাপড় পরলো—সাদা, কালো পাড়। সাজ পোষাক করে বেরুতে ভালো লাগছে না ওর। রঙিন কাপড়ের ছেলেমানুষীর দিন ওর যেন গত হয়ে গেছে। ওর যেন এই বিশ্বের উপর বিরক্তিকর একটা বিতৃষ্ণা এসেছে। ও যেন সদ্য শোকগ্রস্তা।

কিন্তু ও সুন্দরী—এমন সুন্দরী যা কালেভদ্রে দু-একটা দেখা যায়। অষ্টাদশ বসন্তের উৎসব চলেছে ওর দেহে। কালো পাড় সাদা শাড়ীতেই ওকে যেন সরস্বতীর শ্রীমূর্ত্তির মত দেখাচ্ছে! ও ভাবলো—দেখতে ওকে আজ কারো ভালো লাগবে না—কিন্তু ও জানে না—ওকে আরো বেশি ভালো দেখাচ্ছে এই সুন্দর অকলঙ্কিত প্রভাতের আলোয়, যে প্রভাত এখনো কারো মিথ্যায় কলঙ্কিত হয় নি—কারো প্রতারণায় হৃতসর্ব্বস্ব হয় নি, কারো চাটুভাষণে অহঙ্কৃত হয় নি। কেয়া বেরিয়ে এল মন্দিরের পথে। ওর বাবার পূজায় সাহায্য করবে। ঊষার মত অনবগুণ্ঠিতা কেয়া, প্রত্যূষের

পদ্মের মত শুভ্র কেয়া—বাসনার বাস্তব রূপধারিণী কেয়া বাগানের রাস্তা ধরে মন্দিরের দিকে আসছে—কিংশুক দেখলো তার শোবার ঘরের বারান্দা থেকে। এ ঘরটা মূল গৃহ-সংলগ্ন নয়—কাছারী বাড়ীর সঙ্গে যুক্ত—এবং অতিথি-অভ্যাগতের জন্ত নির্দ্দিষ্ট! নীচে নেমে এলেই কেয়ার সঙ্গে সাক্ষাত হবে। কিংশুক সকালের এই অপূর্ব্ব অভিনন্দন অগ্রাহ্য করতে পাবলো না—নেমে এল। ঈশ্বর যেন সদয় আজ কিংশুকের উপর—নইলে এমন সকালে প্রথম দেখা হবে কেন তার কেয়ার সঙ্গে? ভাগ্যের উপর চির অবিশ্বাসী কিংশুক ভাগ্যকেই ধন্যবাদ দিল আজ!

—নমস্কার! চমৎকার দেখাচ্ছে কিন্তু আপনাকে—কিংশুক অভিবাদন করল। কেয়া চম্‌কে উঠেছিল একটু। রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি ওর শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে কোমলতা বিস্তার করছে। চোখে-মুখে কেমন একটা সমাহিত শান্ত ভাব। আপনার মনের অতলে ডুব দিয়েছে ও। প্রতি নমস্কার করে বলল—যান, চা খান গে।

—না—চলুন মন্দিরে যাব, সন্ধ্যা করতে হবে।—কিংশুক ঠিক ওর পাশে এসেই হাঁটতে লাগল। কেয়া নীরবে চলেছে। কয়েক পা গিয়েই কিংশুক বলে উঠলো—দেখে মনে হচ্ছে, লক্ষ্মীর ঘরে সরস্বতী এসেছেন! প্রশংসাটা অত্যন্ত সস্তা—খেলো; কেয়া কোনো জবাব দিল না। ওর হাতে একখানা বই—যে গানটা গাইবে ঠিক করেছে, এই বই-এ সেটা ছাপা আছে। কিংশুক তাই দেখেই ওকে সরস্বতী বলেছে—বলুক গে।

—কি বই ওখানা?—বইএর নামটা কিংশুক দেখবার চেষ্টা করছে—দেখতে পেল, লেখকের নাম দেবাঞ্জন মুখোপাধ্যায়। চকিত হয়ে উঠলো কিংশুক! তার গতকাল সন্ধ্যার কথাগুলো শোনার পরেও কেয়া ঐ অঞ্জনের বই হাতে নেয়! তাহলে সে কি বিশ্বাস করে নি কিংশুকের কথাগুলো? কিংশুক চিন্তিত হয়ে উঠলো বেশ। অঞ্জনের উপর কেয়ার [illegible] বর্তমান তাপ বুঝবার জন্ত বলল।

—গরীব লেখকরা ধনীদের নিন্দে করে—আর ধনী লেখকরা করে গরীবদের গুণগান। সাহিত্যে এ একটা দেখবার বিষয়।

—লেখক কোনোদিন ধনী হয় না—কেয়া গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল—যুগে যুগে বাল্মিকী, ব্যাস, কালিদাস এসেছেন দরিদ্র হয়েই। অন্তরের ঐশ্বর্য্যই তাঁদের সম্পদ—কোনোদিন লেখক ধনী হয় না!

—সে কি?—কিংশুক বিস্ময়ের সঙ্গে তাকালো—কোনোদিন লেখক ধনী হতে পারে না, বলছেন?

—হ্যাঁ! আপনি রবীন্দ্রনাথের উদাহরণ দেবেন তো? কিন্তু আমি জানি, রবীন্দ্রনাথের মতন গরীব খুব কম বড় লেখকই জন্মেছেন। যতটুকু ওঁর প্রতিভাকে পুষ্ট করবার জন্য দরকার ছিল, মাতা ভারতী ঠিক ততটুকুই ওঁকে দিয়েছিলেন—ততটুকু তিনি প্রত্যেক সেবককেই দেন—যে তাঁর সেবা ঐকান্তিক নিষ্ঠায় করে থাকে! বড়লোক তিনি করেন না লেখককে! নিজে তিনি সর্ব্বাভরণ মুক্তা শ্বেত বসনা নিষ্কলঙ্কা—অপাপবিদ্ধা—ধনের মালিন্য কোথাও তাঁকে স্পর্শ করে নি। জলের পদ্ম তাঁর গৃহ—বনের হাঁস তাঁর বাহন—তুচ্ছ একটা তিন তারা তাঁর বাদ্যযন্ত্র। তিনি চান, তাঁর সেবকও হবে তেমনি—সর্ব্বস্বরিক্ত, সব থেকে মুক্ত—সকল সমালোচনা—স্তুতি-বন্দনার উর্দ্ধে। সেবকের উপর এই তাঁর আশীর্ব্বাদ!' কেয়া থামল।

মনের তারে ওর কোথায় যেন কি একটা আক্রোশ—কি একটা বেদনার জ্বালা—কি একটা বিষাক্ত বৃশ্চিক গুম্‌রাচ্ছিল—ও যেন মুক্তি দিল তাকে এই কথাগুলোর মধ্যে! কিংশুক কিছুক্ষণ নীরবে চলতে চলতে বলল—রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত জমিদার ঠাকুর পরিবারের ছেলে…।

—হ্যাঁ! ঠাকুর পরিবারে না জন্মালে ওঁর প্রতিভা বিকশিত হবার সুযোগ পেত না—কারণ তাঁর মতন অতবড় বিরাট পরিকল্পনা করবার দুঃসাহস,—ভারতের সংস্কৃতিকে ঢেলে সাজাবার মত মনের বল কোনো

মধ্যবিত্ত বা গরীব পরিবারের ছেলের থাকতে পারে না—থাকা সম্ভব নয়। রাজার ছেলেই লাখটাকা খরচের কল্পনা করতে পাবে, গরীবের ছেলে লাখটাকার স্বপ্ন দেখলে সে টাকা কোথায় জমিয়ে রাখবে, তাই ভাবে। রবীন্দ্রনাথ ধনী পরিবারেই জন্মেছিলেন—কিন্তু নিজে তিনি কোনোদিন ধনী ছিলেন না—ধনী হতে চান নি। হতে চাইলে অবশ্যই হতে পারতেন, সে যোগ্যতার সবটাই ছিল তাঁর, কিন্তু চেয়েছিলেন তিনি গরীব থাকতে—নইলে লক্ষ্মীর দেওয়া সোনার তালের তলায় পড়ে থেঁতলে যেতো তাঁর ঐ অলৌকিক প্রতিভা! ঐ প্রতিভাই তাঁকে গরীব থাকতে বাধ্য করেছে।

কিংশুক এ নিয়ে আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত মনে করলো না। কেয়া মন্দিরের মর্ম্মর সোপানে উঠতে আরম্ভ করছে। ভেতরে ওর বাবা খালি গায়ে বসে সন্ধ্যাহ্নিক করছেন; কেয়া গিয়ে দাঁড়াল। কিংশুক এখনো পরিচিত হয় নি কেয়ার বাবার সঙ্গে। উনি এমনই করে সংসারের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেছেন যে কেউ বিশেষভাবে খোঁজ না নিলে ওঁকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব! অগণিত পাচক-পুরোহিত-আমলাদের মধ্যেই উনি হারিয়ে যান! কেয়াকে ওঁর এত কাছে গিয়ে দাঁড়াতে দেখে কিংশুক বিস্মিত হোল। কে ঐ লোকটা—কেয়া যার অত কাছে যায়? বহু পুরাতন কোনো পণ্ডিত হয়তো! কিংশুক নিঃশব্দে একটা কুশাসন টেনে নিয়ে পুজায় বসল! কিছুক্ষণ সেই নাক-টেপা আর গাল-বাজানোর কসরৎ করে ও দেখতে পেল—উনি ধ্যান ভঙ্গ করেছেন আর গান গাইছে কেয়া—

"নীল আকাশের নয়ন-পাতে যখন তুমি থাকো চেয়ে,
তোমার কথা তোমার ভাষায় বলে পাখী গেয়ে গেয়ে;
তখন আমার মনের কোণে মেঘ যে জাগে অকারণে
আমার আকাশ আঁধার করে আসে সে মেঘ ছেয়ে ছেয়ে,
তুমি থাকো দূরে দূরে তেমনি সুনীল চোখে চেয়ে!
এই পৃথিবীর আলোয় যখন খোলে আমার নয়ন দুটি,

ছলনা আর প্রতারণায় করি যখন ছুটোছুটি—
তখন তুমি সজল হেসে—আমায় আরো ভালোবেসে
কাঁদিয়ে দাও—মনটুকু মোর সেই কাঁদনে উঠুক নেয়ে
দূরে থাকো, কাছে থাকে —তুমি থাকো সকল ছেয়ে !”

কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মিষ্টি ! এ যেন গলিত সুধাধারা। বহু পুরুষানুক্রমে সঙ্গীত সাধনার ফলে এমন গলা পাওয়া যায়। কিংশুক সন্ধ্যার কসরৎ ভুলে গেল। ভুলে গেল তাকে ব্রাহ্মণত্বের ভণ্ডামী করতে হবে।

—চমৎকার !—কিংশুকের উত্তেজিত স্খলিত কণ্ঠ বেজে উঠলো আকস্মিক আঘাতে। কেয়ার বাবা বিস্ময়ের সঙ্গে তাকালেন ওর দিকে ! এখানে গান প্রশংসা পাবার জন্য গাওয়া হচ্ছে না—গান এখানে বন্দনার অঙ্গ—স্তোত্রপাঠের মত পবিত্র, পূজার মত গূঢ়-মন্ত্র। অতিথির সম্মান রক্ষা করলো কেয়া—কিছু না বলে উঠে গিয়ে গেলাসে ডাবের জল ঢালতে লাগল। ওর বাবা যন্ত্রটা হাতে নিয়ে আরেকটা গৎ বাজাতে আরম্ভ করলেন। কিংশুক দেখেছে—এ বাড়ীতে সবাই গানের ভক্ত। পুরোহিত ঠাকুরও গান গায়—পাচকও গুণগুণ করে। কিংশুক গাইবে নাকি একখানা ? কিন্তু—না—ঐ পণ্ডিত না বাজিয়ে যদি কেয়া স্বয়ং বাজায় তো সে গাইবে। গাইতে পারে কিংশুক—ভালোই গাইতে পারে।

—বাজাবেন একটু— ? আমি একটা গান গাইতে চাইছি।

—বাজাচ্ছেন তো উনি। গান না ! কেয়া জবাব দিল। কিংশুক অপ্রসন্ন দৃষ্টি মেলে চাইল লোকটার দিকে। সব সময় ও কেন যে মন্দিরেই বসে থাকে ? কাজ-কর্ম্ম কিছুই নাই নাকি লোকটার ? —এই সব অকর্ম্মা কুঁড়েদের স্থান বড়লোকের বাড়ীতেই। বিরক্ত হচ্ছে কিংশুক কিন্তু সেটা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। হঠাৎ কেয়ার বাবা বললেন—বাজান না আপনি নিজেই !

—ও আমি বাজাতে পারি না—বলে কিংশুক অন্য দিকে তাকালো।

কেয়া ভাবের জলটা ঠিক করে ওর বাবাকে দেবে কিনা ভাবছে—কারণ, কিংশুক গাইতে আরম্ভ করলে বাবা এখন খাবেন না। সে ইতস্ততঃ করছে—হঠাৎ কিংশুক বলে বসল—আপনার গানের রেকর্ড করানো উচিত। এত সুন্দর গান—রেকর্ড হলে সবাই শুনতে পারে কিম্বা রেডিওতে যদি গান আপনি··· !

—সবাইকে শোনাবার জন্যে তো গান শিখিনি—পুজোর জন্যে আর নিকট আত্মীয়দের জন্যেই শেখা আমার!

কেয়া মৃদু হাসলো কথাগুলো বলতে বলতে। কিন্তু কিংশুক ঐ কথা কটাকেই অবলম্বন করে বলল—আত্মীয়তার, নৈকট্যের কোনো সংজ্ঞা নেই মিস্ ব্যানার্জী। সারা বাংলার লোক কি আপনার পর? না, ভারতের লোক আপনার আত্মীয় নয়?

—অতটা উদার কিন্তু আমি হতে পারিনি আজো! আজ তাদের আত্মীয় মনে করে গান শোনাবো—কাল নাচ দেখাবো—পরশু হয়তো তারা চাইবে যে আমি অভিনয় করলে আরো ভালো হয়,—আমার শক্তি এই পল্লীপ্রান্তরে অপব্যয়িত হচ্ছে—আমার পরিচয় বিশ্বশুদ্ধ সকলের জানা দরকার—তাহলেই হয়েছে আর কি! খ্যাতির মোহে আমার আত্মার অপমৃত্যু ঘটবে!—কেয়া কথাগুলো হাসিমুখেই বলে গেল। কিংশুকের কিন্তু ভালো লাগলো না। ও আশা করে—কেয়াকে তার সঙ্গিনী করে নিয়ে গিয়ে একবার কোলকাতার এরিষ্টোক্রেট মহলে দেখিয়ে দেবে—বন্য গোলাপ কি বস্তু— কাশ্মীরি পদ্ম কাকে বলে। কাকে বলে রূপ, গুণ আর যৌবন; মানসী প্রিয়া শরীরিণী হলে কি রকম হতে হয়। কিংশুকের আশা প্রসারিত হচ্ছে—ওর দুই দাদাকে ও দেখিয়ে দেবে—ওই জিতেছে—ওই বড় কেল্লাটা মেরেছে! কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, তারপরে যুদ্ধ থামলে বিলাত, আমেরিকা ঘুরে ঘুরে ও প্রমাণ করে দেবে—ইউনিভার্সেল বিউটি বাংলার পল্লীতেই জন্মায়। কেয়া

হবে ওর বিপুল গৌরবের বিজয় পতাকা। গৃহকোণে তার আবদ্ধ থাকাটা পছন্দ করবে কি করে ও?

—আপনার স্বামী যদি সেইটা পছন্দ করেন! যদি তিনি চান যে আপনি বাইরে আসুন সকলের কাছে!

বাবার সামনে কেয়া স্বামীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চায় না—মাথাটা নামালো। ওর বাবাই বললেন—বংশগত কতকগুলো প্রথা থাকে! এ বংশের মেয়েদের পক্ষে রেডিও বা রেকর্ডের কারখানায় যাওয়া এখনো সম্ভব হয় নি। অদূর ভবিষ্যতে হবারো কোন আশা নেই।

কিংশুক রুখে উঠলো। একে তো এই পণ্ডিতকে ও পছন্দ করছে-না—এখানে ওর উপস্থিতি বিরক্তিকর কিংশুকের কাছে—তার উপর এই রকম বংশের দোহাই দিয়ে সেই পুরোনো গোঁড়ামীর ধুয়ো ধরা অসহ্য বোধ হোল ওর। বলে উঠলো—আঃ, আপনি থামুন না স্যার—উনি শিক্ষিত মেয়ে, উনিই জবাব দিন। কতকাল আর এই বংশ বংশ করে কাটাবেন! কত যুগ থাকবে আরো এই সব গোঁড়ামী? এই রকম কুসংস্কার?

—আপনি স্নান করেছেন আজ?—কেয়া হঠাৎ প্রশ্ন করলো ওর হাতের গেলাসটা ওর বাবার হাতে তুলে দিতে দিতে। তারপর মুখ মুছবার তোয়ালে আর হাতে জল দেবার জন্য জল এনে ধরল ওঁর কাছে! কিংশুক অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েছে। স্নান সে করে নি এখনো—মনেই ছিল না! দাড়ী কামিয়ে চুল আঁচড়ে, গেঞ্জী গায়েই বেরিয়ে এসেছে এবং সন্ধ্যা করতে বসে গেছে!

—না, স্নান করা হয় নি এখনো!—বলতে হোল কিংশুককে সত্য কথাই! কারণ স্নানের চিহ্ন নাই শরীরে।

—ওঃ, তাহলে চলুন—চা দিই গে আপনাকে। স্নান পরেই করবেন। বলে কেয়া ওর বাবার হাতে জল দিয়ে হাত মুখ মুছে দিল সযত্নে। কে

ইনি! কে? কাকে কিংশুক ধমক দিল এমন করে এখনি! এ কে? যার মুখ হাত রাজকুমারী কেয়া স্বহস্তে মুছিয়ে দেয়? কিংশুক সন্দেহান্বিত হতে হতে নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে গেল—নিশ্চুপ হয়ে গেল—নির্ব্বোধ বনে গেল—।

—এই বইটা তুমি পড় তো বাবা—তারপর প্রশ্ন আছে আমাব; আমি যাচ্ছি দাদুর কাছে!—কেয়া বলল।

হা ভগবান! এ কি করলো কিংশুক! কি করে বসল! কিন্তু যেমন করে হোক সাম্‌লে নিতে হবে ব্যাপাবটা।

—ওঁর সঙ্গে আমার পবিচয় তো করিয়ে দেন নি? বেশ কিন্তু আপনি!—কিংশুক অভিযোগ এনে ফয়সালা করতে চায় ব্যাপাবটার।

—পরিচয়? না দিইনি করে। কি জন্যে দেব? এই পৃথিবীব কারো সঙ্গে ওঁর কোনো সম্পর্ক নেই। উনি শুধু এখন আমার বাবা।

কেয়া ওর বাবাব পিছনে হাঁটু গেড়ে বসে ওঁর খোলা পিঠের উপব গাল রাখল! কেয়ার ভিজে লতানো চুলগুলো পড়ছে বাবার পায়ের উপর। উনি বললেন—চুলগুলো শুকো—গিয়ে মা, বাদলা করেছে!

—শুকিয়ে যাবে বাবা—এমনিতেই শুকিয়ে যাবে—কিছু ভেবো না তুমি—কেয়া কান্নায় যেন আছড়ে পড়ছে বাবার পিঠে। ওর মাথাটা কোলের উপর টেনে নিতে নিতে বাবা বললেন—আবার কাঁদে? দিনে দিনে তুই কি হচ্ছিস কেয়া? যা, ওঠ, চা দিগে ওঁদের। ঐ দেখ মণ্টু, চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে। এস মণ্টু...ওঠ্ কেয়া,—যা মা!

কেয়া সাম্‌লে উঠে পড়ল। বাবা ওর পিঠে হাত দিয়ে বললেন—বইট এখনি পড়বো আমি।

—সাহিত্য-প্রীতি আপনাদের সকলেরই আছে দেখছি—কথাটা বলে কিংশুক তাকালো কেয়ার বাবার পানে।

—আছে যৎসামান্য। আর আমি চাই, কেয়ার সাহিত্য-প্রীতিটা বাড়ুক। সাহিত্য মানুষকে বড়ো করতে সাহায্য করে।

—বাংলায় কি সে-রকম সাহিত্য সৃষ্টি হয় মনে করেন? বিনীত তর্কের সুর তুললো।

—না-যদি এখনো হয়ে থাকে তো হবে। হাওয়াটাই আকাঙ্ক্ষা আমরা। সাহিত্য বড় না হলে জাতীয় জীবনের কোনো স্পন্দনই অনুভূত হবে না, জাতির জাগরণের কোনো উপায়ই থাকবে না!

—সে কথা নিশ্চয় সত্য! সাহিত্য সকল দেশকে বড় করেছে, কিন্তু আমাদের দেশে বর্ত্তমানে যে সব সাহিত্য সৃষ্টি হয় তাকে সাহিত্য বলা চলে না—সে হচ্ছে অনুকরণ করবার ব্যর্থ প্রয়াস আর এই অনুকরণই আনছে নানান রকম আবিলতা সমাজের মধ্যে।

—হয়তো কিছুটা আবিলতা আসছে, তবু নিরাশ হবার কারণ নেই; ওর মধ্যে থেকেই বড় সাহিত্য গড়ে উঠবে।

—কৈ? কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। ওদেশের কতকগুলো সস্তা যৌন-সমস্যা আর গোয়েন্দা-কাহিনী—তার সঙ্গে এদেশের কুলী-মজুর, কৃষক, শ্রমিক, ধনী, মধ্যবিত্তের জীবন-চরিতের মধ্যে কতকগুলো ক্লশপনা নয় তো ফ্রয়েডপনা ঢুকিয়ে এদেশে সাহিত্য করা হয়। সময় সময় সস্তা রাজনৈতিক প্যাঁচ ঝেড়ে দেওয়া হয়; সে-রাজনীতির মধ্যে মৌলিক চিন্তার কিছুমাত্র ইঙ্গিত নাই—আছে চর্ব্বিত চর্ব্বন!

—মৌলিক রচনা খুব কম লেখকের হাত দিয়েই বেরয়—কেয়ার বাবা আস্তে আস্তে বললেন। তবে এদেশের পাঠকরাও এখন পড়তে শিখেছে, বুঝতে শিখেছে—দাবী করতে শিখেছে সাহিত্যিকের কাছে।

—কোথায়? ভালো বই বিক্রী হয় না মোটেই! সস্তা ডিটেকটিভ বই আর যৌনতত্ত্ব অজস্র বিক্রী হয়!

—হোক না—তাতে প্রমাণিত হয় না যে পাঁপড়ভাজা রাবড়ীর থেকে ভালো জিনিষ। পাঁপড়ভাজার খদ্দের সব দেশে সব কালেই বেশী থাকে—রাবড়ীর খদ্দের কম। একজন বিখ্যাত লেখক বলেছেন,

সব থেকে ভালো বই সব থেকে কম বিক্রী হয়েছে—কারণ যে ভালো, সে কথা বোঝে কম লোকেই!—যান, চা খান গে; গেছে—কেয়ার বাবা উঠলেন।

প্রসঙ্গটা যে উনি আর চালাতে চান না, এটা বুঝতে দেরী হল না কিংশুকের এবং ও নিজেও আর চায় না চালাতে। ও প্রসঙ্গটার অবতারণা করার একমাত্র উদ্দেশ্য, ওঁর কাছে মৌখিক ক্ষমা না চেয়ে দু'চারটে কথা বলে নিজের নিরীহত্বের প্রমাণ করা। কিংশুক ওঁকে চিনতো না বলেই ধমকে কথা বলেছিল—নইলে কি আর কেয়ার বাবাকে ওভাবে কিছু বলতো সে? যাই হোক—উদ্দেশ্য সফল হয়েছে ওর। কেয়া মণ্টুর হাত ধরে আসছে এগিয়ে, কিংশুক পিছন থেকে বলল,—বইটা কি মণ্টু সঙ্গে এনেছিল?

—না—লেখাদিদি দিয়েছিলেন আমায়; ওর পড়ে ভালো লেগেছিল।

—দেবেন তো বাবার পড়া হলে একবার; দেখতে হবে অঞ্জন কি রকম লেখে!

—একখানা বই পড়ে একটা লেখকের সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।

—একখানাই যথেষ্ট! বাংলা উপন্যাসের প্রথম পাতা আর শেষ পাতা পড়েই বলে দেওয়া যায়—কি আছে!

—আপনি বাংলা উপন্যাস পড়েন নি তাহলে! পড়েছেন বড়তলার রাবিশ—কেয়া বেশ জোরেই বলল কথাটা। বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরতের সাহিত্যকে আপনি এতখানা ছোট দেখেন? আপনি বাঙ্গালী না বিদেশী? নিজের জাতীয়-সাহিত্যের উপর আপনার অসীম দরদ দেখছি তো!

কিংশুক বড় বেশী থতমত খেয়ে গেল। এতখানা পৌরুষ দেখাতে যাওয়া ভুল হয়েছে ওর। বলল—আপনাকে রাগাবার জন্যে বললাম মিস্ ব্যানার্জী! আপনি বাংলা উপন্যাসের ভক্ত কিনা—তাই রাগাচ্ছি!

—আপনি তো নন ভক্ত! থাক, হয়ে কাজ নেই। চলো মণ্টু, দাঁড়ালে কেন আবার?

—আপনি জানেন না মিস ব্যানার্জ্জী, এমন কোনো বাংলা বই নাই যা বেরুবামাত্র আমরা না কিনি···।

—লেখকরা তাতে ধন্য হন না—পাবলিসারদের টাকা বাড়ে। যদি পড়তেন তো রাত জেগে আর না খেয়ে বই লেখা সার্থক মনে করতেন তাঁরা। আপনার টাকা আছে, বই না কিনবেন কেন। চাল বজায় রাখবার জন্যই কেনেন।

—পড়িও! অবশ্য সময় এখন খুবই কম পাচ্চি—আমি এই মিলিটারী কাজের জন্য কিছুদিন···।

—ধন্যবাদ! সারা বাংলার লেখকদের তরফ থেকে আমিই আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্চি যে আপনি দয়া করে পড়েন!

—কেয়ার কণ্ঠে কিন্তু ব্যঙ্গের সুর এখনো ধ্বনিত হচ্চে। ও বিশ্বাস করছে না যে কিংশুক পড়ে। কি করা যায়? কি বলা যায় ভাবছে কিংশুক, মণ্টু চট্‌পট্ করে বলে উঠলো,—দাদা একদিন বলছিল কেয়াদি, যে, অনেক বড়লোক নাকি বই কিনে ঘর সাজিয়ে রাখে, তা আমি শুধোলাম যে বইগুলো কি হয় দাদা, উইএ কাটে? তা বলল, না রে মুখ্যু, উই কোথায় পাবি—রোজ দুটো চাকর ঝাড়পুঁছ করে—চকচকে করে আলমারীতে রাখে, আর কোন ভদ্রলোক এলে দেখায় যে এত এত বই আছে ওদের।

—তা হবে ভাই—ওঁকে জিজ্ঞাসা কর না!

কিংশুক খানিকটা অন্যমনস্ক ছিল—কথাটা ভালো করে শোনেনি, —কি বলছেন?

—না, কিছু না—চলুন। দাদু হয়তো বসে থাকবেন। দাদু-সাহেবকে দেখে এলে ভাই মণ্টু?

—হুঁ—দাদুসাহেব ভাল আছে ; উঠে বসেছে। বলছিল যে কেয়াদিদি যেন আসে একবার।

—হাঁ, চা খেয়েই যাচ্ছি, চল !

সবাই এসে পৌঁছালো ঠাকুরদা যেখানে বসে আছেন। উনি আজো ক্রুসেন্ সল্ট খাচ্চেন !

—এ তোমার একটা বাতিক দাদু। রোজ ঐ ওষুধটা কেনো যে খাও !

—আমার বয়স হোক তোর, তখন দেখবি, খেতে হয় কিনা—ঠাকুরদা উত্তর দিয়ে সবাইকে বসতে বললেন, কিংশুক পূর্ব্বের সাহিত্যিক প্রসঙ্গটায় ফিরে যেতে যায়—কারণ ও বুঝেছে, কেয়ার যথেষ্ট সাহিত্য-প্রীতি আছে এবং এই দিক দিয়েই ওর সঙ্গে ভালো আলাপ জমতে পারে। একটা বড্ড আফশোষের বিষয়—কেয়া কবিতা ভালবাসে, কিন্তু কিংশুক ওটা একেবারে পছন্দ করে না। কবিদের ও এপর্য্যন্ত ঘৃণাই করে এসেছে—কবির মেয়েলিপনা ওর বেজায় রকম বিরক্তিকর ঠেকে, এবং ও ভেবে দেখেছে—অঞ্জনকে সে যে পছন্দ করতে পারেনি—তার অন্যতম কারণ অঞ্জনের কবি হওয়া। যাই হোক, প্রসঙ্গটা পুনরায় আরম্ভ করবার সুযোগ খুঁজে নিতে ওর দেরী হল না—বলল—দাদাজীকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, যদি অনুমতি পাই—।

বৃদ্ধ খুসিমনে হাসিমুখে তাকালেন ওর দিকে। বললেন—বলো ভাই সাহেব—দাদাজীকে যার যত ইচ্ছে জিজ্ঞাসা করো—উত্তর না দিতে পারলেও ক্ষতি হবে না তোমাদের—আমি এখন 'বুড়ি', আমাকে ছুঁয়ে তোমরা খেলায় জেতো যে পার—বলো, কি কথা !

—বলছিলাম যে, রামায়ণ মহাভারতের থেকে ভালো কোনো বই আপনি বাংলা ভাষায় পড়েছেন কি না ?

দাদু মিনিট খানেক চুপ করে থেকে বললেন—এসব কথা আমায় কেন শুধোও ভাই ? আমি হচ্ছি গে সেকেলে বুড়ো মানুষ, তখন

স্কটের সঙ্গে বঙ্কিমের তুলনা না করে আমরা শান্তি পেতাম না। বঙ্কিম যে বঙ্কিম আর স্কট্ যে স্কট্—তুলনা অনাবশ্যক, একথা শুনতে চাইতাম না আমরা। বঙ্কিমের মর্য্যাদা স্কটের সমান হলে তবে আমরা খুসি হতাম! আমরা মিলটন, সেক্সপীয়ার, শেলী, ব্রাউনিং তারপর ওর নাম কি, আহা, কাউপার—ঐ সবই পড়তাম আর ভাবতাম—রামায়ণ মহাভারত—একদম গাঁজা! ওতে আর আছে কি?

—সেটা তোমাদের তখনকার দৃষ্টির দোষ দাদু—কেয়া বলল—তার জন্যে দায়ী তোমাদের সেকালের শিক্ষা—খান, চা খান মিঃ চট্টরাজ; আমি দিচ্ছি কথার জবাব আপনার।

কেয়া চায়ের বাটিটা এগিয়ে দিল—খাবার দিল মণ্টু আর কিংশুককে, পরে বলল—রামায়ণ-মহাভারতের থেকে ভালো কোন বই কেউ-ই পড়েনি আর কখনো পড়বে না—কারণ যে লেখকের লেখা নিয়েই আপনি তুলনা করতে যান—ভুল হবে। প্রত্যেক লেখকই তাঁর নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ। ওই দুটি মহাগ্রন্থ যাঁরা লিখেছেন—তাঁরা সে যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক—শ্রেষ্ঠ রচনা দান করে গেছেন—আজও তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় আছে সেই যুগের এবং এই বর্ত্তমান যুগের প্রবাহধারায়। ও দুটি ভালো বই—পড়বার মত বই—এর বেশী কিছু বলে—ওদের থেকে শ্রেষ্ঠ বই এর সন্ধান করে, ওদের মর্য্যাদা খাটো করা, সাহিত্য-প্রীতির লক্ষণ নয়।

কিংশুক বিব্রত বোধ করলো—তাড়াতাড়ি বলল—আমি বলছি যে আরো উচ্চস্তরের…

—না, বলতে পারেন না আপনি। রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে অন্য বইএর তুলনা করবার তো কোনো দরকার নেই। ও দুটি কেমন বই, কেমন আপনার লাগলো—পড়ে কি পেলেন, এ নিয়ে আপনি যত ইচ্ছে মাথা ঘামান—অন্য লেখকের সঙ্গে ওদের তুলনা করা ঠিক হবে না! ওরা যে যুগে যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে ও-বই লিখে গেছেন, তাকে তো

আর ফিরিয়ে আনতে পারবেন না—ওঁরা যা লিখেছেন, তাই আপনাকে মেনে নিতে হবে এবং সেই যুগকে, সেই যুগের আচার পদ্ধতিকে, সেই যুগের পূর্ব্বতন সাহিত্যকেও বিবে১না করতে হবে!

কিংশুক দেখলো, তর্কটা বেয়াড়া রূপ নিচ্ছে! রামায়ণ মহাভারত দিয়ে সুবিধে হবে না—ঘুরিয়ে অন্য একটা তর্ক তুলবার জন্য বলল, —বেশ, আধুনিক সাহিত্যে আসা যাক্।

—আপনার ভালো পড়া নেই আধুনিক বই—বলল কেয়া—বর্ত্তমান বাংলার ক'টা লেখকের নাম জানেন আপনি বলুন তো আগে! কজনের নাম জানেন—জানেন কারো নাম?

—হ্যাঁ—নিশ্চয় জানি!—কিংশুক অপমানিত বোধ করে রাঙা হয়ে উঠেছে। এরকম প্রশ্ন একটা মেয়ে ওকে করবে—এ একেবারে অসহ্য, হোক সে যতই সুন্দরী—কিংশুক ভেতবে ভেতরে বেশ রেগে উঠলো। বলল—কিন্তু নাম মুখস্থ করবার তো কিছু দরকার নেই—ওসব মেয়েদের কাজ—বিয়ের জন্যে কনে' দেখতে এলে বলতে পারবে—'এই এই লেখকের বই পড়া আছে—এই এই সিনেমা দেখা আছে, এই এতগুলো মাসিক পত্র কেনা হয়।'

কেয়া একটু বিস্মিত হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—কনে' দেখতে এসে এই সব কথা জিজ্ঞাসা করে নাকি?—হ্যাঁ দাদু, করে জিজ্ঞাসা?

—কি জানি ভাই দিদি—আজকাল করছে হয়তো! দিনকাল যে-রকম পড়েছে!

—হ্যাঁ, জিজ্ঞাসা না করলেও কনেদের জেনে রাখা উচিত—যদিই করে বসে জিজ্ঞাসা!—কিংশুক কথাটা বলে তাকালো কেয়ার পানে! বেশ প্রতিঘাত করেছে ও কেয়াকে এবার। কেয়া বিবাহযোগ্যা মেয়ে—অতএব কনে'। তাই বই পড়ুক আর না পড়ুক—লেখকের নাম মুখস্থ

করে রেখেছে—এই কথাটা কিংশুক কায়দা করে বেশ বলে নিল।

—ওম্ মা, তাহলে তো মুখস্থই করতে হবে! কি বলো দাদু! লেখকদের নামগুলো তাহলে আজ থেকে মুখস্থ করা যাক—তোমার সুবিধে হয়ে যাবে!

—আমার আর কি সুবিধে ভাই দিদি—তোর বরের সুবিধে হবে কি না শুধোস!—দাদু বললেন!

বিদ্রূপটা কেয়া গ্রাহ্যমাত্র করলো না দেখে কিংশুক খানিকটা হতাশ হয়ে বলল—আপনার কথা আমি বলছি না, অনেক মেয়েই আছে যারা শুধু লেখকের নামগুলোই জেনে রেখে দেয়।

—কিছু খারাপ করে না তারা। বই পড়বার সুযোগ-সুবিধা সকলের না হতে পারে—তবু যে খোঁজ করে দেশের চিন্তাশীল লেখকদের নাম জেনে রাখে তারা—এটাও প্রশংসার কথা।

—তা অবিশ্যি সত্যি! তবে কথা কি জানেন? বাংলা দেশের সাহিত্য এখনো গণ-চেতনাকে জাগাতে পারে নি। কারণ গণ-মনের সঙ্গে লেখকদের মোটেই পরিচয় নেই—পরিচয় রাখতে ভয় করে ওরা—ওদের দারিদ্র্যকে লেখকরা ভীতির চক্ষে দেখে! দেশের গণশক্তি যদি কোনো দিন শিক্ষিত হয়—তাহলে তাদের মধ্যে থেকেই আবির্ভাব হবে শক্তিশালী লেখকের—সে লেখক গণ-মনকে নাড়া দিতে পারবে—জাগাতে পারবে! এখন যারা গণসাহিত্য লেখেন—দেশের গণমন সেটুকুও পড়বার সুযোগ পায় না।

কথাগুলো মূল্যবান; কেয়া আর একটু চা ঢেলে দিল কিংশুককে। কিংশুক সোৎসাহে বলল—

—যে চাষীর কথা বা যে চাঁড়াল-বধূটির কথা নিয়ে গল্পটি লেখা হল—সেই চাঁড়াল বধূ বা সেই চাষী যদি শোনে যে এই তার জীবনের গল্প, তাহলে সে হেসে লুটোপুটি খাবে! রাশিয়ার অনুকরণে যে কুলি

মজুরদের নিয়ে আজকাল লেখকরা এত হৈ চৈ করছেন—সেই কুলিমজুররা ওর কতটুকু বোঝে—বলুন তো? মুষ্টিমেয় কয়জন শিক্ষিত লোক একটা নতুন জিনিষের চকমকানিতে ঝলসে যাচ্ছে আর বলছে "বাহবা সাহিত্য হয়েছে"। সাহিত্য অন্তরের উচ্চতম আবেদন—জীবনের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ—ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতম ইঙ্গিত! সস্তা কল্পনা আর মেকী রাজনীতির প্যাচ ঝেড়ে গল্পের কয়েকটা পাত্র পাত্রীকে জেল ঘুরিয়ে এনে যা রোগে ভুগিয়ে মেরে ফেলে পাঠকের চোখে জল বহালেই সাহিত্য হয় না!

—আর চা দেব একটু? কেয়া শুধুলো—বললো—আপনার একথা মানতে রাজি আছি আমি!

—মানতেই হবে—কারণ এই কথাই সত্য! বাংলা সাহিত্য একটা গিলিত চর্বন। লেখা খুবই পড়তো বাংলা বই—বারণ করতাম, শুনতো না। ও পড়ে লাভ কি হয় বলতে পারেন? রবি ঠাকুরের আমলের মেয়েলি কবিতা আর ন্যাকা-ন্যাকা গল্প—তারপর এই আধুনিকদের অশ্লিলতা আর আত্মহত্যার হিড়িক, জাতটাকে চরম দুর্ব্বল করে দিল!

—রবি ঠাকুরই কি এর জন্য দায়ী—বলছেন?

—না, দায়ী হচ্ছে শ্রীগৌরাঙ্গ দেব! ঐ মহাপুরুষটি যদি না জন্মাতেন তো বাংলাদেশের আজ এ দুর্দ্দশা হোত না। উনিই কীর্ত্তনের কান্নার আওয়াজ বের করে মেয়েলী-চালে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে শেখালেন—বীরের জাতিটাকে ধ্বংস করে দিলেন একেবারে। ওঁর ঐ "মেরেছ কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না"—যত সর্ব্বনাশের মূল। জাগাই-মাধাই মদ খেয়ে গুণ্ডামী করতো। করতো তো করতো! বীর ছিল তারা। রোজগার করতো, ভোগও করতো! বাঁচতে জানতো তারা খেয়ে আর খাইয়ে। মহাপ্রভু তাদের সেই শক্তির উপাসনা ছাড়িয়ে দীক্ষা দিলেন মেয়েলী কীর্ত্তনে। ঐ কীর্ত্তনটাই যত নষ্টের জড়।

—শুনতে কিন্তু খুবই মিষ্টি—কেয়া হেসে বলল!

—হ্যাঁ—মেয়েলী বলে মিষ্টি। মেয়েদের সবই মিষ্টি। হাসি মিষ্টি, কাসি মিষ্টি, শাড়ীর আঁচল মিষ্টি—পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের ডগার আলতা-টুকুন অবধি মিষ্টি—কিংশুক খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

কেয়া হেসে উঠলো—ঠাকুরদাও সেই সঙ্গে। মণ্টু বলল—কেয়া দিদি দাদুকে দেখবেন চলুন।—ওরা উঠে গেল।

১৩

কাজল ঘুমিয়ে গেছে—কাটিম জেগে উঠে ওর মা'র গলার সরু হারগাছটা টানাটানি করছে।

অঞ্জন অফিস ঘর থেকে কি একটা দরকারে এঘরে এসে দেখলো। কাটিম ওকে দেখেই বলল—বা···বা—বা—মাম্ মা উছ্ না···।

ওর কথা এখনো নিদারুণ অস্পষ্ট।—"ছেলেটা বোবা হবে নাকি?" কাজল কত সময় বলে—যদিও বোবা হবার কোনো লক্ষণ নাই। কাটিমের কথা বলার বয়স পার হয়ে যায় নি। তাছাড়া কাটিমের একটা মস্ত দোষ, ও কাঁদতে প্রায় জানেই না। কচি ছেলে এক-আধটু কাঁদবে, এটা নিয়ম; গলার স্বর ওতে খোলে জিভের আড়ষ্টতা ভাঙ্গে; ফুসফুস জোরালো হয়—কাজল কোন এক বইতে এই সব পড়ে রেখেছে—অনাদর করে এক ধারে বসিয়ে রেখে অনেকক্ষণ মাই-দুধ না দিয়ে, বকে, ধমক দিয়ে, ভয় দেখিয়ে কাজল ওকে কাঁদাবার চেষ্টা করে যত ও হাসে তত বেশি। "এমন ছেলে আর দেখা যায় না বাপু—"বলে কাজল। কাটিম কাঁদলে যে ওর কত অসুবিধা হোত, সে দিকটা ভাবতেই চায় না। আজও কাটিম কাঁদেনি—খেলা করছে।

—উঠছে না তো দে না এক থাপ্পড় বসিয়ে···। অঞ্জন বলল ছেলেকে! কাটিম হামা দিয়ে ওর মার বুকের উপর উঠে বলল; ডাকতে লাগল—

মা-মা মা-মা মাম্মা…!

চোখ খুললো কাজল—আঁ! এক রত্তি ঘুমোবো—দস্যির জ্বালায় তাব যোটি নেই…!

কাজল পাশ ফিরতে গিয়ে অঞ্জনকে দেখলো। হাসছে অঞ্জন।—হাসছো কিসের? নিয়ে যাও ছেলে আপনার—

—আমার অংশটুকু নিতে আমি রাজি আছি—তোমাব অংশটা নিয়ে তুমি রাখো—বললো অঞ্জন!

—আমাব কিছু অংশ নেই—বড় হলে লোকে শুধুবে, ও কাব ছেলে, না, অমুক বাবুর ছেলে; আমার নাম মোটে করবে না।

কাজল টেনে নিলে কাটিককে বুকে—মাই-দুধ মুখে দিয়ে বলল—খা—খা শয়তান—চুষে চুষে খেয়ে নে!

অঞ্জন তার কি একটা জিনিষ আলমারী থেকে বাব কবছিল। অন্যমনস্ক ভাবেই হঠাৎ বলল—সত্যি! তোমাকে চুষে খাচ্ছে ছেলেটা! বুড়ো করে দিল একবারে!

—দিল তো! দিল সত্যি! কোথাও একটু যেতে পাই না, কিছু না—হাত পায়েব বেড়ি হয়েছে!

অঞ্জন মুখ তুলে তাকালো এতক্ষণে। কাজল এরকম কথা বলবে, আশা করেন নি ও!

কাটিমের মাই-দুধ খাবার বয়স এখনো পার হয় নি এবং কাজল যে কাটিমকে হাত-পায়ের বেড়ি সত্যি মনে করবে—তাও সম্ভব নয়; তা'হলে এরকম কথা মুখ দিয়ে বার হোল কি করে কাজলের!

হয়তো একটা কথার কথা, কিন্তু অঞ্জন তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষক। কাজলের সারা মুখ খানায় কি যেন খুঁজে ফিরছে ও—কোনো ইঙ্গিত, কোনো প্রচ্ছন্ন বিরক্তির আভাস অথবা কোনো অপুরিত আকাঙ্ক্ষা! নাঃ, অঞ্জন কিছুই খুঁজে পেল না—কাজল দিব্যি দুধ খাওয়াচ্ছে ছেলেকে—আর

ছেলেটাও ঠিক যেমন করে সব ছেলেই একটা দুধ খায় আর নাড়ে অন্যটা—তাই করছে নিশ্চিন্ত মনে।

—একটা আয়া রেখে দিচ্ছি কাজল—আজই রেখে দিচ্ছি!

—কিসের জন্যে?—কাজল শুধোলো।

—কাটিমের জন্যে—বলে অঞ্জন জিনিষটা বার করে নিয়ে অফিস-ঘরে ফিরলো। কাজল তখন আর কিছু বলল না—বলবার সময়ও পেল না! উঠে ও গৃহকাজে মনোনিবেশ করলো এর পরে!

প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে—অঞ্জনের সঙ্গে কওয়া কথাগুলো ভুলেই গেছে কাজল, হঠাৎ একটি প্রৌঢ়া ভদ্রমেয়ে এসে বলল—সেলাম মাইজি। কাটিম ঐখানেই কয়েক টুকরো কয়লা মুখে দিয়ে আস্বাদ গ্রহণ করছিল—মেয়েটি তাকে তুলে নিয়ে মুখটা মুছিয়ে দিতে দিতে বলতে লাগল—ছিঃ ছিঃ! খেতে নাই—এ সব খেতে নাই বাপজান—! ও আদর করতে লাগল কাটিমকে!

পরিচয় না পেলেও কাজল বুঝতে পারলো, অঞ্জন একেই আয়া নিযুক্ত করেছে কাটিমের জন্য! ভালই করেছে! কি এমন কথা বলেছে কাজল, যার জন্যে একটা আয়া রাখা—কিছু তো দরকার ছিল না! আচ্ছা, রাখুক না—খরচ হবে ওরই, আমার আর কি—রাখুক। মাইনে তো লাগবে!

কাজলের অভিমান হচ্ছে—কেন, তা ও নিজেই বুঝতে পারছে না। আয়া রেখে অঞ্জন ওর কাজ কমিয়ে দিতে চায়—ওকে একটু বেশি সময় দিতে চায় পড়াশুনা করবার, গৃহকাজ করবার, বেড়াতে যাবার—কাজলের কাজের ঝামেলাটা একটু কমিয়ে দিতে চায় অঞ্জন—উদ্দেশ্য ওর নিশ্চয়ই ভালো, কিন্তু কাজলের যেন ভালো লাগছে না! না ভালো লাগবার কি কারণ? অনভ্যাস? বেশি ঝি-চাকর রাখার বড়মানুষীর অনভ্যাসই! দুদিনেই কিন্তু সয়ে যাবে কাজলের। কিন্তু কাজল যেন অন্য কারণে রাগ

করছে! কি সে কারণ—চিন্তা করলো না কাজল। নিজের কাজ করতে লাগল। আয়াটা কাটিমকে ধুয়ে মুছে সাজিয়ে দুধ খাইয়ে বেড়াতে নিয়ে গেল—কাজল এতটা সময় গৃহকাজ করেছে। এবার ভালো করে সাজগোজ করে অঞ্জনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। অঞ্জন এলো বৈকালিক জলযোগের জন্য—হাতে একটা খাম।

—কার চিঠি? কাজল শুধোলো!

—চিঠি নয়—টেলিগ্রাম—বসো, বলছি! অঞ্জন নিজেই বসল খাটের একধারে। পল্লিবাসিনী কাজল 'টেলিগ্রাম' কথাটা শুনেই অত্যন্ত চমকে উঠেছে। মুখ শুকিয়ে গেছে ওর। অঞ্জন বুঝে বলল, না—ভয়ের কিছু নাই, শোনো! দাদুর বুড়ো শরীর—চোট লাগলে সারতে একটু দেরী হবে—তার জন্যে ভাববার কিছু নাই। মণ্টুর আবার অসুখ করেছে—লিখেছে কেয়া। জলে ভিজেছে বোধ হয়।

—মণ্টুর অসুখ? কি অসুখ? কাজল অতিশয় উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলো!

—জ্বর; হয়তো একটু বেশি জ্বর—তাই 'টেলি' করেছে! আজকার ট্রেনেই গিয়ে দেখে আসি।

কাজল চুপ করে রইল! অঞ্জনকে যেতে মানা করতে পারে না ও! বরং কাজলকেও যদি অঞ্জন নিয়ে যায় তো ভালো হয়। নিয়ে কি যাবে? বললো আস্তে—আমারও যেতে ইচ্ছে করছে! কে ওকে দেখবে ওখেনে? যা দস্যি ছেলে!

—না, দেখবার লোকের অভাব হবে না—তবে তোমার ভাই-লক্ষণটির নানা গুণ; সাবু খাবে না, ওষুধ খেতে চাইবে না—শুয়ে থাকতে রাজি হবে না। পরের বাড়ীতে ও সব আব্দার চলতে পারে না! তেমন বেশি অসুখ দেখি ত কালই বাড়ী নিয়ে আসব!

কাজল নিঃশব্দে চা পরিবেশন করছে। মণ্টুকে কাজল অত্যন্ত স্নেহ

করে। তার অসুখের সংবাদে ও যে খুবই বিচলিত হবে এটা স্বাভাবিক! অঞ্জন ওর পানে চেয়ে বলল—দু-তিনটে দিন একা থাকতে পারবে না?

—না পারলে আর উপায় কি? আমায় তো আর নিয়ে যাবে না তুমি?

তুমি সেই পুজোর সময় যাবে কাজল! এখন গেলে আর এখন ফিরিয়ে আনা হবে না। তাছাড়া, তোমায় নিয়ে যেতে হলে আজকার ট্রেণে যাওয়া চলে না। আমি কালই ফিরে আসব!

কাজল ভালো করে সাজ-গোজ করেছিল বেড়াতে যাবার জন্যে। ওর যেন বিষ লাগছে সে সব এখন! বিরক্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে মন। বেড়াতে যাবার কথা মনেও আসছে না আর।

—এই সন্ধ্যে সাড়ে ছয়টার মেল ধরলে কাল সকাল নটায় পৌঁছে যাব—অঞ্জন বলল।

—যাও, দেখে এসো।—কাজল শুষ্ক কণ্ঠে বলল। ওর মনের পাতে কি লেখা রয়েছে অঞ্জন জানে। জানে, কাজল মণ্টুর জন্যে দুশ্চিন্তায় আতুর হয়ে উঠেছে। বলল আস্তে আস্তে—

—একটা জরুরী কাজ সেরে আসি আমি; তুমি একটা সুটকেশে, দুটো জামা কাপড় গুছিয়ে দাও।

অঞ্জন চলে গেল সাইকেলে চড়ে বাইরের দিকে। কাজল জানালা পথে দেখলো চেয়ে চেয়ে; তারপর অঞ্জনের সুটকেশ গোছাতে আরম্ভ করলো। মনটা যেন কিসের একটা অভাবে ক্লিষ্ট হয়ে উঠেছে—কি যেন পাওয়া হোল না—কোথায় যেন কি অভাব থেকে গেল!

ফিরতে দেরী হোল না অঞ্জনের। কাজল এর মধ্যে সুটকেশ গুছিয়ে খাবার তৈরী করে এমন কি জুতোতে কালি পর্য্যন্ত দিয়ে ঠিক করে রেখেছে। অঞ্জন ঘরে ঢুকেই একচোখ দেখে নিয়ে বলল—

—ভারী লক্ষী মেয়ে। এর মধ্যে সব করে ফেলেছো! কাজলকে

আদর করলো ও!—স্বামীর স্তিমিত আদর। নিতান্ত ঘরোয়া—নিতান্ত পুরোনো—একান্ত প্রাপ্য বস্তু! কাজল চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল।

মন ওর ভালো নেই—ভাবলো অঞ্জন। কয়েকটা কাগজপত্র ওখানকার লোকদের বুঝিয়ে দিয়ে কাজলকে আর একবার তেমনি আদর করে, কাটিমকে চুমা দিয়ে ও বেরিয়ে গেল। বলে গেল—আয়া দিনরাত্রি থাকবে তার কাছে। তাছাড়া অন্য সব তো রইলই।

কোনো কাজ আর এখন নাই কাজলের। কাটিম এর মধ্যে আয়াটার সঙ্গে দিব্যি ভাব জমিয়ে ফেলেছে। ঠিক মাধবী যেমন করে কাটিমকে অবলম্বন করেছিল—এই আয়াটাও যেন তাই। ও যেন মাধবীরই দ্বিতীয় সংস্করণ। কাটিমকে কত কি খেলা শেখাচ্ছে ও, কত কি গান-ছড়া বলছে—কত অদ্ভুত ভাষায় আদর করছে। কাজল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল শিক্ষায়তনের আঙিনায়। সবাই এখান ওকে চেনে—সমীহ করে, সম্মান করে! ছেলেমেয়েগুলো ওকে দেখে খুবই আনন্দ করতে লাগল। ওদের তখন বৈকালিক-খেলা চলছে—নাজির যে খেলা শেখায়। সে না থাকায় অন্য লোক শেখাচ্ছে। কাজল দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল একধারে। হঠাৎ বৃষ্টি নামলো জোরে—সবাই এসে ঢুকলো কাছের ঘরটায়—কাজলও। ঘরের মধ্যে খেলার সরঞ্জাম—খেলোয়াড়দের ছবি—যা কিছু খেলারই জিনিষ সাজানো—কিন্তু সামনের দেওয়ালে একটা দৃশ্যচিত্র রয়েছে—চিত্রের মাঝখানে একটি মেয়ের ছবি—ছবিটা কাজলেরই—জানে কাজল—যে কেউ দেখলেই চিনতে পারবে। কাজলের মনে পড়ল—শিলাজিত এই ছবিটা এঁকেছিল—সেই শিলাজিত, সেই কঠিন পাষাণের মত মূর্ত্তি, সেই চলবার অভিনব ভঙ্গী, সেই কথা বলবার আশ্চর্য্য কায়দা। কাজলের খুব বেশী করে মনে পড়ে গেল শিলাজিতের কথাটা। মনে পড়ে গেল, কাজলকে একটু ছুঁয়ে দেবার আগ্রহ, একটা কথা বলবার জন্য ছল খোঁজা—একবার দেখবার জন্য জানালার পথে উঁকি দেওয়া—শিলাজিতের

সব কথাই মনে পড়ছে কাজলের। মনে পড়ছে, সেই গভীর রাত্রে হাত চেপে ধরতে যাওয়া—সেই বিকারের ঘোরে কাজলকে বুকে চেপে ধরা—লাল হয়ে উঠলো কাজল আপদমস্তক একসঙ্গে। শিউরে উঠলো কেন—কে জানে? ওর চারদিকে ছেলেমেয়েগুলো সব দাঁড়িয়ে রয়েছে—ওরা কি কাজলের অন্তরটা পড়ে ফেলতে পারবে নাকি? সেই লজ্জাকর রাত্রি, সেই অনাকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটা কাজলের মনের পটে জীবন্ত হয়ে উঠছে, ঠিক যেমন করে অতীত অভিনয় ছায়া-ছবিতে জীবন্ত হয়ে ওঠে! কাজল আর দাঁড়ালো না—দাঁড়াতে ওর ভরসা হোল না যেন। বৃষ্টির মধ্য দিয়ে ভিজেই ও ঘরে চলে এল।

আয়া কাটিমকে নিয়ে কোথায় আটকেছে বৃষ্টিতে। চাকরটা কোথায় গেছে—ঝি আসে নি। কাজল একা-একা ঘরে; অকাজে-বিনাকাজে কাজল করবে কি এখন? মনের নিবিড় অন্ধকারে ও শুধু শিলাজিতকেই দেখতে পাচ্ছে। রুগ্ন শিলাজিতের সেই অস্পষ্ট কথাটা—"কিস্ মি ডিয়ারী…কিস্…" তখন ও-কথার মানে বুঝতো না কাজল—এখন বোঝে। ইংরাজি খুব বেশি না পড়া হলেও অনেকখানা পড়লো সে এই ক'মাসে! 'কিস'—কিস মানে চুমা খাওয়া—আর অঞ্জন বলেছিল 'প্যাশন'। প্যাশন মানে আজো ঠিক বোঝে না কাজল! তবে শিলাজিতের বলা সেই 'ককেট' কথাটার মানে বুঝে ফেলেছে!

কাপড়টা ছাড়তে হবে—ভিজে গেছে। ভিজুক গে। ছাড়া যাবে এখন। হোক না একটু অসুখ—হোক! কত দীর্ঘ দিন যেন অসুখ করে নি কাজলের—কত-কত না বছর! হোক একবার ওর অসুখ—জ্বর না হয়, যা হয় কিছু অসুখ! বেশ দুচার দিন শুয়ে শুয়ে ভাববে—কত কি ভাববে। ভাববে তার জীবনের ফেলে আসা দিনগুলি—যে দিনগুলিকে সোনার খাঁচায় সে রাখতে পারে নি—স্মৃতির পাতায় যে দিনগুলি গুলিয়ে যায়—ওলট পালট হয়ে যায়। ওর মনের পাতায় যে দিনগুলিকে

টুকে রেখেছে—যার লেখার কালি অস্পষ্ট হয়ে গেছে—তাতে আর একবার দাগা বুলিয়ে নিতে চায় কাজল!

ওর অবচেতন মন অচেতনতার তাগিদে ওকে অঞ্জনের অফিস ঘরে টেনে আনল যেন! খালি ঘর—অঞ্জন এই একটু আগে যেখানে বসেছিল, সেই জায়গার দিকে তাকালো কাজল। শূন্য চেয়ারখানা! ওখানে কিছু দেখবার নাই—কিছুই ভাববার নাই—কাজল এদিকের দরজা পার হয়ে পাশের ঘরে ঢুকলো—যে ঘরে শিলাজিত কয়েকদিন বাস করে গেছে! শিলাজিত যাওয়ার পর এ ঘরে আর কোনো অতিথি আসে নি! শিলাজিতের জন্য পাতা বিছানাটা, ওর জন্য রাখা টিপয়, টেবিল, ফুলদানী সব তেমনি রয়েছে সাজানো! ঐ ঘরের জানালা থেকে দূর দূর পাহাড়, নদী, বন সব দেখা যায়—যার ছবি ঐ ছেলেদের খেলার ঘরের ছবিখানায় এঁকে রেখে গেছে শিলাজিত—আর তার মাঝখানে এঁকেছে কাজলকে। কাজল যেন ঐ প্রকৃতিরাণীর আদরের দুলালী, তাই অমন সুন্দর পট-ভূমিকায় শিলাজিত কাজলের আসন রচনা করে গেছে।

ছবিটা ঐ খেলার ঘরে কেনো রাখলো কাজল? এ ঘরে রাখলেই বেশ হোত! ঐ একটিমাত্র স্মৃতিচিহ্ন রেখে গেছে শিলাজিত—আর কিছু নাই। তার ঐ ক্ষুদ্র স্মৃতিটাকে অতখানা অপমান করবার দরকার কি ছিল এমন? শিলাজিত এমন কিছুই ক্ষতি তার করে নি যার জন্য তার আঁকা ছবিকে ওখানে নির্ব্বাসিত করতে হবে! নাঃ, কাজল ওটা এখানেই আনিয়ে রাখবে—আজই—এখনি! কিন্তু ওটা কি জন্যে ওখানে রাখতে বলেছিল, সে কথাটাও মনে পড়ল কাজলের। অঞ্জনের সেই কথাটাও—"কোথায় ওটা রাখবে কাজল?" কাজল ওটাকে চোখের সমুখ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল, কারণ ওটা তো শুধু ছবি নয়, ওর রেখায় রেখায় শিলাজিতের অন্তরের কামনার উদগ্র আবেদন আছে—কাজলকে পরিপূর্ণ করবার—প্রণয়াস্পদা করবার ইঙ্গিত আছে—কাজলের

ভালোবাসা পাবার আকাঙ্ক্ষা আছে! এটা না বুঝবার মত ছেলেমানুষ নয় কাজল!

ও ছবি আবার এখানে, এই ঘরে আনা যায় কি? না! অঞ্জন এসে কি মনে করবে তাহলে! থাক্, দরকার নেই! যখন ইচ্ছে হবে কাজল গিয়ে দেখে আসবে ছবিটা।

ভিজে কাপড়ে অনেকক্ষণ রয়েছে কাজল! শীত করছে বেশ। ঘরেও আঁধার নেমেছে। খাট, বিছানা, টেবিল কিছুই ভালো করে দেখা যায় না! কাজল আরো এগিয়ে এল খাটখানার দিকে। মশারীটা গুটানো—কিন্তু বিছানাটা পাতাই আছে! কাজল বসলো বিছানায়! কড় কড় কড়—বিদ্যুৎ চমকালো—আলোর আলোময় হয়ে উঠলো চারিদিক—কোথায় কাছেই বাজ পড়লো হয় তো! দূর-দূর অরণ্যানীর দিকে চাইলো কাজল জানালার ফাঁকে। শিলাজিতের শোওয়া বালিশটার ভর দিয়ে জানালার দিকে মুখখানা এগিয়ে আনলো! ওর ভিজে কাপড়ের জল লেগে বিছানাটা ভিজে যাচ্ছে!—আবার একটা বিদ্যুৎ—একটু পরেই প্রচণ্ড শব্দ; ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা এসে কাজলের চোখেমুখে লাগল—পা-তলার চাদরখানা টেনে গায়ে তুলে নিতে চাইল কাজল কিন্তু ওর কাপড় ভিজে; অন্ধকার ঘরে কাজল শাড়ী-ব্লাউজ পেটিকোট গুলোকে টান দিয়ে খুলে ফেলে দিল মেঝেতে—তারপর মোটা চাদরখানা সারা গায়ে জড়িয়ে নিল। ওর দেহে আর কোনো বস্ত্র নেই, শুধু চাদরখানা। বাইরের দরজায় খিল আঁটা আছে—বৃষ্টি এখনো পড়ছে—অঞ্জন এখন কাটিমকে নিয়ে ফিরতে পারবে না। একা, অন্ধকার ঘরে কাজল সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইল জানালা-পথে তাকিয়ে। বিদ্যুতের আলোক—বজ্রের হুংকার আর নাতিদূরস্থ নদীটার জলোচ্ছ্বাস ওর সাথী এখন!

একা—একা—একা এখন কাজল। গভীর আঁধার ওকে আবৃত

করে আছে! বৃষ্টির দুর্ভেদ্য কুহেলি ওকে পাহারা দিচ্ছে—ওর অবসরপ্রাপ্ত অস্তিত্ব ওকে আস্কারা দিচ্ছে! ও যেন মুক্ত, ও যেন স্বাধীন, ওর যেন কোথাও কোনো বন্ধন নেই। এই গভীর অন্ধকারে, এই বিপর্যয়কর বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে ও যা-খুশি-তাই করতে পারে—কেউ ওকে দেখতে আসবে না—কেউ কিছু জানতে পারবে না। ওর গোপন মনের পাতায় পাতায় সব যেন ওলট-পালট খাচ্ছে এই গাছগুলোর ডালপালার মতন। ও যেন কিছু একটা ধরতে চায়, কোনো একটা অবলম্বন,—সবল, সক্ষম, সচেতন অবলম্বন চায় এখন কাজল একটা! সেই সেদিনকার মতন—সেই সেদিন শিলাজিত ওকে সজোরে চেপে ধরেছিল—এই বিছানায়—এই বালিশে মাথা দিয়ে—এই নিস্তব্ধ ঘরে। কাজল তার কোমল দেহখানা টান করে বিছানায় শোয়ালো—একেবারে বিবস্ত্রা। হোক না—কেউ তো নেই—দূর থেকেও কেউ ওকে দেখতে পাবে না—এত অন্ধকার আর বৃষ্টি। এমনি কঠিন জমাট একাকীত্ব যে কতখানি উপভোগ্য তা' জানতো না কাজল।

ওর যেন মনের বল্গা ছিঁড়ে গেছে—কিম্বা বল্গা ছিলই না কোনোদিন। ওর মনে পড়ছে না কোনো দিন কিছু ছিল বলে! ও তো চিরকালই স্বাধীন ছিল, আর স্বাধীন আছে!

বৃষ্টিটা আরো জোরে নামলো—ঘণ্টাখানেকের মধ্যে থামবে না কিছুতেই। বৃষ্টি এ সব দেশে বেশী হয় না, কিন্তু হতে আরম্ভ করলে থামেও না শিগগির! ও দিকের জানালাটায় বৃষ্টির ছাট ঢুকছে ঘরে। কাজল বিদ্যুতের আলোকে দেখতে পেল—উঠে নেমে গিয়ে বন্ধ করে দিল সেই জানালাটা! ঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে এখন কাজল—ভিজে শাড়িটায় পা মুছে অকস্মাৎ আবার খাটে উঠে উবুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে পড়ল শিলাজিতের ব্যবহার-করা সেই লম্বা পাশ-বালিশটার উপর। সবল, সক্ষম, সচেতন হাত দুটো দিয়ে বেষ্টন করে ও কেমন যেন মোহাবিষ্টের মতই বালিশটাকে আঁকড়ে আনলো—গুটিয়ে ফেললো সেটার খাদ্

কাঠিন্ত। এমনি করে এতখানি জোর দিয়ে শিলাজিত ওকে টেনে নিয়েছিল সেদিন—এই রকম করে ঠিক—কাজল চিৎ হয়ে শুয়ে বালিশটা বুকে টেনে নিল! যেন ও নিজেই শিলাজিত সেজে সেদিনের ভূমিকায় অভিনয় করছে—তারপর পাশে টেনে নামাল।—নাঃ—কেউ ওকে দেখছে না—কারো আসবার সম্ভাবনা নেই—কেউ কোথাও সাক্ষী থাকবে না। কাজল বিপুল আগ্রহে বালিশটাকে আঁকড়ে ধরলো—যেন শিলাজিতকেই!

আশ্চর্য্য! এই কল্পিত সম্ভোগের মাধুর্য্য অপরূপ—অনবদ্য! ভাষায় একে প্রকাশ করা অসম্ভব—কেউ কোনো দিন করে নি প্রকাশ। কাজলের সারা মন-প্রাণ-দেহ এক অতুলনীয় সুখ-শিহরণে ঝঙ্কৃত হচ্ছে। কি এক অনাস্বাদিত মাদকতায় ওকে ডুবিয়ে দিয়েছে। ও অঞ্জনের স্ত্রী—কাজলের মা—মন্টুর বৌদি—যে মন্টু অসুস্থ—যার জন্ত কাজলের মানত করবার কথা ঠাকুরের কাছে—মাথা খুঁড়বার কথা দেবতাদের দরজায়।

মানুষের আরণ্যক বৃত্তি কোথায় কেমন করে স্ফুরিত হয়—কার-বা জানা থাকে সে কথা! কাজল তার সর্ব্বশরীর দিয়ে শিলাজিতের কল্পিত মূর্ত্তিকে সম্ভোগ করছে যেন—মনের সমস্ত একাগ্রতা দিয়ে সে যেন ধ্যান করছে শিলাজিতকে! ঝম্-ঝম্-ঝম্ বৃষ্টি, গুরু-গুরু মেঘের ডাক আর বিজলীর চমকানি—হ্যাঁ, এই তো সময়—এই তো জীবনের দুরন্তপনা করবার, দুঃসাহসিকতা করবার অবসর-মুহূর্ত্ত! সর্ব্বাঙ্গ মুক্ত কাজল সর্ব্বাঙ্গ দিয়েই যেন কি এক আনন্দ-রস উপভোগ করছে। ওর জীবনে এমন উন্মাদতা আসে নি আর কোনোদিন। ওর স্বামীর স্নেহশীতল গাম্ভীর্য্য, ওর সংসারের পরিপূর্ণতার প্রশান্তি ওকে কোনো দিন ভাবতে দেয় নি—ও কী চায়। ও যা' কিছু চায়—সবই পেয়েছে, এই ছিল ওর বিশ্বাস। কিন্তু না—পায় নি—সত্যি পায় নি—কেউ-ই পায় না—পাওয়া সম্ভবও নয় কারো! কিন্তু কল্পনায় পেতে দোষ কি। কেউ তো জানতে পারবে

না! কেউ দেখতে পাবে না। কাজল আরো নিবিড় ভাবে চেপে ধরলো বালিশটা!

আশ্চর্য্য! এই আকাজ্ক্ষার তীব্রতা ওর ছিল কোথায় এতদিন! কোথায় লুকিয়েছিল এই উন্মাদনা! মানুষের মন এতই গভীর, এমনি অতলস্পর্শ! নিজের অজান্তে কাজল কখন বেশী করে চেয়েছে শিলাজিতকে? কাজল বালিশটা বুকে জড়িয়ে চুপ করে শুয়ে রইল। কতক্ষণ শুয়ে আছে, কে জানে! আয়া ডাকছে বাইরে—মেম্ সাব, কেওয়ারী খুলিয়ে।

১৪

ওরা চায় ওদের দলটাকে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্ববৃহৎ দল করে গড়ে তুলতে। সর্ব্ববৃহৎ ওরা হবেই—কারণ সবাই ওরা ভারতীয় এবং যে কোনো দলই ভারতীয়। কোনো দলের সঙ্গেই ওদের বিরোধ নেই—কাজেই শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে লড়াই করবার প্রয়োজনও ওদের নেই! শিলাজিত অনেক রাত অবধি ভেবে যা ঠিক করে রেখেছিল, অল্প কথায় গুছিয়ে তাই বলল,—এই বিরাট দেশ ভারতবর্ষে আমাদের মেজরিটি-মাইনরিটি, উচ্চ শ্রেণী, নিম্ন শ্রেণী, তপশীল এবং অতপশীল জাত মিলেই যখন বাস করতে হবে—তখন তাই সব—এত দাঙ্গাহাঙ্গামা না করে আমরা নিজেরাই তো সব বিভেদ ঘুচিয়ে ফেলতে পারি! প্রথমতঃ, কোন্ পন্থা অবলম্বন করলে আমরা হিন্দু মুসলমানের বিভেদটা ঘোচাতে পারবো—তাই ভাবা দরকার। ধর্ম্মের পৃথকত্ব দিয়ে বা সমাজগত, জাতিগত পৃথকত্ব দিয়ে কখনো কোনো দেশের শাসনব্যাপার নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত নয়—কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে নানা বিভেদ। এই বিভেদ আমাদেরই সৃষ্টি—কিন্তু আমরা আর এ বিভেদ রাখতে চাই না! না রাখার জন্য ধর্ম্মগত এবং সমাজগত সংস্কৃতি, সংস্কার, আচার ব্যবহার, আমোদ-উৎসব করে তুলতে হবে। পরস্পরের মধ্যে মেলামেশার নানা ব্যবস্থা

করতে হবে—পরস্পরের শিক্ষা এবং সংস্কৃতির মধ্যে মিল খুঁজে বার করতে হবে। গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি কথা-সাহিত্যে এবং লোক-সাহিত্যের মধ্যে ভারতের সকল জাতি ও সম্প্রদায়কে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখতে হবে! সাহিত্য এই ব্যাপারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান গ্রহণ করতে পারে! যে বিষ আজ বাংলাদেশে হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে ঢুকেছে—তার নিরসন ঘটাতে পারেন হিন্দু এবং মুসলমান সাহিত্যিকগণ। যুগের চিন্তাধারার অগ্রদূত তাঁরাই—তাঁরা যদি শিক্ষা দেন—আমরা সবাই ভারতীয়—তাহলে অবিলম্বে এই বিরাট দেশের সকলেই হিন্দুত্ব বা মোসলীনত্ব সত্ত্বেও নিজেকে ভারতীয় বলে ভাবতে পারবে আর সেই ভাবনাটাই হবে দেশের মঙ্গলের জন্য ভাবনা। কংগ্রেস আর হিন্দু মহাসভার বাদ-প্রতিবাদ—হিন্দু আর মুসলমানের অকারণ বিসংবাদ—অনুন্নত, তপশীলী ইত্যাদি হরেক রকম অধুনাসংবদ্ধ দল-উপদল শুধুই কালনেমীর লঙ্কাভাগ করছেন—কার অংশে কতখানি বেশি টানতে পারবেন! এই করে দেশের অগ্রগতির সব আশা নির্ম্মূল করে দিচ্ছেন ওঁরা। আমরা ওদেরকে ভাবতে বাধ্য করবো শিক্ষা, সংস্কৃতি আর আমাদের জ্বলন্ত আদর্শ দিয়ে যে—আমরা ভারতীয়। ভারতের উন্নতিই হবে আমাদের সকলের মঙ্গলের উপায়।

শিলাজিৎ বসতেই একটি যুবক উঠে দাঁড়ালো! ও কাল ছিল না—নতুন এসেছে! বলতে আরম্ভ করলো—ভাই সব, আমাদের দেশে সত্যিকার নৈতিক অগ্রগতির কোনো কিছু হয়েছে কি? যদি হোতো, তাহলে আজ শুধু স্বরাজ্য নয়—স্বর্গরাজ্য লাভ করতাম আমরা। ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ নিয়ে বসে এতদিন উর্ব্বশীর নৃত্য দেখতে পারতাম। আমাদের দেশের এই দীর্ঘকালের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস শুধু দলাদলি—দাঙ্গাহাঙ্গামা আর স্বার্থবুদ্ধির ইতিহাস। মুষ্টিমেয় দু' চারজন নিষ্ঠাবান নেতার গভীর আহ্বানে এ আন্দোলন এতকাল

চলে এসেছে। কিন্তু হুজুগে লোকেরা আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যের কথা চিন্তা করা দূরে থাক—বোঝেও না! বাকি যারা—যারা প্রভুত্ব করেছে—তারা সব সময় চেষ্টা করেছে—কি করে অন্য দলের উপর টেক্কা দেওয়া যায় এবং কোন্ কৌশলে বিখ্যাত হয়ে নিজের পূজা-ভোগের ব্যবস্থা করা হয়। নিজের জীবনটাকে নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় উপভোগ করাই লক্ষ্য তাঁদের—স্বরাজ নয়, স্বাধীনতা নয়। যে ভাবে হোক—নিজের প্রতিপত্তি বজায় রাখাই হচ্ছে তাঁদের নীতি! শুনলাম—এখানে নাকি দলাদলি থাকবে না—থাকবে একতা, একনিষ্ঠা। ভালই! আমি অনেক জায়গায় নিরাশ হয়েছি—এখানটাও একবার দেখতে এলাম।

—আপনার নাম কি আমরা তালিকাভুক্ত করতে পারি?

—হ্যাঁ—কিন্তু যেদিন কোনো রকম নীচতা, গ্লানি এবং প্রতারণা আমি দেখবো এখানে—এই দলে, সেই দিনই ছেড়ে দিয়ে যাব এ দল, এই সর্ত্ত!

একজন খাতা কলম নিয়ে এল—ছোকরা সই করে একটি টাকাও দিল চাঁদা। বলল—আমি দরিদ্র সাহিত্যিক। ভারতকে একতার সূত্রে বাঁধাই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। যে ভারত অতীতে এক ছিল—সেই ভারতকে আজ আবার সেই অতীতের ঐতিহাসিক যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। আমি তাই রাজনৈতিক নই—রাজনীতির মধ্যে যে আত্মপরায়ণতার প্রলোভন থাকে—তাকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি। রাজনৈতিক অগ্রগতির পথে আমার কাজ হচ্ছে দেশের মানুষকে একনিষ্ঠ হতে বলা—শিক্ষা আর সংস্কৃতির দিক থেকে বিভিন্ন, বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন জাতিকে এক মানব-জাতিতে, এক ভারতীয় জাতিতে পরিণত করা। আমার সাহিত্যে, আমার শিল্পচর্চ্চায় তাই আমি করে আসছি এতদিন!

—এর চেয়ে বড় কাজ আমরা কেউই করতে পারবো না—শিলাজিৎ উচ্ছ্বসিত হল!

—কাজটা বড় হতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশে সে কাজ করা অত্যন্ত কঠিন—বহু মত, বহু পথ।

—সেই পুরোনো কথাটাই আবার বলি—"স্বাধীনতায় মানুষের জন্মগত অধিকার—"কিন্তু স্বাধীন হলেই মানুষ বড় রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থা চালাতে পারে না—তাকে শিক্ষা সংস্কৃতিতেও বড় হতে হবে।

—হ্যাঁ—নিশ্চয়। তাই স্বাধীন দেশের চেয়ে পরাধীন দেশে সাহিত্যের মূল্য অনেক বেশী হওয়া উচিত। অথচ তা হয় না। পরাধীন দেশের মানুষ হয় দাস-মনোবৃত্তিসম্পন্ন, অন্ততঃ আমরা তাই—এবং এরই জন্যে অতি সস্তা খেলো সাহিত্যকেও আমরা জাতীয় সাহিত্য বলে গর্ব্ব করছি, অহঙ্কার করছি।—দেখাতে পারেন কি—এ পর্য্যন্ত কোনো সাহিত্যিক, কোনো চিন্তাবীর নতুন কোনো পরিকল্পনা আমাদের দিতে পেরেছেন কি না? এর কারণ কি? চিন্তাশীল লেখাকে এ দেশের পাঠক আমল দিতে চায় না—হাসে, বলে—গাঁজা লিখেছে! নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে সৃষ্ট সাহিত্যকে এরা ব্যঙ্গ করে—বুঝবার শক্তি এদের এতোই কমে গেছে যে—ঢাকের জোরে যে ডিটেকটিভ বই লেখকের নাম আপনি এদের কাণে তুলে দিতে পারবেন—তাকেই এরা মাথায় তুলে নাচবে—একবার ভেবে দেখবে না যে সত্যিকার কতটুকু বস্তু ঐ সাহিত্যিক দান করলেন! কোনো লেখকের একখানা বইএর আড়াইটে পাতা উল্টেই এরা ঠিক করে ফেলে, সেই লেখক কত ক্ষুদ্র—আবার আপনি তারই একখানা বইএর একটু প্রশংসা করে দিন ওর কাছে—ও তক্ষুনি বন্ধুদের কাছে বা যার সঙ্গে দেখা হবে তার কাছে গিয়ে বলবে—আহাহা—অমুক লেখকের বই—আহা—চমৎকার, চমৎকার! প্রশ্ন করে দেখবেন, সে-লেখকের কোনো বইই হয়ত ওর পড়া নেই। যে দেশের সাহিত্য আর সাহিত্যিকের

প্রয়োজন সব থেকে বেশি—সে দেশের সাহিত্যিকই সব থেকে বেশি অবহেলিত হচ্ছে।

—কিন্তু তার জন্য দুঃখ না করে আমরা ক্ষেত্র তৈরী করবার চেষ্টা করবো। দেশের লোকদের নিন্দা করে লাভ কিছু নাই—তারা আমাদেরই লোক, আমাদেরই আত্মীয়!

—হ্যাঁ—নিশ্চয়, আমাদেরই আত্মীয় তারা! নিন্দা তাদের করছি না আমি—দুঃখ করছি—আমার জন্য নয়, তাদের জন্যই! আমি এই দুর্ভাগা দেশে জন্মেছি—যতটুকু পারি, এর জন্য করে যাব—হোক তা শ্রীরামের সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালীর বালি-বওয়া!

—আমাদের শক্তিকে আমরা প্রসারিত করবো স্বদেশের কল্যাণে! নেতাগিরির দলাদলির কথা বাদ দিয়ে আমরা একটা সাধারণ কথা খাড়া করে নিই; আমরা সকলেই হয় ভাই, নয়তো বোন—উচ্চ-নীচ ভেদটা তুলে দিতে হবে আমাদের মধ্যে!

—তা হয় না—আপনার কথাটা ওদেশের "কমরেড" কথার প্রতিধ্বনি! কাজের ডিসিপ্লিন রাখবার জন্যে গুণ এবং কর্ম্ম অনুসারে শ্রেণী বিভাগ করতেই হবে এবং আমাদের মধ্যের সবাইকে তা মেনেও নিতে হবে। অবশ্য, সাধারণভাবে ভাই বোন বলায় আমার আপত্তি নাই। তবে 'কমরেড' কথাটায় বোঝায় যে সে একটা দলের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু 'বোন' কথাটির মধ্যে যে নিবিড় আত্মীয়তার আন্তরিকতা আছে—সাধারণভাবে প্রযুক্ত হলে সেই আত্মীয়তার আধ্যাত্মিক শক্তি বজায় থাকবে না—'বোন' কথাটা সস্তা হয়ে যাবে।

—কিন্তু উচ্চ নীচ কর্ম্ম যখন থাকবেই তখন উচ্চ নীচ কর্ম্মী না থেকে পারে না।

—সাধারণভাবে পরস্পরকে ভাই বা বোন বলা যেতে পারে নিশ্চয়!

—[illegible] না! এ গুলো এমন কিছু দরকারী কথা নয়। দরকারী

কথা হচ্ছে যে আমরা সবাই ভারতীয় এবং সবাই চাই ভারতের স্বাধীনতা! সেটা কি ভাবে লাভ করা যেতে পারে, তাই আমাদের ভাববার কথা! তারপর আমাদের ধর্ম্মগত বা সমাজগত বা আচারগত বিভেদ—সেগুলোর সঙ্গে রাষ্ট্রশাসনের কোনো যোগ না রাখাই বাঞ্ছনীয়। নরহত্যার বা চুরি করার অপরাধে হিন্দু বা মুসলমানের জন্ম আলাদা আইন হবার কারণ নেই—শাস্তি যা পাবার, উভয় ধর্ম্মের লোককেই তা পেতে হবে।

আলোচনাটা নানা শাখা-পল্লব বিস্তার করছে—দেখে শিলাজিত বলল—আমরা ভারতীয়—এই নামে সংঘবদ্ধ হই—তারপর বাকি যা কিছু ধীরে ধীরে আমরা ঠিক করে ফেলবো। আগে ঐক্য প্রয়োজন। বর্ত্তমানে আমরা বাংলাদেশেই কাজ আরম্ভ করি—কেমন?

—হাঁ—ঘর থেকেই মানুষ বাইরে বেরুতে শেখে!

—কোন্ পন্থায় আমরা কাজ আরম্ভ করবো এবং আমাদের কর্ম্মীদের কে কি কাজ করবেন—ঠিক করুন!

একে একে ওরা এক একটা কাজ করবার কথা বললো—কে কোন্ কাজ করতে পারদর্শী, তাও জানালো। বক্তৃতা অবশ্য অল্প বিস্তর সবাইকে করতে হবে—। ইস্তাহার ইত্যাদি লেখার কাজ কয়েকজন করবে। চিঠিপত্র লিখে সমস্ত দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে অন্য কয়েকজন—সংবাদপত্রের সঙ্গে যোগ রাখবে জন চার এবং ওদের কাজ কথা দিয়ে এবং ভবিষ্যতের উজ্জ্বল দিনের ছবি এঁকে সাহিত্য রচনা করবে দুইজন। শিলাজিত নিজেকে এই দলে নিতে পারতো, কিন্তু নিলনা, বলল—আমি শিল্পী! আমি আছি আপনাদের সঙ্গেই। কিন্তু আমি আরো কতকগুলো কাজ করতে চাই যার জন্য সব সময় বাস্তব জগতেই আমার থাকা দরকার। চিন্তা করার মত—নূতন কার্য্যকরী পন্থা উদ্ভাবনের মত শক্তি আপনাদের কম নেই—সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে

আপনারা জনমত গড়ে তুলুন—জনশক্তিকে বুঝিয়ে দিন—মানুষ কতখানি এগিয়ে এসেছে এই যুগে। আর এই দেশের মানুষ—যারা অপর দেশের ধুয়া ধরে চীৎকার করে আর বলে—'ঐ পথই আমাদের পথ'—তারা নিজেরা চিন্তা করে না—সে-পথে যাওয়ার কার্য্যকরী শক্তির পরীক্ষা করে না—তার ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করে না—সে পথে চলা এখানে সাধ্যায়ত্ত কিনা তা'র বিবেচনা করে না—শুধু হুজুগে চলে! এই ভুল তাদের ভেঙে দিতে হবে সাহিত্যের মধ্যে শিক্ষা দিয়ে! গড়ে তুলতে হবে নতুন একটা মানব-সমাজ—যারা নিজেরা চিন্তা করতে পারে ভালো আর মন্দ। নিজেরা বুঝে নেবে কোনটা তার চাই এবং কেন চাই—চাওয়া উচিত কি না—পাওয়ার ভবিষ্যৎ ফলটাই বা কি! "সকলে সমান হও—ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদসাধন করবো—মজুরদের মজুরী বাড়াও—সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হোক, বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক"—শুনতে বেশ বড় বড় কথা—কিন্তু ঐ কথাগুলোর আড়ালে আছে, কতকগুলি অতি বুদ্ধিমান লোকের মস্তিষ্ক যা সাধারণ লোককে উস্কে দিয়ে নিজেরা স্বার্থসিদ্ধি করে। সকলে সমান হবার মত করে মানুষ সৃষ্ট হয়নি—কীট পতঙ্গের ভোজ্য, ভেক ভুজঙ্গের। "ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ হোক—লাইফ ইন্সিওর করো না—তোমার স্ত্রীকন্যা দেশের সম্পত্তি—অতএব তোমার টাকা জমাবার দরকার নেই। তোমার ছেলে দেশের সম্পত্তি, অতএব তুমি তার রোজগার পেতে পার না। সব সমান হয়ে যাক—রাষ্ট্রই সব দেখবে—কাস্তে আর হাতুড়ি চালাও—" কিন্তু কেন ঐ কাস্তে আর হাতুড়ি চালাবো—একথা কি কেউ ভেবেছে?

কার জন্যে করবে সে পরিশ্রম? রাষ্ট্রের জন্যে! তাহলে তো রাষ্ট্রের কাছেই গোলামী করতে হল—মুক্তি কোথায়? কোথায় সাম্য! তুমি কি বলতে পার—ঐ রাষ্ট্র যখন যারা চালাবে—তাদের কারো অসুখ হলে যেভাবে চিকিৎসা হবে, তোমার বেলাও তাই হবে?—না, হবে না।

কারণ মানুষ চিরদিনই লোভী—চিরদিনই স্বার্থপর—চিরদিনই আত্মপরায়ণ এবং আত্মীয়পরায়ণ! ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকলে ব্যক্তির মধ্যের স্নেহ-মায়া-মমতাও থাকবে না এবং স্নেহের শৃঙ্খল না থাকলে কেউ পরের জন্ত খাটতে চায় না! যে শ্রমিক কাজে যাচ্ছে সে দুটো পয়সা আনতে চায় তার স্ত্রী-কন্যার জন্তই—নইলে সে যেত না। সবই যদি রাষ্ট্রের সম্পত্তি হয় তো কে কার আত্মীয় হবে!—শিলাজিত থামলো। একজন বলল—

—ওই সাম্যবাদই ভবিষ্যৎ পৃথিবীর মুক্তির উপায়, শ্রেষ্ঠ উপায়!

—কিন্তু আমরা পৃথিবীর কথা এখন ভাবছি না—ভাবছি ভারতের কথা। ভারত যদি স্বাধীন হয় কোনদিন তো তখন সাম্যবাদটা ভেবে দেখা যাবে! আগে চাই স্বাধীনতা। দলগত বৈষম্য, ধর্ম্মগত বিভেদ, সম্প্রদায়গত স্বার্থপরতা—এইগুলোকে আমরা আগে দোরস্ত করে নি!

—কি করে করবেন? এগুলো সব কার তৈরী জানেন?—

—যারই হোক, আমরা সবাই যেন সেটা বুঝতে পারি যে এগুলো সত্যি নয়—বোঝাতে হবে সবাইকে!

অতঃপর ঠিক হোল—এই মহাভারত সঙ্ঘের সকলেই ভারতীয় এবং এরা স্বাধীনতা লাভের জন্ত তার কার্য্যকরী পন্থা অবিলম্বে উদ্ভাবন করবে—এই জন্ত বোম্বাই যাওয়া প্রয়োজন সেই চন্দ্রিমা দেবীর সঙ্গে পরামর্শ করতে। শিলাজিত কালই যাবে বোম্বাই। চন্দ্রিমা দেবীর কার্য্যকরী পন্থা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই এরা অবগত নয়—তাই সেখানে গিয়ে জানতে হবে।

১৫

চার দিন হয়ে গেল, কিংশুক এসেছে এখানে—এর মধ্যে চলে যাওয়াই উচিত ছিল ওর, কিন্তু যাওয়া হয়নি। বাবার ইচ্ছেটা ওর

তরফেই ন্যাই এবং না যাবার জন্য একটা ছুঁতো ও খুঁজে বের করেছে। আগামী বৈশাখী পূর্ণিমার দিন—মানে, আর দুদিন পরেই এখানে কেয়ার কি একটা ব্রত উদ্‌যাপন আছে—ওকে নিমন্ত্রণ করেছেন ঠাকুরদা এবং কেয়া। করাই উচিত—এবং ঐটুকু সূত্র অবলম্বন করেই কিংশুক রয়েছে এখনো। আজ থাকবে, কাল থাকবে এবং পরশুও থাকবে।

কিংশুকের ঘুম হয় নি গত রাত্রে—কারণ, কাল সারাদিন ওর দেখা হয়নি কেয়ার সঙ্গে এবং রাত্রে খাবার সময়েও না। পরন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে কয়েকটা কড়া-কথা ও শুনিয়েছিল কেয়াকে—তারপর থেকেই কেয়া আসে নি! কি হোল? চটলো নাকি মেয়েটা? কিন্তু শুনিয়েছিল ঐজন্যেই। কেয়াকে একটু চটানোই ওর উদ্দেশ্য—নইলে কেয়ার মনে আসনলাভ সহজ হবে না! ঐ কেয়া! ঐ অপরূপ রূপ—ঐ নিটোল সদ্যোত্থিত যৌবন—ঐ নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক হৃদয়খানি···আঃ! কিংশুকও কিছু কম সুন্দর নয়, কেয়ার পাশে ওকে বেমানান হবে না কিছু। কিন্তু কেমন করে ঘটাবে কিংশুক সেটা? কোন্ পথে ও চলবে কেয়াকে লাভ করবার জন্য, ভেবে ঠিক করতে পারছে না। ব্রাহ্মণত্বের গোঁড়ামী দেখিয়ে ওর বাবাকে প্রসন্ন করা যেতে পারে, কিন্তু কেয়া সেটা ধরে ফেলছে। শিল্প-সঙ্গীত-কবিতা? নাঃ, ওসব ভালো জানা নেই কিংশুকের—শিল্পী সে নয় —সে বাস্তব জগতের কর্মী, চোখে দেখে সে নগদ পাওনাটাই। সে বেশ করে বাজিয়ে নিতে চায়—চায়, কারণ কেয়া তার আভিজাত্যের মুকুটকে উজ্জ্বল করবে—তার জীবন-বিলাসের বৈভব হবে—তার অন্তর-লোকে আনন্দ যোগাবে। পেতেই হবে কেয়াকে ওর!

ওকে দেখবার ইচ্ছে আকণ্ঠ হয়ে উঠলো কিংশুকের—নিদারুণ দুঃ পিপাসায় ও অস্থির হয়ে ঘুমুতে পারে নি। রাত্রের অন্ধকার [illegible] উঠে দাড়ি কামিয়ে স্নান করে ও পরিপাটি করে বেশবাস

করলো—ভাবতে লাগল—আজ সকালে যদি চায়ের টেবিলে কেয়া না আসে তো ডেকে পাঠাবে তাকে কিংশুক! কেন আসবে না—আসবে। আসে তো রোজই—কালই শুধু আসেনি।

এদিকে বড়দার চিঠি পেয়েছে কিংশুক—"শিগ্‌গীর চলে এসো এখানে, মিলে মজুররা ধর্ম্মঘট করছে।" ধর্ম্মঘট! একটা বিরক্তিকর ব্যাপার। কি জন্যে করে ঐ সব খেতে-না-পাওয়া মজুরগুলো?

বললেই হয়—বাবু কিছু বাড়িয়ে দিন মজুরী—বাড়ানো তো হয়েছেই, আরো না হয় কিছু বাড়ানো হবে—তার জন্যে ধর্ম্মঘট কেন? কি চায় ওরা সব?

সাম্যবাদ? মানে—ধনী আর গরীব সব সমান হয়ে যাও। ইয়ারকির কথা আর কি? হলেই হোল অমনি। সব সমান হয়ে গেলে তোদের মজুরী দেবে কে রে বোকারা? ধনী আর শ্রমিক থাকবেই। জগতে উচ্চ-নীচের তফাৎ কখনো যেতে পারে না—যাবে না! কেমন করে যাবে, এ দেশটা কি ওদেরই দেশ যে যা খুশি ওরা করবে! রাশিয়ায় যা হয়েছে এদেশে সেটা কেমন করে হবে? কেমন করে? এদেশের লোক ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ করবে—পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করবে—সবাই রাষ্ট্রের সম্পত্তি হয়ে যাবে! রাষ্ট্রই নাই যাদের তারা আবার রাষ্ট্রের কথা নিয়ে এত নাচে কেন? ওসব কিছু না—বাঙালীর হুজুকে আন্দোলন!

কিন্তু কিংশুক ভয় করে—ভয় করে কিংশুকের। যদি সত্যি কোনো দিন ওদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকে—সত্যিই কোনোদিন ওকেও মজুরী করে রোজগার করতে হয়—হলেও হতে পারে। যে রকম ব্যাপকভাবে কমিউনিজম্ প্রভাব বিস্তার করছে—কে জানে কি দাঁড়াবে শেষটায়!

কিন্তু ওর মানে কি?

সব কি সমান হতে পারে—কখনো না ? প্রত্যেকের মধ্যে আছে আলাদা রকমের মানুষ। সব মানুষ মূলতঃ এক হলেও সব মানুষের কাম-ক্রোধ-লোভ আর ত্যাগ-তপস্যা এক নয় ; এক কোনোদিন হবেও না। শ্রমিকদের দুঃখ দেখে যারা চোখের জল ফেলে—তাদের বোঝা উচিত যে তারাও তাদের সামান্য একটু ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্যই লালায়িত হয়। সামান্য একটু স্নেহের বন্ধনের জন্য অতখানি পরিশ্রম করে। ওদেরও প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে আলাদা আলাদা প্রকৃতি যা প্রত্যেক মানুষকে অন্যের থেকে তফাৎ করে রেখেছে। কিন্তু ঐ ধুয়োটা চলছে এখন—নতুন আমদানী রাশিয়া থেকে—আরো কিছু দিন চলবে। মানুষ চায় সুখের জীবন—শান্তিময় জীবন। ঐ কমিউনিজম্ যদি তা দিতে পারে, তাহলে ওটা টিকেও যেতে পাবে পৃথিবীতে ; কিন্তু টিকবার কোনো আশা নেই, কারণ নিরবচ্ছিন্ন সুখ আর শান্তির জীবনের কোনো পথ নাই। ঐ কম্যুনিষ্টদের মধ্যেই আবার ভেদাভেদ ঘটবে —এরই মধ্যে ঘটছে কত ! সব কি আর সমান হয় কোনো দিন।

ওরা চায় বিপ্লব—মানে পরিবর্তন। পুরাতনদের ধ্বংস এবং নূতনের প্রতিষ্ঠা ! সে নূতনটি ভাল কি মন্দ তার তো পরীক্ষা হওয়া চাই। রাশিয়ায় হচ্ছে পরীক্ষা ·····কতটা কি হয়েছে কে জানে ! যুদ্ধ থামলে একবার রাশিয়া ঘুরে আসবে কিংশুক কেয়াকে সঙ্গে নিয়ে। কেয়া যাবে তো—যেতে চাইবে তো ?

সেখানে যদি দেখে যে সত্যি সাম্যবাদে সুখ আছে, শান্তি পাওয়া যায়·····তাহলে না হয়ে গেও সাম্যবাদীই হয়ে যাবে ! আপত্তির কি থাকতে পারে ! কেয়ার মত একটা বৌ থাকলে কী না করতে পারা যায় !—কিংশুক বেরিয়ে এল বাগানে। সকাল হয়েছে। কেয়ার বাবা বাড়ির দুয়ারে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কেয়াও আসবে নাকি ? আসে তো ভালই ! কিন্তু ওখানে বিশেষ সুবিধা হবে না। বরং বুড়ো মানুষ কাছে

কথা কওয়া যায়, কিন্তু ঐ লোকটি—ঐ কেয়ার বাবাকে কেন জানি, ভয় করে কিংশুকের। সন্ন্যাসী মানুষ—এত বড় বিরাট সম্পত্তির মালিক হয়েও এ কেমন ধারা চাল-চলন ওঁর? বৌ মরে গেছে—তা বিয়ে আরেকটা করলেই পারেন!

কিন্তু কিংশুকের মনে পড়ে গেল—ওঁর সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যেই তার বোনকে এখানে আনা হয়েছিল। হতভাগী লেখা! এই রাজঐশ্বর্য্য কেন তুই গ্রহণ করলিনে। অতবড় আহাম্মক পৃথিবীতে আর জন্মায়নি কোনোদিন। তুই তো কুমারীই ছিলি—শিলাজিতের সঙ্গে বিয়ে—ওর কি কোনো মানে হয় নাকি! ওটা তো নাকচই হয়ে গিয়েছিল! এখানে—এই বিরাট প্রাসাদে রাণী হয়ে থাকলে কে আর তোর খোঁজ পেত?—কিন্তু না, ভালই করেছে লেখা! কেয়াকে লাভ করবার জন্যে কিংশুককে পথ করে দিয়ে গেছে লেখা! আজই কিংশুক বলবে ঠাকুরদাদাকে—যেন একটা সম্বন্ধ এই বাড়ীর সঙ্গে তাদের থাকে—বৈবাহিক সম্বন্ধ একটা এবং তার অর্থটা খুবই সোজা—কেয়ার সঙ্গে কিংশুকের বিয়ে!

কিংশুক বাগানে খানিকক্ষণ পায়চারী করে ঠাকুরদার বসবার ঘরের দিকে গেল। তিনি এখনো নামেন নি। এখনো নামবার সময় হয় নি। গতকালের খবরের কাগজখানা পড়ে আছে একধারে, তুলে নিয়ে পড়তে লাগল কিংশুক! নানারকম সংবাদ—হরেক রকম বিজ্ঞাপন! বিজ্ঞাপন আজকাল পড়তে বেশ ভালো লাগে—নতুন কায়দার চায়ের বিজ্ঞাপন—তাতে অজন্তার ছবি, কাপড়ের বিজ্ঞাপনে ক্লিওপেট্রাকে ধরে আনা হয়—কালির বিজ্ঞাপনে কোকিল, না হয় ময়ূর, না হয় হরিণ এঁকে দেওয়া হয়! ভাবা যত শক্তিশালী হচ্ছে, মানুষ যত কালচার্ড হচ্ছে, ততই এই রকম কায়দা বাড়ছে! তৈরী মাল বিক্রীর জন্যে বাজার দরকার। এই বিজ্ঞাপন হচ্ছে সেই বাজার তৈরীর প্রধানতম অস্ত্র।

মালকে কুমুল নিয়ে যারা মাল তৈরী করে তারা জানে না যে বিজ্ঞাপনের রোলার চালিয়ে কি রকম করে বিক্রীর রাজপথ তৈরী করতে হয়। ধনীদের দোষ দিলে চলবে কেন? ওরাই তো করে এসব! এই মস্তিষ্ক ধনীদের। শ্রম তারা শুধু কিনেই নেয় না—শ্রমজাত বস্তুকে বাজার-যোগ্য করে। নইলে শ্রম কিনে কি ধুয়ে খাবে তারা!

এই সব বিজ্ঞাপন যারা লেখে, তারাও তো বিক্রী করে শ্রম—তাদের ইন্‌টেলেকচুয়াল প্রডাক্‌টস্‌। সাহিত্যিক তার উপন্যাসের কপিরাইট বিক্রী করে, তার শ্রম—তার ইন্‌টেলেকচুয়াল প্রডাক্‌ট। না বিক্রী করলে তার দিন চলে না; কিন্তু ধনী প্রকাশক তাকে মার্কেটেবল করে, বাজারযোগ্য করে। বিজ্ঞাপন দিয়ে ঢাক ঢোল পিটিয়ে সেই উপন্যাস এবং ঔপন্যাসিককে সাধারণ্যে পরিচিত করে। রাগ কেন বাপু! তোমার লেখা তুমি বিক্রী করে কিছু মন্দ পাচ্ছ না—যা পাও, তাইবা তোমায় দেয় কে? ধন-বাদ—ও থাকবেই কারণ সাম্য হতে পারবে না। সব মানুষ সমান হবে? হাঁ, তাহলে আর ভাবনার কি ছিল! মানুষে মানুষে কামড়া-কামড়ি। একজন চায় আরেক জনকে দাবিয়ে নিজের প্রভুত্ব জাহির করতে—দরকার হলে গলা কাটতে। মানুষ আবার সাম্যবাদী হবে। দূর!

এটা আবার কি ব্যাপার? পড়ে চললো কিংশুক। চোখ দুটো কেমন যেন বিস্ফারিত হচ্ছে! 'মহাভারত মণ্ডল।' ব্যাপার কি! ওরে বাবা—একেবারে ভারতীয় জাতি। সব এক হয়ে গেল তাহলেই। বাঃ বাঃ বাঃ। নেতা হচ্ছেন গিয়ে আমাদের সেই শিলাজিত সেন! সেই শিলাজিত? লেখায়—বক্তৃতায় সব্যসাচী—সেই দুর্বলমনা শিল্পী!

হ্যাঁ—তাইতো! সেই-ই তো! সেই না বলেছে—"মানুষ আমরা—চাই মানুষের মতন বাঁচতে—মানুষের মত মরতে! পৃথিবীর অন্য মানুষ যেমন করে বাঁচছে তার দেশের জল-মাটি-আলো হাওয়ার মাঝে—

আমরাও তেমনি করে বাঁচতে চাই—এর জন্তে দরকার আমাদের দেশের স্বাধীন মাটিতে পা রেখে দাঁড়ানো—দেশের স্বাধীন বুকে মাথা উঁচু করে শ্বাস লওয়া—দেশমাতার প্রশান্ত কোলে মৃত্যুর শান্ত ঘুমে ঘুমিয়ে যাওয়া।"

চমৎকার বক্তৃতা করেছে তো শিলাজিত! বাঃ বাঃ, বেশ বলে শিলাজিত:—"স্বাধীনতা আমাদের পেতেই হবে—মতবাদ নিয়ে বিবাদ করবার আমাদের সময় নাই। যাঁরা করছেন—তাঁরা করুন—দেশের স্বাধীনতার চেয়ে মতবাদকেই তাঁরা বেশি প্রাধান্ত দিচ্ছেন। আগে স্বাধীনতা লাভ, তারপর মতবাদ নিয়ে ঝগড়া—দেশ স্বাধীন হলে মতবাদের মীমাংসা হতে দেরী লাগবে না! অখণ্ড ভারতের অধিবাসী আমরা—আমরা ভারতীয়। আমরা ভারতের কল্যাণের জন্ত জীবন পণ করেছি। দ্বন্দ্ব নয়—পথের বিভিন্নতা নাই, লক্ষ্যের দ্বিতীয় কিছু নাই—ঐ এক লক্ষ্য—স্বাধীনতা লাভ।"

বাঃ, বেশ বলেছে! সত্যি এ আমাদের শিলাজিত তো—না অন্ত শিলাজিত? কে জানে, যে হয় হোক্‌গে! কেয়া এখনো এলো না, ঠাকুরদাও না—মণ্টুটাও আসছে না। ও হ্যাঁ! মণ্টুর নাকি জ্বর মত হয়েছে। যা বৃষ্টিতে ভিজলো সেদিন। কী দুরন্ত ছেলেরে বাবা—এমন ইন্‌কুইজিটিভ্ আর দেখি নি! সেই দাদার ভাই তো! হবে ও-ও অমনি একটা কুমড়ো। লেখার জীবনটাকে নষ্ট করে দিল ঐ হতভাগা অঞ্জন! নাঃ, অঞ্জন কিছু তো করে নি! কিংশুক কেয়াকে বলেছে যে লেখার জীবনের জন্ত দায়ী অঞ্জনই। কিন্তু সেটা সত্যি কি? না তো! অথচ এখন ঐ মিথ্যা কথাটা কিংশুকের মনে সত্যের মতোই প্রতিভাত হচ্ছে। হ্যাঁ—মনে হচ্ছে, কেয়াকে বলা কথাগুলো সত্যিই!

কাগজখানা উল্টালো কিংশুক! কোন্ একজন দেশীয় রাজা একলাখ টাকা দান করেছেন—কোথায়? ঐ অঞ্জনের শিক্ষায়তনে! আশ্চর্য!

রাজাটার মাথাটাথা কিছু নেই নাকি! কি হবে ঐ টাকাটায়! কিংশুক পড়ে চলল—"মানবতার দিক দিয়ে, শিক্ষা, সংস্কৃতি আর সভ্যতার দিক থেকে অঞ্জন সারা ভারতকে একতার বন্ধনে বাঁধবে। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান-শিখ-পার্শি-পাঞ্জাবী-মারাঠা সব একাকার করে দেবে ও! ও নাকি দেখিয়ে দিচ্ছে—ভারতের সাধনা সর্ব্বত্র এক, সর্ব্বত্র মানবত্বের সাধনা এবং সব জাতির মধ্যে অধুনাদৃষ্ট বিভেদ অর্ব্বাচীন যুগের সৃষ্টি—এ বিভেদ সত্য নয়! মানুষে মানুষে ভেদ তো নাই-ই—ভারতের সব জাতির মধ্যেই সব জাতির রক্ত প্রবাহিত রয়েছে।"

মনুষ্যত্বের দিক থেকে অঞ্জন সারা ভারতকে একত্র করবার সাধনা করছে আর এখানে শিলাজিত করছে ভেদ-বিভেদের নিরসনের দিক থেকে একত্র করবার চেষ্টা! এই দুই স্রোত ধারা একত্র মিললে যে প্রলয় পয়োধি হয়ে উঠবে রে বাপ—হুঁ!

—নমস্কার! কতক্ষণ বসে আছেন!

কেয়া! যার জন্ত কিংশুক কাল ঘুমায় নাই!

—নমস্কার! কতক্ষণ? বলুন কত যুগ! কত জন্ম!—কথাটা বেশ বলতে পারছে কিংশুক।

—ও! আমার দেরী হয়ে গেল একটু। দাদু আসেনি?

—কৈ! আপনার সেই মোল্লা-দাদু কেমন আছে?

—ভালো! ধন্তবাদ! দাদু সাহেব আজ উঠে হাঁটতে পারছে। বাঁ-হাতটাও নাড়তে পারছে।

ভালো লাগছে না কিংশুকের। ঐ ডাকাত মুসলমানটার খোঁজ নেবার কিছু দরকার নেই তার। কিন্তু কেয়া যখন তার কথাই বলতে চায়—তাই বলল—যাবে কবে ওরা?

—থাকি[illegible]আর দু'চার দিন! মন্টুরও শরীর ভাল নেই। ইন্দ্রু[illegible]! [illegible]ছেলে! সেদিন ভিজল বৃষ্টিতে। বারণও করেন না আপনারা?

—বারণ করিনি ? কি বলছেন ! না শুনলে কি করবো !

—কিন্তু এখন ? আপনাদেরই ভুগিয়ে ছাড়বে !

—সেরে যাবে দুদিনেই। এই, চা নিয়ে আয়। ঠাকুরদার দেরী হবে, আপনি বসুন চা খেতে !—কেয়া চা তৈরী করতে লাগল। ঘরে কেউ কোথাও নেই।—প্রকাণ্ড হলঘর। বারান্দায় পাম-গাছগুলোর পাতার আড়াল—দূরে দেউড়ীর দারয়ানরা।

সামনে—টেবিলের ওপাশটাতেই কেয়ার ঝরঝরে মুখখানা—এলানো চুলের আঁধারে আলোর শিশুর মতই জ্যোতির্ময়। হাত বাড়িয়ে ধরা যায় না ? যায় বৈ কি ! যায়। অত কাছে ওই আলো—ওকে হাত বাড়িয়ে নিশ্চয় ধরা যাবে ! কিন্তু হাত যদি পুড়ে যায়—ভাবছে কিংশুক, ভাবছে—না—না, হাত পুড়বার কোনো আশঙ্কা নেই। কিংশুক কিছু খারাপ নয় দেখতে—রূপ তার যথেষ্ট আছে—আর আজ সকালে পরিপাটি করে সাজিয়েছে সে নিজেকে ! আয়নায় দেখা তার সকালের চেহারাটা মনে করতে চেষ্টা করলো কিংশুক, মনে পড়ে না ঠিকমত ; তবে সুন্দর—সুন্দর ছিল সে তখন। এখনো আছে—ঐ কেয়ার রূপের আলো লেগে আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে হয়তো।

—চা খান ! কি দেখছেন হাঁ করে আমার দিকে !

—আপনাকেই—ত্বরিতে বললো কিংশুক। এ সব কথা বলা ওদের দস্তুরমত অভ্যাস করা। বলতে কোথাও বাধে না—কিন্তু শুনতে অভ্যস্ত নয় কেয়া, মাথা নামালো, বললে—চা খান।

—দেখবার শ্রেষ্ঠ বস্তু সমুখে থাকলে আর কিছু তো দেখা যায় না—আবার বললো কিংশুক !

কেয়া লাল হচ্ছে, রক্তাভ হতে হতে লাল হয়ে উঠলো ও। কিংশুক আরো কিছু বলবে নাকি ?

—কাল সারাদিন দেখিনি আপনাকে—কিংশুক চায়ে চুমুক দিল।

চোখদুটো তৃষ্ণার্ত হয়ে রয়েছে যেন…,

—আচ্ছা, থাক্! এতো সব বানিয়ে বলতে পারেন আপনারা। থামুন!—কেয়ার মৃদু ধমক কাঁটাগাছের তলার মাটি কুপিয়ে দেওয়ার কাজ করছে। কাঁটা গাছ জোয়ালো হয়ে উঠলো।

—আমি স্বপ্ন দেখেছি কাল একটি—সত্যি হবে কি না বলুন তো?… কিংশুক হাসছে বলতে বলতে।

—স্বপ্ন কদাচিৎ সত্যি হয়।—উত্তর দিল কেয়া।

—তার জন্যেই তো প্রশ্ন করা—সেই কদাচিৎ-এর দু'একটির দলে আমার স্বপ্নটি পড়বে কি না?

—কে জানে? চিনি দেব আর একটু আপনাকে?

—হ্যাঁ, একটু আরো—থাক্, থ্যাঙ্কস্; আমার স্বপ্ন সত্যই হবে—ঐ চিনি দেওয়াটাই তার প্রমাণ।

—মানে?—কেয়া বিস্ময়-হাসি-কৌতূহল জড়ানো চোখে তাকালো।

—মানে?—আমার কাপে চিনি দিলে সত্যি হবে স্বপ্ন আমার, এই ঠিক করে রেখেছিলাম—হবে সত্যি।

—যান্, কি সব বলেন!

ঠাকুরদা এসে পৌঁছলেন। কেয়া বলল—তুমি আজকাল বড্ড বাবু হোচ্ছ দাদু—বেলা অবধি ঘুমোও…বুড়ো মানুষের পক্ষে এসব স্বাস্থ্যকর নয়!

—স্বাস্থ্য এবার তোদের হোক্ দিদি—আমার আর কোন্ কাজে লাগবে?—দাদু বললেন কাগজখানা টেনে নিয়ে। কিংশুকের কিছু বলা উচিত এবং কি বলবে ঠিক করছিল মনে মনে, কিন্তু ঠাকুরদার হাতে কাগজখানা দেখে ওর কি যেন চিন্তার তরঙ্গ খেলে গেল মাথায়। ঐ খবরের কাগজে শিলাজিতের নাম আছে—থাক্। শিলাজিতকে এরা চেনে না—কিন্তু সজ্জনের নামও আছে এবং বেশ বড় বড় হরপেই আছে! যদি

চোখে পড়ে যায় ঠাকুরদার এবং কেয়ার। এখনো ওরা পড়েনি কাগজখানা। মফঃস্বলে গত কালের কাগজ আজ এসে পৌঁছায়। গত কালের খবর এরা সব পড়বে আজ। কিংশুক এতক্ষণ অঞ্জনের সম্বন্ধে ঐ লেখাটা কাটিং করে নিয়ে ফেলে দিতে পারতো! কী মূর্খ সে! অনায়াসে বলতে পারতো ওদের ব্যবসা-সম্বন্ধীয় একটা খবর ছিল ওখানে! বড্ড সুযোগটা হারিয়েছে কিংশুক! ঠাকুরদা চা খেতে খেতে কাগজখানার মূল হেডিং-গুলোতে চোখ বুলিয়ে কেয়ার দিকে এগিয়ে দিলেন। কেয়া বলল—এঁকে দাও দাদু, আমি মন্দিরে যাচ্ছি বাবার কাছে! ও চলে গেল! কিংশুক আবার সুবিধাটা পেয়ে গেছে। ঈশ্বরের জয় হোক! (ঈশ্বরকে কখনো মানে না কিংশুক) ঈশ্বর আছেন নিশ্চয়ই, নইলে কিংশুককে এত বড় সুযোগ দিল কে? কাগজটা ত্বরিতে টেনে নিয়ে ও বলল—পুজো আর পড়াতেই কি ওর জীবনটাকে পার করে দিতে চান দাদু?—ইঙ্গিতটা বুঝতে বুড়োর বেশি দেরী হোল না—আধ মিনিট চুপ করে থেকে বললেন, —ওর ইচ্ছে কৈ!

—ওর ইচ্ছে আছে কি না—জানবেন কেমন করে? আছে, নিশ্চয়ই আছে!

বিবাহযোগ্যা কন্যার আত্মীয়দের কাছে কিংশুক ফেল্না ছেলে নয়। সুন্দর, স্বাস্থ্যবান এবং শিক্ষিত! ঠাকুরদার মনে অনন্ত আশা জেগে উঠলো অকস্মাৎ। তার শেষ কাজ ঐটুকু, কেয়াকে পাত্রস্থ করা। আর সবইতো হয়েছে। ডুবন্ত মানুষের খড় ধরার মত বললেন,

—আছে? তোমার সঙ্গে এ নিয়ে কথা হয়েছে কিছু?

—হ্যাঁ। তবে কথা কি আর ওই বয়সের মেয়েরা তেমন করে কইবে? আন্দাজে বুঝে নিতে হয়।

—আছে—রাজী আছে ও?

—আছে। আমার তো তাই মনে হোল। অবশ্য, খোলাখুলি

প্রশ্ন করবার অধিকার আমি পাইনি।

বুড়ো যেন কেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন—একটু সামলে বললেন থেমে, থেমে,—বেশ; আমি একবার ওকে শুধুবো, তার পর দেব তোমায় সে অধিকার।

বুড়ো বেরিয়ে গেলেন তক্ষুনি। কিংশুক কাগজের কাটিংটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে স্বপ্ন দেখতে লাগলো—কেয়া—কেয়া—কেয়া! যেন সম্মতি দিয়েছে কেয়া, সস্মিতমুখে আবার আসছে এখানে—না আসছে না. লজ্জায় আর এলোই না—আসবে না এখন আর—এবার আসবে সেই শুভদৃষ্টির সময়—কেয়া কেয়া! কিংশুক আস্বাদ করছে কেয়ার নামের মাধুর্য্যটুকু।

১৫

…"ওরা মানুষ,—ওরা অন্ন চায়—বস্ত্র চায়—ওরা চায় দেশের মাটিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে—পৃথিবীর অন্য মানুষের সঙ্গে সমান মর্য্যাদা লাভ করতে—ওরা চায় স্বাধীনতা—ওদের ধর্ম্ম, ওদের সমাজ-ব্যবস্থা, ওদের কর্ণধারা, সবই নিয়ন্ত্রিত হবে ওদের নিজেদের হাতে, ওদের স্বাধীন বিত্তের সামর্থ্যে, ওদের অপরাজেয় আত্মার আত্মমহিমায়"।

বাংলা থেকে বহু দূরে বক্তৃতা চলছে একটা ছোট সহরের বড় একটা মাঠে। লোকে লোকারণ্য—নির্ব্বাক হয়ে শুনছে সব শ্রোতৃমণ্ডলী। যিনি বক্তৃতা করছেন, তিনি মহিলা—বয়স বুঝিবার কোন উপায় নাই, অনেকখানি দূরে আছেন তিনি এবং মুখও ভালো করে দেখা যায় না। নিদারুণ গরমে ঘামছে সব লোকগুলো, তবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিশ্চুপ শুনে যাচ্ছে বক্তৃতা!

একের পর একজন করে উঠে দাঁড়ালো মাইক্রোফোনের সামনে আর উদাত্ত কণ্ঠে বক্তৃতা করতে লাগল—জ্বালাময়ী তাদের ভাষা, উদ্দীপ্ত তাদের

কণ্ঠ আর আবেগ-উচ্ছল তাদের ভাবমূর্ত্তি। সমবেত জনারণ্য বারম্বার উচ্চকণ্ঠে সমর্থন জ্ঞাপন করছে, বারম্বার বলছে—"বলুন বলুন…"

"চাই স্বাধীনতা—" মঞ্চের উপর অকস্মাৎ উঠে মাইক্রোফোনের সমুখে গিয়ে শিলাজিত বলতে আরম্ভ করলো—"স্বাধীনতা চাই আমরা; সকল দেশের সব মানুষই সর্ব্বকালেই চেয়ে এসেছে স্বাধীনতা, ভোগ করে এসেছে স্বাধীনতা। মাতৃগর্ভে বন্দী শিশু পৃথিবীর স্বাধীন মাটিতেই মুক্তিলাভ করে—স্বাধীন সে সেই মুহূর্ত্ত থেকে যখনি তার নাড়ীচ্ছেদ হয়ে গেল মা'র সঙ্গে। সে তখন নিজেই শ্বাস গ্রহণ করে—নিজেই খাদ্য উদরস্থ করে—নিজেকে নিজেই নিয়ন্ত্রিত করে। জীবের স্বাধীনতা এতখানি অধিকার থাকা সত্ত্বেও এই পৃথিবীতে কেউই কখনো স্বাধীন নয়—কোনো কালেই কেউ মুক্ত নয়। একটা কবিতা পড়েছিলাম :—

"মুক্তি মুক্তি করিস রে ভাই, মুক্তি কোথায় মিলে?

চরকা ঘোরে তো ঘোরে নাকো যদি টাকু রশি হয় ঢিলে।" তাই বলছি বন্ধনও দরকার। যে বন্ধন……

—কে মশাই আপনি? কার তরফের?—কোন্ দলের?

—বসিয়ে দাও, বসতে বলো ওকে!

—বের করে দাও, দূর করে দাও এখান থেকে।

—মারো, মেরে তাড়িয়ে দাও…

—শিলাজিত বলল, বন্ধুগণ, শুনুন, আপনাদের থেকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্ক্ষা আমার তিলমাত্র কম নয়—বুঝুন আপনারা…।

—বুঝেছি, মশাই, বুঝেছি—বার করে দাও ওকে—গেট-আউট—গেট আউট—।

চীৎকার—হুল্লোড়—হাততালির চটপট শব্দ!

শিলাজিত আবার বলল,—শুনুন, শুনুন আপনারা, আমি বলতে চাইছি, মহাভারত মণ্ডলের সম্পূর্ণ সম্মান বজায় রেখে আজ ভারতের

শ্রোতাগণ সম্মিলিত ভাবে…

—চাইনে শুনতে—

—কোনো কথা শুনতে চাই না তোমার—তাড়িয়ে দাও, মেরে তাড়িয়ে দাও—মার মার ওকে…

উচ্ছৃঙ্খল জনতার বিপুল কোলাহলে ডুবে গেল শিলাজিতের কণ্ঠস্বর। 'মার—মার—মার' শব্দ চারিদিকে। সভানেত্রী উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুললেন থামুন, থামুন সকলে, শান্ত হোন, শান্ত হোন।

—অর্ডার—অর্ডার প্লিজ! চীৎকার উঠলো কয়েকটা—কিন্তু জনতা একবার যদি উচ্ছৃঙ্খল হয় তো তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা প্রায় অসম্ভব! জনতার স্বভাবই এই। ভাল বা মন্দ তারা তখন আর বিবেচনা করে না—মার্—মার্—মার্—যে কিছুই শোনে নি, সেও বলছে—মার শালাকে—মেরে ভাগিয়ে দে…।

শিলাজিত সমস্ত শক্তি একত্র করে চীৎকার করলো—আমার ভারতীয় ভাইসব—আমি তোমাদের—আমি তোমাদের দাসানুদাস, আমিও ভারত মাতার নগণ্য সেবক। মাতার শৃঙ্খল মোচনের চেষ্টাতেই এসেছি এতদূরে…আমার কথা শোনো—শোনো আমার…

চটাস্ করে একটা চড় পড়ল শিলাজিতের গালে—বেরোও—বেরিয়ে যাও…।

গ্রাহ্য না করে শিলাজিত বলল—আমার উত্তেজিত ভাইবোনেরা, আমাকে বলতে দাও—

—গেট আউট…গেট…আউট…ছুটো কিল পড়লো ওর পিঠে।

—থামুন—থামুন—সভানেত্রী ব্যাকুলভাবে বললেন—ওর কথাটা শুনতে দিন।

—ভাগ শালা…প্রচণ্ড একটা পদাঘাত পড়ল শিলাজিতের কোমরে। ছিটকে পড়ল গিয়ে শিলাজিত মঞ্চের তলায়—অজ্ঞান—হতচেতন।

—হায় হতভাগ্যের দল—ওর কথাটা শোনবার সময়ও দিলেনা—বলতে বলতে সভানেত্রী স্বয়ং এসে শিলাজিতের দেহটার উপর আড়াল দিয়ে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকজন ওঁর চারিদিক ঘিরে রক্ষা করতে লাগল ওঁদের।

চীৎকার, গণ্ডগোল, হৈচৈ—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি—বন্দে-মাতরমের আওয়াজ, গন্ধীজির জয় ঘোষণা···তারপর আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে গেল সেই বিরাট জনতা।

—কি হয়েছিল ?

—কে জানে ভাই।

—কাকে মারলে ?

—জানি না—মেরেছে কিন্তু খুব। বাঁচবে না হয়তো।

—কেন ? কেন ? কি বলেছিল কি ?

—কি জানি ? শুনতেই পেলাম না—যা গোলমাল।

যে যার পথ দেখছে। বাড়ী যাবে সব ওরা। একজন মঞ্চে উঠে বলে দিলেন—এই অপ্রকৃস্থ অস্থির জনতা স্বাধীনতা চাইতে আসে ? এর থেকে লজ্জার বিষয় ভারতমাতার আর কিছু নাই। যারা এই গোলযোগের সৃষ্টি করেছেন, তাঁরা ভারতের কুপুত্র। তাঁরা যেন স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ না করেন আর। এই পরমত-অসহিষ্ণুতা ক্ষমার্হ নয়। একজন তার স্বাধীন মত প্রকাশ করতে চাইলেই অমনি তাকে মেরে তাড়াতে হবে—যে দেশের মানুষ এতখানি আত্মপরায়ণ, সে দেশ স্বাধীন হবার যোগ্য হয় নি। যান—সব বাড়ী গিয়ে ভেবে দেখবেন, আর নিজেদের সংশোধন করবেন।

নির্লজ্জের মত হাসলো লোকগুলো; দিব্যি চলে গেল যে-যার বাড়ী। একবার ভেবে দেখলো না যে কতখানি নীচতা তারা দেখিয়ে গেল আজ। এরাই নাকি ভারতকে স্বাধীন করবে! হায়রে কপাল—

হায়রে হতভাগ্য ভারতমাতা!

ষ্ট্রেচারে করে তুলে নিতে হোল শিলাজিতকে—হাঁসপাতালেই নিয়ে যাওয়া হোল। ছোট হাঁসপাতাল, সেইখানেই একটা ছোট ঘরে রাখা হোল ওর অজ্ঞান দেহ। সভানেত্রী বললেন—ও বাঙ্গালী, আমার ঘরেই ওকে নিয়ে যেতে পারতাম—কিন্তু চিকিৎসা এইখানেই ভাল হবে।

—থাক! মাথার আঘাতটা খুবই জোর হয়েছে—তবে বেঁচে যাবে। ডাক্তার বললেন!

প্রাথমিক চিকিৎসা আরম্ভ হোল। সভানেত্রীও রইলেন ওখানেই!

—যে জাতের সংযম শক্তি এত কম, তারা স্বাধীনতা চায় কোন লজ্জায়!—বললো একজন।

—সত্যি! ওর কথাগুলো দাঁড়িয়ে শুনে তারপর কথা দিয়েই তো প্রতিবাদ করা যেতে পারতো।

—বাদ-প্রতিবাদের কিছু তো দরকার নেই। লোকটা হয় প্রচারক না হয় ক্যানভাসার।

—তার কোনো পরিচয় পাইনি। ও যা বলছিল, তার মধ্যে সত্য ছিল প্রচুর।

—স্বাধীনতাকামী জাতি স্বাধীন একদিন হবেই—কেউ রুখতে পারে না। স্বাধীনতার কামনা যদি আমাদের সত্য হয় তবে সে কামনা সিদ্ধি দেবেই—সত্য কখনো মরে না, মরবে না। ঐ যে মজুর আন্দোলন, ও আন্দোলন মরবে না—কারণ ওর মধ্যে সত্য আছে অনেকখানি। ওকে সয়ে নিতেই হবে পুঁজিপতিদের। ওদের দাবীও মেটাতে হবে—কারণ ঐ আন্দোলন সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আজো অতখানি সত্য হয়েছে বলে মনে করি না!

—না করবার কারণ? বিস্তর দুঃখ বরণ করেছে দেশের লোক এই তোমার জন্য।

—হ্যাঁ, করেছে! বেশী দুঃখ বরণ করেছে যুবশক্তি—সব দেশেই তাই করে—কিন্তু এদেশে আন্দোলনটা ভুল পথে চালিত হয়েছিল বলে ব্যর্থ হয়েছে। ওর তলায় জাতীয় সমর্থন ছিল না।

—বেশ, আজ তো আমরা অহিংসা-আন্দোলনেও কম দুঃখ বরণ করছি না! তবু এ আন্দোলন তেমন জোরালো সত্য হয় নি—একথা বলছো কেন?

—কারণ, দুঃখ যারা বরণ করেছে, তাদের শতকরা পঁচানব্বই জনই সাধারণ শ্রেণীর, তাই তারা ছিল নিষ্ঠাবান। দুঃখবরণ করে হয় তারা মরেছে নয়তো এপথ থেকে সরে গেছে। কিন্তু যে পাঁচজন কর্ত্তৃত্বের সুযোগ পেয়েছে তাদের মধ্যে সাড়ে চারজনই করেছে বিশ্বাসঘাতকতা, দেশের উপর, জাতির উপর—এমন কি নিজের উপরও। ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসে শতকরা আধজন ব্যক্তি মাত্র সত্যি সত্যি চেয়েছেন স্বাধীনতা। ব্যক্তিগত স্বার্থ, জাতিগত স্বার্থ, প্রদেশগত স্বার্থ, পরিবারগত স্বার্থ, এমন কি পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতির স্বার্থ পর্য্যন্ত ভালভাবে দেখে তবে ওরা দেশের কল্যাণের কাজে লেগেছিলেন।
—এইটাই খাঁটি ইতিহাস।

—তবে এ-আন্দোলন টিকে আছে কেন?

—কারণ ঐ আধজনের আত্মত্যাগ—ঐ আধজনের সত্যকার আকাঙ্ক্ষা আর নিষ্ঠা একে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আজ হয়তো ঐ আধজন বেড়ে পঁচিশজন হয়েছে, কিন্তু এখনো অনেক বাকি! স্বাধীনতা যারা চাইবে তারা স্বাধীনতাই চাইবে সর্ব্বাগ্রে—ধর্ম্ম, সমাজ-সংস্কার, প্রদেশ, সংখ্যার কমবেশী এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তাদের থাকা উচিত নয়। যারা মাথা ঘামায়—তারা স্বাধীনতা চায় না—চায় স্বার্থ!

—তাহলে কেমন করে মিলবে আমাদের স্বাধীনতা?

—মিলবেই—ঐ পঁচিশজন অচিরে পঁচানব্বইজনে গিয়ে দাঁড়াবে—

সেদিন কেউ ঠেকাতে পারবে না স্বাধীনতা লাভ।

ওরা চলতে চলতে একটা রেস্তোরায় ঢুক্‌লো। কয়েকজন আগেই ঢুকে চা খাচ্ছে আর বলছে—লোকটা বাঁচবে না। মাথার খুলিটাই উড়ে গেছে।

—আরে না; বিশেষ কিছু লাগেনি। হাঁসপাতালে নিয়ে গেল, দেখলাম।

—মরুক ব্যাটা। ও নিশ্চয় গুপ্তচর —মার দেওয়া ঠিকই হয়েছে।

একজন তরুণী আর একজন তরুণ চা খেতে এলো ঠিক এই সময়। ওদের একজন বলল—রোমিও জুলিয়েট হচ্ছে এই হপ্তায় এম্পায়ারে; যাবি নাকি রে?

—রাস্তাতেই অনেক জুলিয়েট দেখা যায়। তারজন্যে পয়সা খরচ করা কেন আবার?

—তুই শালা বড্ড কেপ্পন হয়েছিস—বাপের পয়সা না ওড়ালে তোর বাপ স্বর্গে যাবে না—জানিস?

—তা নাইবা গেল—মর্ত্ত থেকে সরবে তো, তাহলেই হবে আমার।

—বাঃ, কি সুপুত্তুর র‍্যা। বাবার পুণ্যের জোর আছে মাইরী।

—আমি কোনো দিন 'বাবা' হব না মাইরী—আজকালকার ছেলেদের বিশ্বাস নাই।

—ঠিক কথা।

* * *

—ওকে বাঁচাতেই হবে, ডাক্তার সাব, যে করেই হোক বাঁচাতেই হবে।—বলে উঠলো সভানেত্রী।

—চেষ্টার কোনোরকম ত্রুটি হবে না—বললেন ডাক্তার।

সারি সারি গম্ভীরতম হচ্ছে—অচৈতন্য শিলাজিত পড়ে আছে হাঁসপাতালের

লোহার খাটে। আঘাতটা সত্যি এতখানি গুরুতর হয়েছে ওর—তখন তা বোঝা যায়নি। জ্ঞান কি আর ফিরবেই না, নাকি? নার্স এসে কি একটা ওষুধ দিল—মৃদু হেসে বলল,

—যান আপনি। আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন। জ্ঞান ফিরলে খবর দেব আপনাকে।

—না, এই গুরুতর কাণ্ডটার জন্ম আমিই দায়ী। এ না বাঁচলে দুঃখ রাখবার জায়গা থাকবে না আমার।

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনি বসে থাকলেই ওঁর বাঁচার পক্ষে বিশেষ কোনো লাভ হবে কি?

চুপ করে রইলো সভানেত্রী। কিন্তু বসেই রইল। শিলাজিতের ঠোঁট কাঁপছে—"ওরা কি চায়? চায় কি ওরা? স্বাধীনতা? না; ওরা স্বাধীনতার জন্যে কখনো ভাবে না। ওরা চায় হুজুগ—হুজুগ!"—ঐ সাধারণ, ঐ জনসাধারণ,—ওদের এক ফোঁটা শক্তিও স্বাধীনতার জন্য ব্যয় করছে না ওরা। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই ওদের! ওদের বুঝিয়ে কিছু লাভ হবে না। কোথায় শোনবার মত ওদের ধৈর্য্য। ওরা একবার ভেবে দেখলো না যে সমস্ত মতবাদ আর ভেদবাদের উপরে ভারতীয়বাদ এবং ভারতীয়বাদের একমাত্র লক্ষ্য ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ! সুখ নয়—শান্তি নয়, বজ্রের চেয়ে জ্বালাময়, মৃত্যুর চেয়ে অন্ধকারময় সেই যাত্রাপথ—তবু সেই পথেই যেতে হবে—এ কথাটা ওদের কিছুতেই বোঝানো গেল না"—আপনার মনে বলছে শিলাজিত?

—"মেরে ফেল—কিছু দুঃখ নেই, মেরে ফেল।"—শিলাজিত বিড়-বিড় করে বলছে—"আবার আমি জন্মাবো—এই ভারতের মাটিতেই আবার ভূমিষ্ঠ হবো..., এই ভবিষ্যৎ ভারতের স্বাধীন-ভূমিতে! এই ভারতের স্বাধীন বাতাসে নিশ্বাস নেব সেদিন—স্বাধীন আলোকে চোখ মেলবো!

আমায় মেরে ফেল…কিন্তু তোমরা বুঝে দেখো—ভেবে দেখো—স্বাধীনতার পথ, দুঃখ-বরণের পথ—ত্যাগের পথ…মৃত্যুর পথ…ভেবে দেখো তোমরা…। উঃ পিপাসা পাচ্ছে!—জল…জল দিন একটু!

সভানেত্রী জল দিলেন একটু ওর মুখে! জলটুকু গিলে শিলাজিত অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

—কে—কে তুমি? কাজল? কাজল তুমি…নাঃ নাঃ, তুমি কে তা'হলে? কেয়া দেবী—আঃ তুমি—সরে এসো, দেখি—দেখি তোমায়। তুমি কি লেখা? লেখা তুমি? ও!

—ঘুমুতে চেষ্টা করুন একটু।

—আমি? না। আমি তো আর ঘুমুবো না? আমি জেগে থাকবো—আমি দেখবো…তুমি কে? কে তুমি? তুমি কি লেখা? তুমি…তুমি…তুমি? লেখা…

শিলাজিত আবার অজ্ঞান হয়ে গেল। সভানেত্রী ওর মাথাটা তুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ওর চোখে জল! কয়েক মিনিট পরে আবার জ্ঞান হতেই বলল,—সত্যি বলো, বলো সত্যি করে, তুমি কাজল নও, তুমি নও কাজল! তুমি লেখা—লেখা আমার!

—লেখা বোধ হয় ওর কোনো আত্মীয়ার নাম—তাকেই খুঁজছে…আপনি বলুন যে আপনিই লেখা।

নার্সটা অতি আস্তে সভানেত্রীর কানে কানে বলতে লাগলো—বলুন—আপনিই লেখা! বলুন; নইলে ওকে বাঁচানো কঠিন হবে!

সভানেত্রী চোখের জল মুছতে লাগলো।

—তুমি নও লেখা? লেখা নও তুমি? ও না, লেখা তো বেঁচে নাই—আমার উপর রাগ করে সে যে জলে ডুবে মরেছে। আমিও মরবো—আজই, এখুনি, ওর কাছেই যাব।…

—না—না—আমি লেখা—আমিই লেখা তোমার—ব্যগ্রভাবে

সভানেত্রী ওর মাথাটা ধরলো বুকে চেপে!—তুমি ভালো হয়ে ওঠো, ভালো হয়ে ওঠো তুমি···লেখাকে তুমি এত ভালোবাসো?

—তুমি লেখা?

—হ্যাঁ, আমি মরিনি, বেঁচেই আছি। ভারতের সেবার জন্যেই বেঁচে আছি আমি?

—তা' হলে আমাকেও বাঁচাও—তোমার সঙ্গে, তোমার পাশে আমি যাবো—যাবো ঐ পথে, ঐ উদয়-সূর্য্যের আলো লেগে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আমাদের যে রক্ত-রাঙা পথ! আমায় নিয়ে চল!—শিলাজিত রাত্রির স্তব্ধ অন্ধকারের পানে চাইল—যেন কোথায় কি দেখতে পেয়েছে।

গভীর স্নেহে ওর ললাটে চুমা দিল লেখা!—

সময় বয়ে চলেছে—দুঃসহ দুঃখ-নিশার অবসানের প্রতীক্ষা—পূর্ব্বাকাশের আলোক-জ্যোতি অন্ধকারকে শঙ্কিত করে তুলছে। ভোর হচ্ছে।

১৬

—ওঁকে আমি মক্কায় পাঠাবো দাদু—হজ করে উনি 'হাজি' হয়ে আসবেন—কেয়া বলল।

—বেশ ভাই দিদি—সে আর এমন বেশি কথা কি—দাদামশাই উত্তর দিলেন—কিন্তু তোর বিয়েটা ও না দেখে যাবে কি করে—কি বলো ভাই নাজির?

—বিয়ে? বিয়ে কার দাদু? আমার! কার সঙ্গে?—কেয়া উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসল!

—কেন? যাকে তোর পছন্দ হয়েছে।—বলে ঠাকুরদা খানিকটা যেন বিস্ময় হয়ে তাকালেন কেয়ার দিকে। কিংশুকের কথাটায় যেন এখন খটকা লাগছে। কেয়া বলল—

—আমার পছন্দ তো তোমাকে দাদু, কিন্তু তুমি যে বিয়ে করতেই

চাও না—কি আর করি!

—ছেলে তো সে বেশ ভালো কেয়া! সুন্দর, বিদ্বান, ভদ্র—।

—কার কথা বলছো তুমি দাদু? ওঃ বুঝেছি।—কেয়া মুখখানা লাল করে তুললো।

—আমার তো বেশ পছন্দ হয় ভাই—দাদু আবার বললেন!

—তাতে আমার কিছু কাজ দেবে না দাদু—বিয়ে যখন আমি করব তখন পছন্দটা আমারই আগে হওয়া দরকার! কিন্তু বিয়ের কথা এখন বাদ দাও। আজ ডাকাতি মামলাটার দিন। দাদু-সাহেবকে সদরে নিয়ে যেতে হবে। মামলা যাতে আজই চুকে যায় তার ব্যবস্থা করো! দাদুসাহেব মক্কা যাবেন—আমি তার সব ব্যবস্থা করে রাখছি। পরশুই যাবেন উনি—বুঝলে দাদু? দাদুসাহেব ফিরে এলে তখন আমার বিয়ের কথা! তার আগে উনি আশীর্ব্বাদ নিয়ে আসুন আমার জন্যে—আর দেখ দাদু, তুমি বড্ড ছেলেমানুষ—বিয়ে, মানে যাকে বলে ঘর সংসার করবার জন্যে একজন পুরুষ মানুষ যোগাড় করা; সে কাজ যাকে-তাকে দিয়ে হয় না!

—কিংশুক কি মন্দ পাত্র কেয়া?

—ভালোমন্দের কথা হচ্ছে না দাদু; যার পায়ে তিন নম্বরের জুতো লাগবে, সে চার নম্বরের জুতো কেনে না—তা সেই চার নম্বরের জুতো যতই ভালো হোক।

—একেবারে জুতোর সঙ্গেই তুলনা করে দিলি!

—হ্যাঁ—মানে, ওর থেকে আরো ভালো উপমা আর এখন খুঁজে পাচ্ছি না!

ঠাকুরদা বেশ বুঝলেন—কিংশুক তাকে ধাপ্পা দিয়েছে। কিংশুককে বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই কেয়ার। কিন্তু কেয়ার বিয়ে আর না দিলেই নয়। উনি ব্যাকুলভাবে বললেন—বিয়ে কি তুই করবিই না আর দিদি?

কেয়া মিনিট খানেক চুপ করে রইল, বুঝলো ঠাকুরদার মনের অবস্থা। সর্ব্বস্ব বঞ্চিত হয়ে ঐ হতভাগ্য বৃদ্ধ এই নাতনিটির উপরই নির্ভর করে বসে আছেন! কেয়ার চোখ দুটি স্নেহে করুণায়-সহানুভূতিতে নির্ণিমেষ হয়ে উঠলো। বলল আস্তে—

—বিয়ে করতেই হবে ঠাকুরদা—করবোও; আর দু'এক মাস সময় দাও—একটু ভাবি!

ঠাকুরদার মাথার ছোট ছোট চুল কটি ও আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো। বৃদ্ধ আর কিছু বলা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। উঠে মন্দিরের দিকে এলেন! কেয়ার বাবা বসে আছেন একটা চাঁপা গাছের তলাতে।—চাঁপা ফুল ফুটেছে নাকি এ গাছটায়?

শুধুলেন উনি। অমনোযোগী ছাত্রের মতন কেয়ার বাবা একটু চমকে উঠে বললেন—হ্যাঁ—বাবা, ফুটেছে! কেয়া দেখেনি এখনো!

—আসুক, দেখবে!—এই কিংশুক ছেলেটিকে তোর কেমন পছন্দ হয় দেব!

—কেন বাবা? কোয়ায় জন্যে বলছেন? নাঃ। কেয়া ওকে চাইবে না।

—কেন?

—ও বিলাসী ধনী সম্প্রদায়ের ছেলে বাবা। ওরা বিয়ে করে না, সুন্দর মেয়ে নিয়ে গিয়ে ঘর সাজায়। কেয়া ওকে নিতে পারবে না। কেয়া চায় কাজের মানুষ, কল্পনার আলস্যে যে দিন কাটায় না—কাজে খাটায় কল্পনাকে—কেয়া চায় সেই রকম বর।

—কাকে নিতে পারবে তাহলে?

—তা জানি না বাবা! কেয়ার মনের মত ছেলে একজন মাত্র দেখেছিলাম। সে বিবাহিত! নইলে বলতাম আপনাকে। আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন বাবা! ঈশ্বর জুটিয়ে দেবেন!

কিংশুক এই দিকেই আসছে—কাজেই ভাল ছেলের কথা এইখানেই থেমে গেল।

—আজ সেই চোরাই মামলাটার দিন আছে, না ?—কিংশুক শুধুলো।

—হ্যাঁ, নাজিরকে নিয়ে যেতে হবে—ওরে, ড্রাইভারকে খবর দিয়ে যা!

—কে কে যাবেন ? আপনিও যাচ্ছেন নাকি ?

—হ্যাঁ! যেতে হবে।

কিংশুক একটা কাঠের বেঞ্চে বসল ঐখানে। কেয়ার মতটা ঠাকুরদা জেনেছে কি না, কিংশুক জানতে চায়, কিন্তু কথা পাড়তে পারছে না। ওর আশা, এরা নিজেরাই সে কথা বলবে ওকে। দুতিন মিনিটের মধ্যেও কেউ কিছুই বলল না; কিংশুক নিরাশ হয়ে যেন নিজের মনে বলল—আমাকেও যেতে হবে আজ না হয় কাল। দাদা তাগাদা দিয়ে চিঠি লিখেছে!

—পরশু কেয়ার উৎসবটা হয়ে যাক—তারপর যেও ভাই···বললেন ঠাকুরদা!

নাঃ, কোনো ইঙ্গিতই পাওয়া যাচ্ছে না। দারুণ চিন্তিত হয়ে উঠলো কিংশুক! কেয়া কি মত দেয় নি তাহলে ? কিম্বা এরা এখনো তাকে জিজ্ঞাসা করবার সুযোগ পায় নি ? নানা চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠলো কিংশুক! ওর সুখের স্বপ্ন বুঝি ভেঙে যায়! ঈশ্বর—করুণাময়! ঈশ্বরকে আজকাল দয়া করে ডাকে কিংশুক মাঝে মাঝে।

কেয়া আসছে; এই দিকেই আসছে। সেই দুরন্ত ছেলেটা সঙ্গে নেই; জ্বর হয়ে পড়ে আছে নিশ্চয়! ভালই হয়েছে। ও রকম ছেলের জ্বর হবে না তো হবে কার ? যেমন দাদা, তেমনি তো ভাই হবে!

কেয়া এসে পৌঁছাতেই দাদু বললেন—তোর চাঁপাগাছে ফুল ফুটেছে ভাই, বিয়ের ফুল—আয়, চুলে পরিয়ে দি!

—ভেঙো না, ভেঙো না দাদু—আগে ঠাকুরের পুজো হবে যে! গাছের প্রথম ফুল-ফুল ঠাকুরকে দিতে হয়।

—আজকাল আর অত বাড়াবাড়ি কেউ করে না মিস ব্যানার্জি।—কিংশুক অকস্মাৎ বলল।

—ঠাকুর পুজোর বাড়াবাড়ি নেই। ঠাকুর অনাদি এবং অনন্তকাল থাকবেন—কেয়া জবাব দিল।

—কিন্তু বহু দেশ এবং বহু লোক আছে, যারা ঠাকুরের অস্তিত্বই স্বীকার করে না!—কিংশুক ফের বলল।

—ঠাকুরের তাতে কিছু এসে যাবে না। তার অস্তিত্ব থাক আর নাই থাক—সেই অরূপের অপরূপ রূপের কল্পনা আর অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের বিভূতির দাক্ষিণ্য মানুষের নিজের মনেরই ঐশ্বর্য্য বাড়ায়। যারা তাঁকে স্বীকার করে না তারা মানুষ নামক প্রাণী-বিশেষ বলে পরিচিত হলেও নিতান্তই সাধারণ প্রাণী। নগণ্য শ্রেণীর জীব! ঈশ্বরের উপাসনা আর অনুভূতি দিয়ে মানুষ নিজেকেই বড় করেছে!

—বিনা ঈশ্বর-উপাসনায় কি সেটা হতে পারে না, বলছেন?

—এ পর্য্যন্ত হয় নি। যদি কখনো হয় তো সেদিন আমিও স্বীকার করবো যে ঈশ্বর নাই কিম্বা তাঁর থাকার কোনো দরকার নেই! কিন্তু আজো দরকার রয়েছে! মানুষকে মানুষ হবার মন্ত্রে দীক্ষা দেবার জন্য ঈশ্বরকে নিতান্ত প্রয়োজন।

কেয়ার তার্কিক প্রবৃত্তিটা সবেগে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে আজ!

এর কারণটা ঠাকুরদা বুঝতে পারছেন। কেয়া চটেছে কিংশুকের উপর এবং ঈশ্বর-অবিশ্বাসী এই ভণ্ড লোকটাকে যে ও মোটে পছন্দ করে না—সেটা ঠাকুরদা আর বাবাকে বুঝিয়ে দিতে চায়।

—থাম কেয়া—ওরা কলকাতার ছেলে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের আবহাওয়ার মানুষ—বাবা বললেন।

—না-না—আমি ওকে একটু রাগিয়ে মজা দেখছিলাম—বলুন না উনি!—বলল কিংশুক তাড়াতাড়ি—আবার বলল—ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা

আসছেন আমার চোদ্দপুরুষ—আমি এমন কি হয়েছি যে বিশ্বাস করবো না? নতুন গাছের ফুল দাদু দিতে চাইলেন তুলে—ওর নেওয়াই উচিত।

—না, দাদু ছেলেমানুষ, ভুল করতে পারেন, আমি করতে পারি না—কি বলো দাদু?—কথাটা বলেই কেয়া বিনীত হাসলো।

তীরবেগে একখানা সাইকেল এসে থামলো মন্দিরের সম্মুখে—নামলো অঞ্জন! প্রথমেই ও জুতোজোড়াটা খুলে মন্দিরের দাওয়ার নীচেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলো ঠাকুরকে। কিংশুক এটা করে নি। ভুল হয়ে গেছে ওর। অঞ্জন উঠে চাঁপা গাছটার কাছে এদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসছে—বলল।

—এই যে কেয়া দেবী—নমস্কার! অঞ্জন দুহাত কপালে ঠেকালো। কেয়া ছুটে আসতে আসতে বলছে—আসুন, আসুন, আমি আশাই করিনি যে আপনি আসবেন—। কেয়া পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো অঞ্জনকে।

—এই আমার দাদু; আর বাবাকে তো চেনেনই, আর উনি কিংশুক বাবু—চেনেন বোধ হয়?

—হ্যাঁ—অঞ্জন বৃদ্ধকে প্রণাম করলো, তারপর করলো কেয়ার বাবাকে—কিংশুককে নমস্কার করে বলল—

—কেমন আছে মণ্টু? দাদু-সাহেব নিশ্চয় ভাল আছে?

—হ্যাঁ—দুজনেই ভালো আছে। মণ্টু বাবুর সম্বন্ধে একটু মিছে কথা লিখেছিলাম আমি টেলিগ্রামে—ও সিরিয়াসলি ইল্ নয়—শুধু ইল্; সর্দ্দি লেগেছে—চলুন, দেখবেন—কেয়া ওর গলার চাদরটার একপ্রান্ত ধরলো। কত যেন আপনার, কত যেন দীর্ঘ প্রবাস-প্রত্যাগত প্রিয়জন।

—তারপর কেমন আছেন মিঃ মুখার্জ্জী? আপনার নবভারত সংগঠন কতখানা এগুলো? বলল কিংশুক।

—আস্তে এগুচ্ছে—জবাব দিল অঞ্জন—কিন্তু নবভারত সংগঠন আমারই একার নয় মিঃ চট্টরাজ—আপনারও সেটা হওয়া উচিত। আমার

কাজে যদি ত্রুটি থাকে তো সংশোধন করে দেওয়া উচিত—কেয়াকে বলল, —মিছে কথা লিখতে নাই কেয়া—সত্য গোপন করাও পাপ—ঈশ্বর তোমায় যেন মার্জ্জনা করেন।

কেয়া কাঁদ কাঁদ হয়ে উঠলো—বলল—আপনি যে কিছুতেই আসছিলেন না—আপনাকে আমার বড্ড দরকার একবার—তাই লিখেছিলাম—আপনি ক্ষমা করলেন তো?

—হ্যাঁ—কিন্তু এই বিরাট বংশের মেয়ে তুমি কেয়া, আমাকে আনবার জন্য তোমার ঠাকুরদার হুকুমই তো যথেষ্ট ছিল। মিছে কথা লিখবার কি দরকার! এতে তোমার বাপ-ঠাকুরদার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।

—খুব অন্যায় হয়েছে আমার—কেয়া স্বীকার করতে চাইছে আরো উচ্চকণ্ঠে—আমাকে যদি শাস্তি দেন আপনি কিছু!

—হয়েছে তোমার শাস্তি। পৃথিবীতে মিথ্যার চেয়ে পাপ নেই কেয়া। জগৎ আবার সেই সত্য যুগেই ফিরে যাবে, যেদিন মানুষ আবার সত্যের মর্য্যাদা দিতে শিখবে। বিজ্ঞান, দর্শন, জ্ঞান-গবেষণা সকলের উপরে সত্যকে স্থান দিও—ঈশ্বর মানে সত্য—তোমার জ্ঞানে, তোমার ধারণায়, তোমার বিবেকবুদ্ধির কাছে যা পরিস্ফুট—তাই সত্য, আর সেইটাই তোমার উপাস্য ঈশ্বর। ঈশ্বরের স্বতন্ত্র আর কোনো রূপ নাই—ঐ সত্যই স্বরূপ তাঁর।

অঞ্জন ক্লান্ত হয়ে এসেছে রাত জেগে। ঐ চাঁপা গাছটার তলাতেই একটা কাঠের টুলে বসে পড়ে বলল—ভালই তো আছে মণ্টু—থাক—স্নান পুজো করে দেখবো তাকে।

এতটা সময় বুড়ো দাদু কোনো কথা বলেনি—কেয়ার বাবাও না। বৃদ্ধ এতক্ষণে বললেন—তোমার কথা রোজই শুনি ভাই অঞ্জন, আজ দেখলুম তোমায়—কেয়া কিছু বাড়িয়ে বলে নি, দেখছি।

কেয়ার দিকে তাকালেন উনি মৃদু হেসে। কেয়া খুসীর আনন্দে বলে উঠলো।

—দেখো দাদু—দেখো! আমার কথা বিশ্বাস হোল তো এবার? পরশু আমার ব্রত, আপনাকে থাকতে হবে কিন্তু—শেষের কথাটা অবশ্য আপনাকেই বলল কেয়া।

—আমার সময় কৈ কেয়া।

—ও সব কথা শুনছি না আমি। চলুন, উঠুন। স্নান-পূজো করে খেয়ে ঘুমুবেন একটু। সারা রাত জেগে তো?

—হ্যাঁ, গাড়ীতে বড্ড ভীড়। বসবার যায়গাই মেলা ভার।

—আপনি তো আমার সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে—না?

—হ্যাঁ—আমি মধ্যবিত্তই কেয়া—বরং স্বল্পবিত্ত শ্রেণীর বলতে পার।

কেয়া হাসিমুখে চুপ করে রইল। ওর ঠাকুরদা বললেন—তুমি স্বেচ্ছায় এই দুঃখ বরণ করে নিয়েছ ভায়া—তোমার বাপ-ঠাকুরদাকে চিনি আমি—মধ্যবিত্ত নও তোররা।

—সারা দেশটাই নির্বিত্ত হয়ে গেছে দাদামশাই। আপনি, আমি কেউ বাদ যায় না। তাই দুচার জনের ব্যক্তিগত ধনের কথা ভাবি না আর। যাদের কিছু আছে তারা ভোগ করে নিক আর এক পুরুষ—কিন্তু খুব বেশি দিন নয় আর। ধনসাম্য পৃথিবীতে আসবেই—সেই উষার প্রতীক্ষায় আমরা রাত্রি জেগে বসে আছি।

—আপনি কি কমিউনিজমে বিশ্বাসী?—কিংশুক হঠাৎ প্রশ্ন করলো।

—আমি পৃথিবীর মানুষের দুঃখ-দৈন্যে ব্যথিত একজন মানুষ—যে পথে সেই দুঃখ-দৈন্যের অবসান ঘটবে, আমি সেই পন্থী।

—ভারতকে তো আপনি এক করতে চাইছেন শিক্ষা আর সংস্কৃতির বাঁধন দিয়ে।

—না—শুধু শিক্ষা আর সংস্কৃতি নয়—মানবতার বাঁধনে বাঁধতে চাই।

এক বিরাট দেশের জল-মাটি-হাওয়ায় আবেষ্টনের একত্ব আনতে চাই। ধর্ম্ম, সমাজ বা শ্রেণীভেদ কাল্পনিক সৃষ্টি—সত্য জাগ্রত—সেই সত্য একদিন উদিত হবে সূর্য্যের মতই—যেদিন এই ভারতের প্রত্যেকটি মানুষ বুঝবে—ধর্ম্ম, সমাজ বা শ্রেণীভেদ কাল্পনিক—সত্য এই ভারতের জল-মাটি-হাওয়ায় বেঁচে থাকা—এই ভারতের কল্যাণের পথে স্বকল্যাণ—এই ভারতের আত্মার মুক্তিতেই পার্থিব এবং অপার্থিব মুক্তি।

—চলুন স্নান করবেন—কেয়া বাধা দিল এবার—এখানে বক্তৃতা করে লাভ কি আপনার? উলুবনে মুক্তো ছড়াবেন না—চলুন!

—ভারতের মাটির প্রত্যেকটি জীবনকেই আমার দরকার কেয়া, উলুবন যদি থাকে তো তাকে মুক্তা বন করবার সাধনা করি আমি। চলো, উঠি দাদু, স্নান করি।

—যাও ভাই, স্নান করে এসো। বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমায়।

কেয়ার বাবা আর ঠাকুরদা। মিনিটখানেক পরে ঠাকুরদাই বললেন, —বেশ ছেলেটি।

হ্যাঁ—কিন্তু ওর বিয়ে হয়ে গেছে—কেয়া জানে—নইলে হয়তো…

কথাটা শেষ করলেন না উনি। ঠাকুরদাও উঠে পড়লেন। কিংশুক চলে যাচ্ছে ওর জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরটায়—ওকে দেখিয়ে বললেন—ওকে নেবে না।

—না—ও অসম্ভব! কেয়ার বাবা উঠে মন্দিরে ঢুকলেন গিয়ে।

যে যার ভাবনা নিয়ে আছে। কিংশুক চলছে আর ভাবছে, অঞ্জন এসে মাটি ছুঁতে না দেয় সব। যে রকম সব কথা ও বলতে লেগেছে, কেয়ার মত সেন্টিমেন্টেল মেয়েকে ঘুরিয়ে দিতে কতক্ষণ! কিংশুক বড্ড অস্বস্তি বোধ করছে। কেয়ার কাছে সেদিন অঞ্জন আর লেখা সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছে সেটার সত্যতা যদি কেয়া যাচাই করতে চায় অঞ্জনের কাছে; তাহলে যে ভয়ানক বিপদ হবে। কেয়ার কাছে মুখ দেখাতে পারবে না আর

কিংশুক। খুব অন্যায় করেছে অঞ্জনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে! তখন কি আর অত ভেবেছিল ও। এখন কি করা যায়? ভাবতে লাগল কিংশুক।

মেঘে ঢাকা রোদটা অকস্মাৎ চড়চড় হয়ে উঠলো—ষ্টেশনে যাবার লাল রাস্তাটা—যে বটচ্ছায়া সমাকীর্ণ পথ দিয়ে অঞ্জন এল এখনি—দেখা যাচ্ছে সেই পথটা। কিংশুক ঐ পথ দিয়ে একদিন কেয়াকে কি নিয়ে যেতে পারবে না—ঐ সুন্দর, সরল স্বপ্ন-রঙিন পথ দিয়ে?

১৭

সারাটা রাত যেন স্বপ্নেই কেটে গেল কাজলের! কত কি স্বপ্ন! না তো! স্বপ্ন নয়, কাজলের ভাবনা গুগুলো! ঘুমুলো কখন কাজল কাল? কোনো সময় ঘুমিয়েছে বলে মনে পড়ছে না ওর! ভেবেছে, খালি ভেবেছে সারাটা রাত। কতো অভদ্র অসভ্য কথা ভেবেছে—কতো আজগুবি অসম্ভব কথা ভেবেছে—কতো অন্যায় অশ্লীল কথা ভেবেছে!—কাজল পাশ ফিরে শুলো। প্রভাত-সূর্য্যের কিরণচ্ছটা ঘরে এসে লুটোপুটি খাচ্ছে! দীপ্ত দিবালোক—স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী। কোথাও কিছু আড়াল করবার উপায় নাই—এতোটুকু কিছু লুকোবার যায়গা নাই—সব আলোয় আলোময়!

কাটিমটা গেল কোথায়! ও হ্যাঁ, সেই যে ভোরেই গেছে আয়ার কোলে। বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছে আয়ার সঙ্গে ছেলেটা—মা'কে ওর আর কিছু দরকার নেই! মাধবী মরলে ঠিক অমনি করেই ও কাজলের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছিল—এতটুকু হেল্‌দেল নেই। ব্যাটাছেলে কিনা—একজনের বদলে আরেক জনকে ভালোবাসতে ওদের এক মিনিট দেরী হয় না—কাটিমও সেই জাতেরই।

[illegible] [illegible] বেলা! উঠতে কিন্তু মন লাগছে না। কী-ই বা

হবে উঠে! রান্না? ও না করলেও চলবে আজ! কাটিমের কিছু ক্ষতি হবে না ভাত না খেলে। খায়ই না! কাজল আজ আর রান্না করবে না—আর একটু শুয়ে থাকুক—পাশ বালিশটা টেনে নিল কাজল।

আসছে আসছে, শয়তানটা। গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, —মাম্ মাম্ মাম্···

—উঠেন নি হুজুর?—আয়াটা ঢুকলো কাটিমকে কোলে নিয়ে।

—না রে, শরীর ভালো লাগছে না—কাল বৃষ্টিতে ভিজেছি—জ্বর হোল বোধ হয়।

—নাই হুজুর—বুখার নাই হোবে—তোবে ভাত নাই খাইলেন আজ, রোটি খাইবেন।

—হ্যাঁ, রুটি সেঁকে দিতে পারবি তুই?

—জি হ্যাঁ—কাহে নাই পারবে হুজুর! রোটি ভি, ঝোলভি বানাই দিবে হামি!

—আচ্ছা, তাহলে যা ওকে নিয়ে—আমি আর একটু ঘুমুবো!

—জিঃ—বহুৎ আচ্ছা! আয়া কাটিমকে নিয়ে আবার চলে গেল বাইরে।

কাজল যেন নিস্তার পেয়ে গেল একটা কঠিন দায়ীত্ব থেকে। একটা গুরু কর্ত্তব্য থেকে মুক্তি পেল ও—এমনি হাল্‌কা লাগছে মনটা। অথচ দায়ীত্ব তো ওর কিছুই নাই আজ! আজ রান্না না করলে, যা বেলা অবধি শুয়ে থাকলে কেউ ওকে কিছু বলবার নেই। এটা শ্বশুরবাড়ী নয়।—স্বামীও বাড়ী নেই—কোনো কৈফিয়তই কারুর কাছে দিতে হবে না। নিজের জন্য রান্না?—নাইবা করলো! কাজল ভাল হয়ে শুলো আবার। ভাবতে লাগলো এতক্ষণ নেমেছে হয়তো গিয়ে সেই তাপসীপুরের ষ্টেশনে। কেমন জায়গা, কে জানে? আর কেই বা জানে, কেমন সেই কেয়া—? জানবার দরকার কি কাজলের!

হোকগে মা যেমন হয়!—হয়তো খুবই সুন্দর দেখতে; কাজলের থেকেও সুন্দর। তা হোক সুন্দর—কি বয়ে যাবে তাতে। কাজলের তো আর সতীন হতে আসছে না সে!

বিছানায় উঠে বসল কাজল—নাঃ আর ঘুমানো যায় না। কত আর মানুষ ঘুমুতে পারে! উঠে চান করে ফেললে বেশ আরাম লাগবে! যা গরম এখানে। বাপ! কাল কিন্তু রাতে বেশ শীত ছিল—বেশ লেপ চাপা দিয়ে শুয়েছিল কাজল কাল ঐ ও-ঘরে সেই বৃষ্টির সময়টায়; বেশ আরামে ঐ সময়টা কাটিয়েছিল কাজল। কাটিম আর আয়া ফিরে না এলে কাজল হয়তো উঠতোই না কাল আর।—যাকগে! এখন আর ঘুম হবে না—ওঠা যাক।

উঠে মুখ ধুয়ে স্নান করে কাপড় পরে কাজল রোদে দাঁড়িয়ে মাথার চুল শুকুচ্ছে। উঠানের ফুলগাছ ক'টার ফুলের বান ডেকেছে একেবারে। কতো ফুল। ওঃ, এত ফুল নিয়ে করবে কি ও? আলগোছে একটা সরস্বতী ফুল ছুঁলো কাজল। গন্ধ নাই কিন্তু চমৎকার দেখতে। রূপ যেন শুধু অপরূপ সৌন্দর্য্য দিয়ে গড়া। চুলগুলো খোলা রয়েছে; নইলে খোঁপায় গুঁজে নিত কাজল ওটি। তুললো না—তুলে করবে কি? কোন-বা কাজে লাগবে? এখনি কাটিম এসে হাত দিয়ে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে দেবে তো। তার থেকে গাছের ফুল গাছে থাক্।

নাঃ, কিছু ভালো লাগছে না—কাজলের জ্বর হলেই বেশ হোত। নিশ্চিন্ত শুয়ে থাকতে পারতো। সুস্থ শরীরে কি বেশীক্ষণ শুয়ে থাকা যায়? কাজল তো কুঁড়ে মেয়ে নয় যে খামোখা শুয়ে থাকতে পারবে। কাজল কি ভেবে অঞ্জনের অফিস ঘরে এল! ডাকের চিঠি থাকবার কথা এসেছে অনেকগুলো চিঠি, সব কিন্তু অঞ্জনের অফিসের—কাজলের একটাও নেই। একখানা এলে তবু খানিকক্ষণ পড়তো। এতো সব [illegible] আছে—চিঠি একটা লিখে না কেন? কি করা যায় তাহলে?

এমন নির্ব্বাক নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে থাকা অসম্ভব কাজলের পক্ষে।

অফিস পার হয়ে এ ঘরে এল। শিলাজিতের বিছানাটা বিপর্য্যস্ত হয়ে রয়েছে। কেউ দেখলে সে কি মনে করবে? কাজল ওটা ঠিক করতে লাগল ঝেড়ে ঝেড়ে। সুন্দর করে পাতলো আবার; এখন আবার শিলাজিত এসে শুতে পারবে ওতে—এমনি করে।

শিলাজিত আবার যেন আসছে! খেয়ালী মানুষ—একদিন খেয়াল হয়েছিল, ধরেছিল কাজলকে বুকে চেপে। তাও কাজলকে লেখাই মনে করেছিল হয়ত জ্বরের ঘোরে। ও কথাও ভুলে গেছে সে কবে। ও কথা কি আর কেউ মনে রাখে? কি জন্যে আর আসবে শিলাজিত এখানে? কোথায় চলে গেছে তারা ঠিক কি। কোনো খবর তো দেয় না। কি জন্যে দেবে? কাজলের সঙ্গে কি তার সম্বন্ধ?—জাত না জ্ঞাত, পাড়া না পড়সি? কতো সুন্দর মেয়ে ওর পায়ের তলায় লুটোয়—কাজলকে ও আবার মনে রাখছে না আরো কিছু!

পাশ বালিশটা বাঁ দিকে সরিয়ে দিয়ে কাজল জানালার কাছে এসে মুখ লাগালো গরাদেতে। বাইরে রৌদ্রোজ্জ্বল মাঠ—পাহাড়—বন। নদীর জলে ঝিকিমিকি; সুন্দর দৃশ্য—সুন্দর। রূপকথার রাজ্য যেন; সেদিন গিয়েছিল অঞ্জনের সঙ্গে—দেখে এসেছে ঐ রাজ্যের খানিকটা। শিলাজিত একদিন নিয়ে যেতে চেয়েছিল—যায় নি কাজল। কেন সে যায় নি! গেলে এমন কি ক্ষতি ছিল? মানুষের সঙ্গে মানুষ কেন যে মিশবে না—কেন যে এত বাধা-বন্ধন-শাসন-মানা। আবার যদি কখনো আসে শিলাজিত তো কালই নিজেই যেতে চাইবে বেড়াতে। না যাবে কেন? শিলাজিত ওর স্বামীর বন্ধু—আর ওরও তো বন্ধু।

দূর। মেয়েদের আবার পুরুষ বন্ধু হয়? হ্যাঁ হয়। হবে না কেন? লেখার বন্ধু তো উনিই। এমনি আরো কত মেয়ের বন্ধু উনি! কাজলেরই বা পুরুষ বন্ধু থাকতে নাই কেন? থাকলে কিছু ক্ষতি নাই—

কিছু না। শিলাজিত কাজলের বন্ধু—একমাত্র পুরুষ বন্ধু। এবার যখন আসবে শিলাজিত, ওর সঙ্গে কাজল বেশ স্বচ্ছন্দে কথা কইতে পারবে, বেড়াতে যেতে পারবে—মিশতে পারবে। গেলবারেও তো কাজল কথা কয়েছিল, মিশেছিল—ঠিক বন্ধুর মতই করেছিল ব্যবহার। অসুস্থ অবস্থায়, কাজলকে লেখা ভেবে শিলাজিত একবার জড়িয়ে ধরেছিল, তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিয়েছিল ভুল বুঝতে পেরে।

লেখা ভেবেই ধরেছিল—না? কাজলকে কাজল মনে করে ধরে নি শিলাজিত। মানে, কাজলকে চায় নি—চেয়েছিল লেখাকে। লেখা ঐ শিলাজিতের বৌ। কাজল অন্যের বৌ, তাকে কেন চাইতে যাবে শিলাজিত—ধরতেই বা যাবে কেন? শিলাজিত কখনো অতখানা বর্ব্বর নয়; হতে পারে না! কিন্তু—কিন্তু একদিন সহজ সুস্থ অবস্থাতেই কাজলের ঘুমন্ত হাত ধরতে গিয়েছিল শিলাজিত। হ্যাঁ—কাজল সে-কথা ভোলে নি; ভুলতে পারে না। তাহলে কাজলকেও চেয়েছিল শিলাজিত; কাজলের রূপের পূজাও করেছিল সে; কাজলের দেহের দেউলে ও জানিয়েছিল পূজার আবেদন—ভীরু সঙ্কোচনরত আবেদন, তারপর সবল, সুদৃঢ় আবেদন! এইখানে—এই বিছানায়—এমনি করে চিৎ হয়ে শুয়েছিল শিলাজিত!…কাজল শুলো বিছানায়। সেই বালিশটার উপর বুক রেখে শুলো—যেন শিলাজিত ঐ বালিশটা—ধরেছে কাজলকে আঁকড়ে! ওর সর্ব্বাঙ্গ কেমন যেন শিউরে শিউরে উঠছে—সমস্ত শরীরে একটা অনুভূতির মাদকতা যেন তরঙ্গায়িত হচ্ছে—খোলা চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে সাদা বিছানায়—কাজল দেখতে পাচ্ছে—বালিশরূপী শিলাজিতকে ঢেকে রেখেছে চুলগুলো—কেউ দেখতে পাবে না—হোক না দিনের আলো—থাক না পৃথিবীর অগন্ত প্রাণীজগৎ চোখ মেলে—কাজল যে এখন শিলাজিতের বুকে শুয়ে আছে—এ কথা কেউ জানতে পারবে না কাজল ছাড়া! মনের গহন গুহায় কাজল লুকিয়ে রেখেছে

শিলাজিতকে। সেদিনের সেই শিহরণ, সেই আকস্মিক আলিঙ্গনের তীক্ষ্ণতা এখনো যেন তেমনি তীব্রভাবে অনুভব করছে কাজল—তেমনি নিবিড় ভাবে। ওর সমগ্র সত্বা সেই সুখ-সমুদ্রে ডুবে রইল অনেকক্ষণ।

মানুষের মনের ছকে বিস্ময়কর বস্তু আর কিছু নাই। পরকীয়-সম্ভোগের এই অনাস্বাদিত কল্পনার আনন্দরস কাজলের দেহের পরতে পরতে নৃত্য করতে লাগল চটুল ঝর্ণার মত। গান করতে লাগলো তার অন্তরের গভীরতম গহ্বরে। স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে রইল ওর সমস্ত চেতনা।

—মাই জী!

কে ডাকে! কাজল যেন ঘুমের ঘোর থেকে জেগে উঠলো। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে টেলিগ্রাম-পিয়ন।

কি ব্যাপার? কিসের খবর? মণ্টু ভালো আছে তো? দাদু! উনি? নিকটতম আত্মীয়দের সকলের মুখ চকিতে মনের পর্দায় জেগে উঠলো কাজলের। সর্ব্বাঙ্গ সুখ-শিহরণ আর ভীত-কম্পনের চিন্তায় অনুরণিত হচ্ছে। ভয়ে ভয়ে বলল—কি?

—তার হ্যায়।

কাঁপতে কাঁপতে কাজল দরজা খুলে দিল। পিয়ন দিল একখানা মোড়া খাম ওর হাতে। ফরমটা সই করে দিয়ে কাজল দেখলো, 'তার' অঞ্জনের নামে। তাহলে অঞ্জন, মণ্টু, দাদু সব ভাল আছে। কিন্তু বাড়ীর 'তার'ও তো হতে পারে। বাড়ীর সব—বাবা, মা, শ্বশুর শাশুড়ী ভালো আছে তো? কাঁপা হাতে খুলে ফেললো খামখানা। যতটুকু ইংরাজী শিখেছে, এটা পড়বার জন্য তাই যথেষ্ট। লেখা আছে—"আজই সন্ধ্যার ট্রেণে পৌঁছাব—শিলাজিত"।

সত্যি সত্যি আজ আসবে শিলাজিত? নাকি ভুল পড়ছে কাজল? পিয়নটাকে দেখাবে সে—কিন্তু মুখ তুলে দেখলো, পিয়ন চলে গেছে।

ঐ তো বাগানের ফটক পার হয়ে গেল। কাজল আবার নিজেই পড়ল তারটা—হ্যাঁ, এই লেখা আছে। আসছে তাহলে, আজই আসছে। আর ঘণ্টা কয়েক পরেই। এখন বোধ হয় ন'টা, না, দশটার বেশী হবে—দেখি ঘড়িটা। দেখলো কাজল অফিসঘরে এসে, এগারোটা বেজে কুড়ি মিনিট। অর্দ্ধেক দিন তো কাবার হয়ে গেল আর অর্দ্ধেকটা; কতক্ষণ। এখুনি দিন শেষ হয়ে যাবে, ট্রেণখানা হুস হুস করে এসে থামবে ষ্টেশানে, আর শিলাজিত নেমে ট্যাক্সি চড়ে এসে পড়বে—বিছানা তো পাতাই রইল; চাদরখানা আর একটু টান করে দিতে হবে। ফুলদানিটা একটু মেজে ঐ টকটকে ফুলগুলো দিয়ে সাজিয়ে দিতে হবে।

—মা'জি?

—কে আবার? কাজল চেয়ে দেখলো, আয়া; বুকের উপর কাটিম ঘুমিয়ে গেছে।

—রোটি বানাবো না মা-জি?

—না—ভাত বানাবো। কাজল টেলিগ্রামটা টেবিলের উপর পাথর চাপা দিয়ে রাখলো সযত্নে।

—জি—আচ্ছা।

এ ঘরে এসে জলন্ত উনুনে ভাতের হাঁড়িটা চড়িয়ে দিল—চাল ধুয়ে ফেলে জল দিল—আলু-কলা আর একটা হাঁসের ডিম ওতেই ফেলে দিল সিদ্ধ হবার জন্যে। ঐ যথেষ্ট। ওতেই আজকার খাওয়া হয়ে যাবে কাজলের। রান্না করে সময় নষ্ট করে কি হবে। আয়াকে বলল,—বাচ্চা ঘুমুচ্ছে। যাও, তুমি এই বেলা খেয়ে এস।

আয়া চলে গেল নিঃশব্দে। সাহেব বাড়ী কাজ করেছিল ঐ আয়াটা, নিঃশব্দে কাজ করা ওর অভ্যাস। চলে গেল—কাজল আবার একলা। শুধু কাটিম ঘুমাচ্ছে দোলনায়। আস্তে আস্তে দুলছে দোলনাটা—একটু জোরে দুলিয়ে দিল। [illegible] মুখখানা নড়ছে—কার সঙ্গে কথা বলছে

যেন—মা ষষ্ঠির সঙ্গে বলছে কথা! সব ছেলেই বলে! ষষ্ঠির সঙ্গেই কথা বলে ছোট ছেলেমেয়েরা—নইলে ঘুমুতে ঘুমুতে হাসে কেন? কাঁদেই বা কেন! কাটিমও হাসছে।

কি সুন্দর চেহারা হয়েছে ছেলেটার। ঘুমন্ত যেন পদ্ম একটা—যেন একটা হলদে বরফের টুকরো—যেন খানিকটা জমাট জ্যোৎস্না। এ তো সুন্দর? কাজলই সৃষ্টি করেছে ঐ আশ্চর্য্য সুন্দর ছেলেটাকে? হ্যাঁ, তাই তো করেছে সৃষ্টি। কাজলের দেহের কয়েকটা বিন্দু নিয়ে ও এমন আশ্চর্য্য রূপবান হয়ে উঠলো। এর থেকে বিস্ময় আর কিছু আছে নাকি! কোথায় ছিল কাজলের দেহে এত রূপ—এমন পেলবতা, এমন নিষ্কলুষিতা! ছিল বৈ কি! না থাকলে ও হোল কি করে এত সুন্দর! কিন্তু ঐ রূপের সবটা কাজলের একার নয়, অঞ্জনের ভাগ আছে! বেশীর ভাগই অঞ্জনের, মুখের গড়নে অঞ্জনের আকার—চোখ-দুটো ঠিক অঞ্জনের মত—মেয়ে হলে হয় তো কাজলের মতই হোত—কিন্তু তাতেও তো অঞ্জনের ভাগ থাকতো! তেমনি কাটিমের ঐ রূপে কাজলের ভাগ আছে! কাজলই ওকে তিল তিল করে সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টি করেছে, বড় করেছে দেহের রক্ত দিয়ে, মাংস দিয়ে—পালন করেছে নিভৃতে—নিঃশব্দে—নীরব প্রার্থনায়।

চুলগুলো ঠিক কাজলের মতই—কালো, নরম, আর কোঁকড়া—গায়ে লোম হয় নি কেন কাজলের মত! হয়েছে, পিঠের দিকে লোম আছে ওর —বড় হলে আরো হবে! ওর বাবার কিন্তু মসৃন গা—বুকে সামান্য লোম—আর মুখে। কাজল আর একবার জোরে দুলিয়ে দিল দোলনাটা!

ভাতগুলো ফুটছে! হয়ে গেছে বোধ হয়। কাজল নামিয়ে ফেন গাললো! মাথাটা যেন কি রকম ঝিম্-ঝিম্ করছে ওর! বড্ড ক্লান্ত বোধ করছে! খেতেও ইচ্ছে করছে না। অথচ খাবার বেলাও তো হয়েছে। বারোটা বেজে গেছে কখন। কাটিম ঘুমুচ্ছে, এই সময় যা হোক দুটো

খেয়ে নিলেই লেঠা চুকে যায়!—তাই করবে, খেয়েই নেবে কাজল! গরমে গায়ের জামাটা ভিজে গেছে! কাপড়খানাও। ছেড়ে তোয়ালে দিয়ে গা হাত মুছে নিচ্ছে বেশ করে—গায়ে কয়েক ফোঁটা কি ঢেলে দিল; বেশ গন্ধ—অঞ্জনই কিনে এনে দিয়েছিল দিল্লী থেকে। রগড়ালে ওর গন্ধটা বাড়ে—বুকের খাঁজে রগড়ে নিচ্ছে কাজল—পুরন্ত, সুন্দর, মসৃন বুক ওর—কাটিমের ঐ চক্‌চকে গালটার মতই সুন্দর—তাকালো কাটিমের দিকে। ওম্ মা, ওম্-মা, হাসছে ছেলেটা—হাসছে! ও কি ভাবছে? কী ভাবছে ওর মাকে? নির্লজ্জ, বেহায়া, না কী ভাবছে?

শাড়ীর আঁচলটা বুকে তুলে দিতে দিতে লাল হয়ে উঠলো কাজল যেন! কাটিমের দোলনার কাছে এগিয়ে এল! দূরঃ, ঘুমুচ্ছে যে—নিঃসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছে। ছেলেরা অমন হাসে—হাসে অমনি করে! লজ্জার কি কারণ আছে। কাজল এমন কিছু অন্যায় করছিল না তো! না—কিছু না। কোনো অন্যায় কাজ করছিল নাকি কাজল? কারো জন্যে নিজেকে প্রসাধিত করছিল? কোনো পুরুষের জন্য? কোনো পর-পুরুষের জন্য? না তো—না, না—না। ছেলের মায়ের গায়ে দুধের গন্ধ থাকে—কাজল সেই গন্ধটা ঘুচাতে চাইছিল! কিন্তু কেন, কেন, কেন?—কিসের জন্যে? কার জন্য? কে তাকে আজ দেখবে, কে তার গায়ের গন্ধ আঘ্রাণ নিতে আসবে? স্বামী তো আজ বহুদূরে।

আত্ম-বঞ্চনায় লাভ নেই। কাজল প্রসাধনই করছিল—নির্লজ্জ, উলঙ্গ প্রসাধন! ঘুমন্ত শিশু নারায়ণ—ও সব জানতে পেরেছে, কাজল কি করছিল; কার জন্যে বুকে গন্ধ মাখছিল। তাই হেসেছে। ওর মা'র নির্লজ্জতা দেখে, বেহায়াপনা দেখে কাটিম—ঐ শিশু-নারায়ণ ব্যঙ্গ করল—বিদ্রূপ করলো, মনে করিয়ে দিল কাজলকে—কাটিম দেখছে—সে সাক্ষী রইল। আবার—আবার হাসছিস্? কৈ নারে—কিছু তো করি নি—বাছি আমি!—

কাজল উবু হয়ে পড়ল কাটিমের দোলনায় উপর। মাই-দুধ দিতে চাইছে ছেলেকে। খাচ্ছে না—ঘুমুচ্ছে কাটিম; খাবে না—খেতে চাইছে না। আচ্ছা তো ছেলে? কি এমন করলুম রে?—ও কাটিম, ওঠ।

কাল থেকে মাই টানে নি কাটিম। বুকটা টন্‌টন্ করছে ওর। কিন্তু এতক্ষণ সে-কথা তো মনে ছিল না। মনেই ছিল না একেবারে। এমন ভুল আবার কোনো মায়ের হয় নাকি? ছিঃ—সাধে কি আর ও হাসছে। ও বুঝেছে,—বুঝেছে, ওর মা আরেকজন পুরুষের কথা ভাবছে কাল থেকে। যদি সত্যি বুঝে থাকে?—না—না—না, ও মা-ষষ্ঠির সঙ্গে কথা কয়ে হাসছিল। কিন্তু দুধ খাচ্ছে না কেন?—এই, উঠে আয়।—কাজল দোলনা থেকে কাটিমকে তুলে মেঝেতে আঁচল পেতে শোয়ালো, তারপর পাশে শুয়ে মাই দিতে দিতে ঘুমিয়ে গেল। ঘর খোলা।

* * *

ওর বোধ হয় ব্রেণ ফিভারই হোল শিলাজিতের যেমন হয়েছিল। শিলাজিত—শিলাজিত—শিলাজিত—কি বলছে কাজল? কী সব বলছে ও? ও ঘুমিয়ে আছে না স্বপ্ন দেখছে, নাকি ভুল বকছে। আজ কিছুই ঠিক করতে পারছে না। ভয় পেয়ে গেছে সে। কাটিম এর মধ্যে জেগে উঠে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। যে ছেলে কোনো দিন কাঁদে নাই—সে আজ কাঁদছে; আওয়াজটা কানে কি যাচ্ছে না কাজলের? যাচ্ছে; ও শুনছে, ওর ছেলে কাঁদছে; ওর কাটিম—কোনো দিন যে কাঁদে না, সেই কাটিম কাঁদছে। কেন? কি হোল কি ওর? কাজল চেয়ে দেখবার চেষ্টা করলো—ওঃ, কাটিম মস্ত বড় হয়ে উঠেছে। ভর জোয়ান হয়ে গেছে সে। নাকের নীচে কালো কালো গোঁফ; সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবক হয়েছে কাটিম।

—বিয়ে দোব তোর এবার—কাজল বলল কাটিমকে।

—না, বিয়ে আমি করবো না ; কিছুতেই না—কাটিম ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জবাব দিল—খবরদার বিয়ের কথা বলো না।

—কেন রে, কেন ? বিয়ে করবি না কি ?

—মেয়ে মানুষকে আমি বিশ্বাস করি না।

—সে কি কথা কাটিম। আমি তোর মা, আমি মেয়ে।

—তোমাকেও বিশ্বাস করি নে আমি। দ্রৌপদী তার পাঁচজন স্বামীর পরেও কর্ণকে চেয়েছিল। তুমিও সেই দলের।

—কাটিম—কাটিম—থাম, ওরে, আমি মা তোর—। কাটিম—।

—না—না—না, থামবো না ; আমি জানি, তুমি আরেকজনের জন্য—আমি জানি—জানি আমি।

—কাটিম ! কাটিম !—কাজল অজ্ঞান হয়ে গেল।

এসে পৌছালো লেখা আর শিলাজিত ; ওর দেহটাকে আয়ার সাহায্যে বিছানায় শুইয়ে কাপড় চোপড় সামলে গুছিয়ে দিতে দিতে লেখা শুধুলো —কখন থেকে এমনি পড়ে আছে আয়া ? তুই কিছু জানিস না ?

—নাই হুজুর—হাম্ তো খানেকো গিয়া থা। আ'কে দেখা, এইসা পড়া হ্যায়—হাম্ তো—হুজুর—

লেখা ওকে চুপ করতে বললো। দুর্ব্বল শিলাজিত ও ঘরে তার অন্ত পাতা বিছানায় শুয়ে পড়েছে। কাজলেরই পাতা বিছানা। তারই স্নেহ-স্পর্শ লেগে রয়েছে যেন। কিন্তু কাজলের এমন অসুখ করলো কেন ? খেন খোবা যাচ্ছে—খাবার জন্য সে রান্না করেছিল, কিন্তু খেতে আর সময় পায়নি—অজ্ঞান হয়ে গেছে। কেন এমন হোল ? অসুখটা কি ওর ? জ্বর ? না অন্য কিছু ?—ভাবছিল শিলাজিত, লেখা এসে বলল,

—ডাক্তার এখনো আসছে না, কি যে করবো !

—অজানকে তার করবে ? শিলাজিত শুধুলো !

—না, কলকাতায় তোমার নাম দিয়ে। আমি যে বেঁচে আছি সেটা

আমি জানাতে চাই না আর কাউকে।

—তা বেশ। কাজলকে দেখছো কেমন?

ভালো না, বড্ড ভয় করছে আমার। কি যে বিড় বিড় করে বকছে! ডিলিরিয়ম—জরও খুব, একশ' পাঁচ…।

চুপ করে রইলো শিলাজিত। খানিক পরে ডাক্তারও এলো। রোগী পরীক্ষা করে বলল,

—ব্রেণ ফিভার—শিলাজিতকে দেখে বললো—আপনার যা হয়েছিল, ঠিক সেই অসুখ।

ওষুধ দিয়ে, উপদেশ দিয়ে, সাবধান বাণী শুনিয়ে ডাক্তার বিদায় নিল। শিলাজিত ভাবছে—তার অসুখে কাজল কেমন করে কতখানি সেবা দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তুলেছিল—আর আজ কাজলের অসুখে শিলাজিত কিছুই করতে পারছে না। তবু আগ্যিস ওরা এসে পড়েছিল—নইলে তো মেঝেতে পড়েই মরে থাকতো কাজল! লেখাকে বলল—তুমি ওর কাছে বস গে লেখা!

লেখা নিঃশব্দে উঠে গেল।

* * *

সমস্ত রাত্রি কেটে গেল, পরদিন সমস্ত দিনটাও। না এল অসীম, না ফিরলো কাজলের জ্ঞান। বিনিদ্র লেখা একা জেগে আছে কাজলের শিয়রে। তার মৃত্যু-সংবাদ পৃথিবীর লোকে জেনেছে, এমন কি, তার স্মৃতি-মন্দির অবধি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, অথচ সে রইল বেঁচে। কেন, তার শরীরেই বেঁচে আছে। ভারত-মাতার মুক্তি-প্রতীক্ষায় বেঁচেই থাকবে সে। শিলাজিতের জন্য নয়—না, নয়; শিলাজিতের জন্য নয়। কাজলের [illegible] পার হয় নি এখনো। আজ সকালে টেলিগ্রাম পেয়েছে, [illegible] বিকেলের ট্রেন ধরলে সেই ভোরের [illegible] ট্রেনে এসে নামবে

পারে। না এসে কি থাকতে পারে! আসবে ঠিকই। এলে বাঁচা যায়। যার ধন তার হাতে তুলে দিয়ে নিষ্কৃতি পায় লেখা—।

রাত্রি গভীর হয়ে আসছে—গভীরতর হল; কাজল নিঃসাড়, নিশ্চুপ পড়ে আছে। লেখাও আর পারে না জাগতে। ঘুমে ওর সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে আসছে। কাজল তো অজ্ঞান—থাক একটু অমনি! লেখা ওদিকের কোণটায় গিয়ে গুটিয়ে বসল—ঘুমিয়ে গেল বসেই।

"—কিস্ মী—ডিয়ারী—কিস্—কিস্—স্!

ওঘর থেকে শুনছে শিলাজিত, কাজল যেন বলছে কিছু? কি বলছে! পিপাসা পেয়েছে ওর—জল খেতে চাইছে নাকি! লেখা কি ঘুমিয়ে গেছে। কৈ, লেখার তো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। দেখতে হোল। আপনার দুর্ব্বল দেহটাকে টানতে টানতে শিলাজিত এঘরে এসে দেখলো—লেখা ঘুমিয়ে গেছে—আর কাজল ঘোলাটে চোখ মেলে কি যেন বলতে চাইছে, এগিয়ে এল শিলাজিত, বিছানার কাছে, কাজলের খুব কাছে—শুনতে চাইলে কি ও বলছে—।

কিস্—মী—কি—স্—। অকস্মাৎ হাত দুটো বাড়িয়ে কাজল ওর গলাটা সবলে জড়িয়ে ধরলো। দুর্ব্বল শিলাজিত ছাড়াতে পারছে না হাত কিস্—কিস্—কিস্—আ—।

আশ্চর্য্য? এত শক্তি পাচ্ছে কোথেকে কাজল? শিলাজিত কিছুতেই ছাড়াতে পারছে না ওকে। কাজলের বুকে নগ্ন পেলবতা শিলাজিতের কঠিন বুকে তরঙ্গ তুলছে ক্রমাগত। নিষ্পিষ্ট হয়ে যাবে শিলাজিত।

—ছাড়ো—ছাড়ো কাজল—হাত ছাড়িয়ে শিলাজিত নিজেকে সামলাচ্ছে। দরজার দিকে চেয়ে দেখল—অঞ্জন দাঁড়িয়ে।

মানুষের এই সব অনিচ্ছাকৃত কর্ম্মের জন্য কে কৈফিয়ৎ দেবে? এর জন্য দায়ীই বা কে?—কিন্তু এসব সমস্যা সমাধানের সময় নয়

এখন—অঞ্জনকে কিছু বলা দরকার শিলাজিতের।

—কতক্ষণ ফিরলেন?

—এই ট্রেণে!—অজ্ঞান হয়ে গেছে নাকি?—অঞ্জন এগিয়ে এসে দেখলো কাজলের জ্ঞান নাই।

—লেখা ঘুমিয়ে গেছে—তাই—আমি এসে দেখছিলাম, জল চাইছে কিনা—হঠাৎ এই ব্যাপার—।

কোনো প্রয়োজন ছিল না এই কৈফিয়তের। অঞ্জন তিন-চার মিনিট আগেই এসেছে এবং শিলাজিতের ঘরে ঢোকাটাও দেখেছে নিজে ঘরে ঢুকবার সময়। অঞ্জন কাজলের মাথাটা তুলে নিয়ে বসল। শিলাজিত ডাক দিয়ে লেখাকে জাগিয়ে দিল। উঠেই অঞ্জনকে দেখে প্রণাম করে বলল—নাও ভাই তোমার ধন, বুঝে নাও এবার!—কাজল তখনো অজ্ঞান। অঞ্জন নীরবে আশীর্ব্বাদ করলো লেখাকে।

মাথায়, মুখে জল দিতেই চোখ মেললো কাজল, কিন্তু জ্ঞান নাই। দৃষ্টি অত্যন্ত ঘোলাটে—যেন—যেন কিছুই দেখছে না, কিম্বা দেখছে এমন কিছু যা মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় দেখে না। অঞ্জন ডাক্তারকে ডাকতে পাঠালো।

ভোরের আলো আকাশের বুকে আগুন জ্বেলেছে—অঞ্জনের সাজানো সংসারটাতেও হয়ত।

এক আগুনই আলো দেয়—আবার দগ্ধ করে। সূতিকা গৃহে রক্ষা করে শিশু আর প্রসূতিকে আবার চিতায় তুলে ধ্বংসও করে ঠিক তেমনি নির্ব্বিকার চিত্তে। আগুন আগুনই—ওর শক্তি কোথাও এতোটুকু কৃপালু হয় না—এক বিন্দুও দয়া করে না কাউকে।

ক্লান্ত অঞ্জন কাজলের মাথাটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে চুপটি করে শুয়ে রইল ওরই বিছানায়। কাজলের গায়ে আগুনের উত্তাপ। পুড়ে যাচ্ছে যেন অঞ্জনের গা। ডাক্তার এসে দেখে বললে,—খুব সাবধান।

ধীরে ধীরে ভোর হোল—সকাল হোল—বেলা হয়ে গেল অনেকখানা। কাজল ঘুমিয়ে আছে অঞ্জনের কোলে। দুজনেই ওরা ঘুমুচ্ছে। লেখা দেখলো চেয়ে চেয়ে খানিক। বেশ তো ঘুমায়। এই যদি সজ্ঞান থাকতো, সুস্থ থাকতো তাহলে বেশ ঠাট্টা করবার একটা বিষয় ছিল এটা। কিন্তু এ অবস্থায় তো আর ঠাট্টা করা চলে না। অঞ্জনকে ডাক দিল—ওঠো দাদা। তুমিও যে রুগী হয়ে বসলে। কাজল তোমার ভালো হয়ে যাবে—ভাবনা কি ?

উঠলো অঞ্জন। স্নান করে কিছু খেল; তারপর অফিস ঘরে গিয়ে অনেকদিনের বাকি কাজগুলো সারতে লাগল একমনে। শিলাজিত ওর সঙ্গে কথা বলতে বড়ই কুণ্ঠা বোধ করছে। কেন—তা জানে অঞ্জন—আর শিলাজিত তো জানেই। কাজলের জীবনের এই বিস্ময়কর দুর্ঘটনার জন্য দায়ী তো এই শিলাজিতই। না—দায়ী অঞ্জনের ভাগ্য—অঞ্জনের নির্বুদ্ধিতা। অঞ্জন চায় ভারতের কলা-কৃষ্টির গবেষণা করতে; অঞ্জন চায়—সারা ভারতের মানব-সমাজকে এক অখণ্ড মহামানবতার মিলন-মালা পরাতে—কিন্তু যার গলায় অঞ্জন বরমাল্য পরিয়েছিল তার কথা অঞ্জন ভাবেও নি একবার। মুখের স্নেহ দেখিয়েছে প্রচুর, অর্থের স্বচ্ছলতা দিয়েছে অকুণ্ঠ ভাবে—আহার-বিহারের স্বাধীনতা দিয়েছে [illegible]; কিন্তু ওর অন্তরের আবেদনকে, ওর দেহের দুর্বল [illegible] অঞ্জন আমলই দেয় নি। অঞ্জন তার কৃষ্টি সাধনা আর [illegible] গবেষণা নিয়ে মহা-মানব সভ্যতার স্বপ্ন দেখছে। নির্বোধ, নির্বোধ অঞ্জন। কেন বিয়ে করে ছিল সে ? কেন করেছিল ?

—[illegible] কেমন আছে ?—শিলাজিত প্রশ্ন করলো।

—[illegible] [illegible] ভাল হয়ে গেল। ওর এক মেয়ে আছে ওখানে, ঐ [illegible] পালিয়ে এসেছে। [illegible] বাবার [illegible] কী যে তার করলো। [illegible] [illegible] এই কথাগুলো [illegible]

শিলাজিতের কুণ্ঠা ঘুচাতে হয়তো।

—ফিরে তো আসবে আবার ; কান্না কেন ?

—হ্যাঁ—কিন্তু মেয়েটাকে সে কথা বোঝানো যাচ্ছিল না—অঞ্জন ক্লান্ত হয়ে কথা ছোট করলো।

—ও, মণ্টু কোথায় ?

—ও বাড়ী চলে গেছে !—অঞ্জন কাগজে কি লিখতে আরম্ভ করলো ; শিলাজিতও চুপ। সমস্ত আবহাওয়াটা যেন থম্ থম্ করছে ঘরের। মিনিটের পর মিনিট যায়—নিস্তব্ধ—নিশ্চল। দুজনের অন্তরে দুরকম ভাবের তরঙ্গ আলোড়িত হচ্ছে, কিন্তু একটা যায়গায় মিল আছে, কাজলের চিন্তা।

দুদিন, তিন দিন, পাঁচ দিন, সাত দিন, কেটে গেল—অঞ্জনের আদরিণী বধূ কাজল শীর্ণ, দুর্ব্বল, কুৎসিত হয়ে গেছে। গালের হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে ওর, গলার অমন মিষ্টি স্বর কর্কশ শোনাচ্ছে। কথা প্রায় বলেই না, কাটিমকে একেবারে দেখতে পারে না। কাটিম আয়ার কাছেই থাকে এখন। মার কাছে আসতে চায়, কিন্তু কাজল ওকে দেখলেই চীৎকার করে ওঠে—'নিয়ে যা নিয়ে যা ওকে'—ওর হয়তো ভয় করে, ছেলে তাকে আর ভালোবাসবে না ; আর হয়তো মা বলে ডাকবে না—হয়তো অঞ্জনকে বলেই দেবে একদিন যে কাজল অবিশ্বাসী, কাজল পর-পুরুষের জন্য প্রসাধন—কাজল আর ভাবতে পারে না। মাথাটা কেমন ঘুলিয়ে যায় ওর।

ওর পানে করুণ চোখে চেয়ে থাকে অঞ্জন। নির্বোধ অঞ্জন ! গ্রামলক্ষ্মী কাজলকে ও সহরের বারোয়ারী তলার বেদীতে বসাতে এনেছিল—পূজোর নিষ্ঠা যেখানে প্রতিবেশীর চাঁদার অর্থে ওজন হয়। অঞ্জন দেখে—দিনে দিনে পল্লীর সোনার দুলালী সহরে ভিখারিণীতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না অঞ্জন। নিজেকে

অপহার আঘাত করবার জন্ম ও প্রস্তুত হয়। ওর দার্শনিক মন বারম্বার ভাবতে বাধ্য হয়—কাজলের এই মানসিক পতনের জন্ম সে নিজেই দায়ী। বিবাহিতা বধূকে সে বাইরে এনেছে—প্রলোভনের বিপুল ঐশ্বর্য্যের সুমুখে স্থাপন করেছে—অবসরের অখণ্ডতায় তাকে অতিষ্ঠ হবার ব্যবস্থা করেছে—অথচ সঙ্গদানে তৃপ্ত করবার চেষ্টামাত্র করে নি। নিজের দার্শনিক জ্ঞান—নিজের আদর্শ নিষ্ঠা—নিজের কাল্পনিক ভারত-উন্নয়ন আর কৃষ্টিসাধনার স্বপ্নেই সে মশগুল থেকেছে—একটা নিরাশ্রয়া নিরপরাধা বধূ যে দিনে দিনে উপেক্ষায় উপোসী হয়ে উঠলো—অবসরের অসীমতায় আকণ্ঠ তিক্ত হয়ে উঠলো—অকাজের কথা ভাববার অনেক পথই যে তার খোলা রইল। সে কথা ভাবেই না অঞ্জন। কাব্যে উপেক্ষিতা উর্ম্মিলার কথা মনে পড়ল অঞ্জনের, রবীন্দ্রনাথের অশ্রুসিক্ত লেখনীর কথা মনে পড়ল। লক্ষ্মণ ভালবাসতো উর্ম্মিলাকে—তবু সে উপেক্ষিতাই হয়েছিল। অঞ্জনের অন্তরলক্ষ্মী কাজলও ঠিক ততখানি—না, তার চেয়ে বেশি উপেক্ষিতা হয়েছে। অঞ্জন বারম্বার ভেবে দেখে কাজল তার সঙ্গ পাবার জন্ম কত করুণ আবেদন জানিয়েছে—কত কাকুতি করেছে, অঞ্জন সময়ই করতে পারে নি। প্রকৃতির প্রতিশোধ বড় নির্ম্মম—তাই কাজলের মত বৌ-ও এমন পরিণতি লাভ করে। এই ভীষণতম বিয়োগান্ত জীবনের জন্ম দায়ী অঞ্জন। কেন সে শিলাজিতকে ঘরে ঠাঁই দিয়েছিল—কেনই বা কাজলকে ওর সুমুখে এনেছিল? কাজল প্রথম দিন থেকেই সতর্ক হতে চেয়েছিল শিলাজিত সম্বন্ধে। তার অচেতন মন—হয়ত ওর অন্তরাত্মা—ওর জীবনের নিয়ন্তা হয়ত সাবধান করে দিতে চেয়েছিল কাজলকে। কাজল সে-কথা যথাসময়ে জানিয়েও ছিল স্বামীকে তার—কিন্তু অঞ্জন গ্রাহ্য করে নি। অঞ্জন শিলাজিতের মনস্তত্ত্ব নিয়েই ব্যস্ত ছিল—কাজলের কথা মনেও পড়েনি তার। কাজলের জীবনের এই করুণতম পরিণতির জন্ম অপরাধী অঞ্জনই।

মাথায় আইসব্যাগটা ধরে আয়া বলল—চোখটা খুলছে—আসুন। অঞ্জন এগিয়ে এল। হ্যাঁ—অনেকক্ষণ পরে কাজল চোখ খুলছে। অঞ্জন চাইল—যে চোখ দেখে হিরণ নাম রেখেছিল—'কাজল'—সেই দুটি কোমল কালো চোখ—তেমনি টানা, তেমনি কালো—কিন্তু যেন জ্যোতিহীন। কেমন যেন ছায়াচ্ছন্ন দৃষ্টি। অঞ্জন আস্তে ডাক দিল,—

—কাজ্‌লু।

—উঁ—এসো, আমার কাছে এসো—আসবে না? ওগো—আমি—!

—তুমি কিছু অপরাধ করো নি কাজল—কোনো দোষ নাই তোর—কাজল, আমার কাজল।

অঞ্জন ওর মাথা কোলে নিয়ে মুখেতে চুমা দিচ্ছে। কাজল চেয়ে আছে। অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল—মরে যাবো আমি? না গো?

—না—না—না। মরবি কেন কাজ্‌লু। তুই ভালো আছিস—সেরে যাবি দুদিনে।

—নাঃ—আর সেরে কাজ নাই; আমায় যেতে দাও।

কাজল।—অঞ্জন কেঁদে ফেলে—বলে—কাজল, তোর বেলায় কেন অপরাধ হবে? আমিও তো মাধবীকে ভালবাসতাম—লেখাকেও ভালো-বাসি—হয়তো কেয়াকেও ভালবাসি—তুই তো সেগুলোর জন্যে আমাকে কম ভালবাসিসনি। কাজল তাকিয়ে রয়েচে—একটু ভেবে বলল—

—আমি যে মেয়ে, আমি যে—।

—কাজল—শিলাজিতকে ভালো তুই বাসিসনি—তোর কিছু ভয় নাই, সেরে ওঠ—আমি তোর অন্তরের সব কালি মুছে দেব। তোর সেদিনের মানসিক দুর্ব্বলতার কারণ আলাদা—ভালবাসা নয়। তার জন্য দায়ী বহুদিন পূর্ব্বের সেই অসুখটা। শিলাজিতের—যে চিন্তা তোর মনের গোপন গৃহে বন্দী ছিল—অকস্মাৎ সেদিন সেটা মুক্তি পেয়েছে। ওকে ভালবাসা বলে না—ওটা শারীরিক উচ্ছ্বাস—মনের দুর্ব্বল মুহূর্তের আবেগ

প্রকাশ। লক্ষ্মী আমার, কেন তুই নিজেকে এত ছোট ভাবছিস ?

কাজল ক্রমাগত কাঁদে—কিছুই বলতে পারে না।

লেখা সেই পুরানো দুর্ঘটনার কথাটা জানে না—শিলাজিত ওকে বলেনি কিছুই। কিন্তু শিলাজিত নিজের ভেতর গুমরাতে থাকে। কাজলকে সে শেষটায় এমন অবস্থায় আনলো। একি করেছে শিলাজিত ! কাজলকে ভালবাসতে গিয়ে কাজলের এতবড় সর্ব্বনাশ করে বসেছে। শিলাজিত নিজেই নির্ব্বাক হয়ে থাকে। ওর দৈহিক কামনা কাজলের সর্ব্ব দেহ-মনে অন্তঃপ্রবিষ্ট করে দিয়েছিল শিলাজিত। ক্ষমাই সেদিন করেছিল কাজল, কিন্তু কাজল সে-বিষ সইতে পারে নি। জরজর হয়ে গেছে সে নিজে। অঞ্জন—বিষপায়ী নীলকণ্ঠ অঞ্জন—হয়তো কাজলকে নিরাময় করে তুলতে পারবে। ঈশ্বর যেন কাজলকে ভালো করে দেন। শিলাজিত নিজের নির্দ্দিষ্ট ঘরটায় বসে বসে ভাবছিল। লেখা এসে বলল—কী তোমার হয়েছে বলো তো ?

—না, কিছু না ! কেমন রয়েছে কাজল ?

—বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন দেখছি না আমি। দিনে দিনে দুর্ব্বল হয়ে যাচ্ছে।

—অঞ্জনকে বলো—ওকে দেশে নিয়ে যান। এখানে কাজল সারবে না—এই সহুরে মাটিতে কাজলের মত মেয়েরা বাঁচে না···ওকে ওর নিজের জায়গায় নিয়ে যেতে বল লেখা।

—হ্যাঁ—আমিও তাই ভাবছিলাম !—লেখা একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

অঞ্জনও ভেবে দেখলো—কাজলকে এখানে আর রাখা সম্ভব নয়—বাঁচে যদি তো ভালো—না বাঁচে—আত্মীয়-স্বজনের আদরের কোলে মরতে পারবে গিয়ে ! অঞ্জন আয়োজন করলো কাজলকে বাড়ী নিয়ে যাবার। গ্রামরূপা কাজল আবার গ্রামে ফিরে আসুক ; আবার শ্যামল-কালো [illegible] ওর সুবোরিত অঙ্গ ধরণীর ধুলো লেগে—ও গ্রাম্য হয়ে যাক

আবার। যে পথে একদিন মাধবীর জীর্ণদেহ বয়ে এনেছিল কাজল এইখানে সেই পথে আজ কাজলের জীর্ণ, অর্দ্ধমৃত দেহ-মন নিয়ে ফিরে যাচ্ছে অঞ্জন! মানুষের জীবন-নিয়ন্তার নিষ্ঠুর বিধান মানুষের ইচ্ছার মূল্য চিরদিনই অগ্রাহ্য করে এসেছে।

একখানা প্রথম শ্রেণীর রিজার্ভ কামরায় ওর জীর্ণ দেহটা তুলে অঞ্জন ফিরলো বাড়ীর পথে। লেখা আর শিলাজিত গেল নিজেদের মনোমত সাধনার পথে—। ভোরের ট্রেণে নামলো অঞ্জন ওর গ্রামে যাবার ষ্টেশনে। দুখানা গরুর গাড়ী এসেছে ওদের নিয়ে যাবার জন্ম। সূর্য্য উঠবে ধীরে ধীরে! অঞ্জন কোলে করে নামালো কাজলের অর্দ্ধ অচেতন দেহখানা। চোখ মেলে চাইছে কাজল। দেখছে, কোথায় এল সে। বললো—কোথা এলাম।

—সেই ধুলোর ধরণীতে কাজল!

কাজল বুঝতে পারলো না। চেয়ে রইল অঞ্জনের মুখের পানে। অঞ্জন আবার বলল—ফিরে এলাম সেই মাটি-মা'র কোলে কাজল,—আমার সেই পল্লীমায়ের কোলে—সভ্য মানুষেব অহঙ্কার যেখানে মনকে বিড়ম্বিত করে না, বিচলিত কবে না—কামনা-বাসনার পঙ্কিল বঞ্চনা যেখানে মানুষ অগ্রাহ্য করতে পারে—বেদনা যেখানে মানুষকে বিশ্বজয়ের শক্তিতে বাঁচিয়ে রেখেছে সেইখানেই তোমায় ফিরিয়ে আনলাম।—কাজল তাকিয়ে রয়েছে। এত বড় বড় কথা বুঝবে কি করে ও!

—তুমি ভালো হয়ে ওঠো লক্ষ্মী আমার। আমার প্রেমের কঠোর প্রায়শ্চিত্তে তোমার সব গ্লানি আমি ধুয়ে দেব।

বুঝতে পারছে হয়ত এবার। কাজলের চোখ দুটোতে জল উপচে উপচে পড়ছে। কত কথা ওর স্মৃতির আঁধার—মণিকোঠায় জলে জলে উঠছে যেন। অগণ্য তারা—অসংখ্য নক্ষত্র,—নীহারিকা—ছায়াপথ—চন্দ্র, সূর্য্য। ঐ যে সুন্দর সূর্য্যের মুখখানি—লাল হয়ে উঠে

শিশির শুষে নিচ্ছে। ও আর চোখ বুজবে না, চেয়েই থাকবে ওর সূর্য্যের পানে—স্বামী-সূর্য্যের পানে। কিন্তু চোখ যে জলে ভরে যাচ্ছে। ওকে পাঁজাকোলা করে এনে অঞ্জন গাড়ীতে শুইয়ে দিল। তারপর ওর মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে বললো গাড়োয়ানকে—চালাও…।

উদয়-সূর্য্যের সোনালি আলো লেগে পথের ধূলো রাঙা হয়ে উঠেছে।

